বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর

নৃপেন্দ্র সাহা

তূণ প্রকাশ

BANGLA THEATARER PURBAAPAR
By Nripendra Saha

প্রথম প্রকাশ :
নাট্যমেলা, ১৯৯৯

প্রচ্ছদ :
শ্যামল জানা

স্কেচ :
কৌশিক সান্যাল

প্রকাশক :
শ্রীমতী চন্দ্রাণী দত্তগুপ্ত
তৃণ প্রকাশ
২৮ নীলকমল কুণ্ডু লেন
শিবপুর, হাওড়া ৭১১ ১০২
দূরভাষ : ২৬৫০-২৩৫০

পরিবেশক :
বিকাশ গ্রন্থ ভবন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
গুপ্তপ্রেশ
৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

শ্রী অনিল সরকার

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

১। বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত

২। বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে শম্ভু মিত্র (যন্ত্রস্থ)

৩। বিজন ভট্টাচার্য : বাংলার থিয়েটার আন্দোলন (যন্ত্রস্থ)

সম্পাদিত গ্রন্থ :

৪। নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য

৫। অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মরণ আলেখ্য

৬। সফদর হাশমি নাট্যসংগ্রহ

৭। বাংলা নাট্য সংকলন (১ম খণ্ড)

৮। বাংলাদেশের থিয়েটার

সূচিপত্র

বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর

বাংলা থিয়েটারের দুশো বছরের সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি হল 'থিয়েটার', যা আমাদের আগে ছিল না, থাকলেও অন্যরকম, সংস্কৃত নাট্য তো নয়ই, ছিল খোলামেলা যাত্রা এবং লোকনাটকের অভিনয়। এখন থিয়েটার আমাদের বঙ্গজীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো, বরং তার চেয়ে কিছু বেশিই, বলা যায় নগর-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে প্রাত্যহিক। অন্তত কয়েক সহস্র তরুণ-তরুণীর দিনের ধ্যান, রাত্রির সাধনা। প্রতি সন্ধ্যাতেই মহানগর কলকাতার ৩৫টি রঙ্গমঞ্চে কোনো না কোনো নাটক অভিনীত হচ্ছে। মফস্বল শহরের সরকারি মঞ্চগুলিও প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই আলোকোজ্জ্বল থাকে। এ ছাড়া অস্থায়ী মঞ্চে বছরের সাতটা মাস বিভিন্ন জেলার অসংখ্য নাট্যদলের নাট্য প্রযোজনা তো আছেই। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেরও শ আড়াই নাট্যগোষ্ঠীর সদা সক্রিয় নাট্যচর্চার কথা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

নাটক আর থিয়েটার নিয়ে উন্নতমানের চর্চা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশের মতো ব্যস্ততা কোথাও নেই।

থিয়েটার নিয়ে এই গভীর ব্যস্ততার কারণ কী, আর যে থিয়েটারের বয়স মাত্র দুশো, শহর কলকাতা গড়ে ওঠারও একশো বছর পরে যার জন্ম এক বিদেশি ভাগ্যান্বেষীর উদ্যোগে। সেই থিয়েটারে আমরা কী পেয়েছি, কী দিয়েছে আমাদের এই দুশো বছরের থিয়েটার ?

দিয়েছে গেরাসিম স্তেপানোভিচ্ লিয়েবেদেফ নামক এক রুশ ভারতপ্রেমিককে, এ দেশে যাঁকে আমরা লেবেদেফ বলে উচ্চারণ করে থাকি। যাঁর উদ্যোগে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বরে কলকাতার ২৫নং ডোমটোলার পথে বেঙ্গলি থিয়েটারের প্রবর্তন হয়েছিল। '*কাল্পনিক সংবদোল*' (*The Disguise*) নামক বঙ্গীকৃত নাটকের অভিনয় সূত্রে। দিয়েছে লিয়েবেদেফ বিষয়ক গবেষণার প্রভূত উৎসাহ, যার শ্রেষ্ঠ ফসল হায়াৎ মামুদ রচিত '*গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ*' শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থ। দিয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটারের ঐতিহ্য অনুসারী বেঙ্গল থিয়েটার, বীণা থিয়েটার, স্টার, মিনার্ভা, নাট্যভারতী, নাট্যমন্দির, এম্পায়ার, শ্রীরঙ্গম (বিশ্বরূপা), রঙমহল, থিয়েটার সেন্টার, মহাজাতি সদন, মুক্তাঙ্গন, রবীন্দ্রসদন, অ্যাকাদেমি, কলামন্দির, শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, রঙ্গনা, সারকারিনা, তপন থিয়েটার, বিজন থিয়েটার, অহীন্দ্র মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ কত না রঙ্গমঞ্চ। দিয়েছে মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র,

মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকারের মতো যুগন্ধর নাট্যকার। সৃষ্টি করেছে আব্দুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীনের মতো নাট্যকার। গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার, রবীন্দ্রনাথ, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের মতো উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন নাট্য প্রয়োগকর্তা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রয়োগকর্তা আলি যাকের, আতাউর রহমান, কামালউদ্দীন নীলু, এস এম সোলায়মান, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, জামিল আহমেদ, আহমেদ ইকবাল হায়দার, শিশির দত্ত, সাইদুর রহমান লিপনের কথা অবশ্য উল্লেখ্য। আর সেই মাপের বা তার চেয়েও বড়মাপের কত না অভিনেতা-অভিনেত্রী, যাঁদের নাম লিখে কেবল তালিকাই বড় হবে, নামের মালা শেষ হবে না। সেই সঙ্গে কত বড় থেকে বড়ই না নেপথ্যশিল্পী ধর্মদাস সুর, সতু সেন, খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন, নির্মল গুহরায়, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশ দত্ত প্রমুখ আজ বাংলা থিয়েটারের নেপথ্যকর্মকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিয়ে এসেছেন। এ সবই তো বাংলা থিয়েটারে দুশো বছরের অবদান।

কিন্তু এ সব অবদানই সামাজিক জীবনে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মতো, কালকে যা চড়া দামে হাঁক পেড়েছে, আজ তা জলের দামে বিকিয়েছে, আবার বিপরীতটাও হয়েছে। বাংলা থিয়েটারের প্রথম স্থপতি গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফের বঙ্গীয় নাট্যকর্মে উৎসাহিত হওয়ার প্রসঙ্গ-রহস্য আজ প্রত্নরত্নের মতো উদ্ধার করে আনা হয়েছে দুর্মূল্য সম্পদ সংরক্ষণের দৃষ্টিতে।

যাই হোক, এ সময় সঙ্গত প্রশ্ন ওঠে, লিয়েবেদেফ বেঙ্গলি থিয়েটারের প্রবর্তন না করলে কি আমাদের বাংলা থিয়েটারের জন্ম হত না? ইংরেজ আমলে ইংরাজি থিয়েটারের সাদৃশ্যেই কি অনতি-উত্তরকালে বাঙালিরা থিয়েটার নির্মাণে এগিয়ে আসেননি, আবার এই পাশ্চাত্য থিয়েটারের ধাঁচটাই হুবহু অনুকরণ করেও তার মধ্যেই কি বঙ্গবাসী তার নিজস্ব থিয়েটারের উৎস অনুসন্ধান করেননি? সংস্কৃত থেকে বাংলাভাষার উদ্ভবের মতো সংস্কৃত থিয়েটার থেকেই বাংলা বা বিভিন্ন প্রাদেশিক থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটল না কেন, কিংবা যাত্রার ঐতিহ্যকেই আরো বিকশিত না করে থিয়েটারের ধাঁচায় সেকাল বা একালের বঙ্গবাসীর এত মুগ্ধতা কেন? দুশো বছর ধরে থিয়েটার করেও সেই প্রথম দিনের মতোই আজও বাংলার থিয়েটার কেন অনুবাদ-রূপান্তরের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে? কেনই বা বাংলার মতো একটা আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতির থিয়েটার থেকে পাশ্চাত্য বা এশীয় থিয়েটার অনুবাদ-রূপান্তরের যোগ্য মৌলিক উপাদান খুঁজে পাচ্ছে না? পূর্ব বা পশ্চিম ইউরোপে, থিয়েটারের জগতে যখন যে তত্ত্ব বা ঝোঁক দেখা দিচ্ছে, বাংলার থিয়েটার তখনই সেই ঝোঁকে কেন সাড়া দিচ্ছে? আমাদের থিয়েটারের নিজস্ব উদ্ভাবনী নান্দনিকতা কেন উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে? এইসব প্রশ্ন আজ বাংলা থিয়েটারের দুশো বছরের জরুরি প্রসঙ্গ।

এইসব জরুরি প্রশ্নের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গেলে বুঝে নিতে হয় দুশো বছরের বাংলা থিয়েটার আমাদের চেতনাজগতে কোন্ সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়েছে যার জন্য দুশো বছর ধরে বাংলার মানুষ, থিয়েটারপ্রেমী বাংলার সব কলাকার ছেলেমেয়েরা জেগে রয়েছে। দিনগুলি রাতগুলি সব আমাদের নির্ঘুম জাগরণের গান গাইছে সেই সব মুখমণ্ডলের ছবি এঁকে—আলোছায়ার কারিকুরিতে মঞ্চের রঙিন পাটাতনে — প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে, মনে হয় আমিই লেনিন। কেন? এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে ১৯৯৫ জুড়ে। বা তারপরেও, আরও অনেক বছর ধরে।

২

বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর আমাদের চেতনাজগতে যে ভাবসম্পদের স্পন্দন জাগিয়েছে তাকে সূত্রাকারে সাজালে আমরা দেখি পশ্চাদ্‌বর্তী এক ভূখণ্ডের মানুষ হয়ে শোষণ-বঞ্চনার পাশাপাশি শোষকশ্রেণীর অধিপতি সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার অর্জনের যুদ্ধাস্ত্র। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপের বুর্জোয়া সংস্কৃতির অভিযান— সেই অভিযানের একদিকে মানুষকে বন্দী করা হয়েছে, অপরদিকে তার মনকে মুক্ত করা হয়েছে। বাংলা থিয়েটার শুরু হয়েছিল এই বন্ধনমুক্তির দোলাচলে। এই থিয়েটার আমাদের সন্ধান দিয়েছে, ১) অগ্রসরগামী বৃহত্তর পৃথিবীর, ২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের, ৩) অভিব্যক্ত হওয়ার নতুন শিল্পআঙ্গিক— নাট্যকলা তথা থিয়েটারের, ৪) স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্যচেতনার, ৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য-সচেতনতা এবং উভয়ের সমসূত্রতার সন্ধান, ৬) সমকালীন আর্থ-রাজনীতি-সমাজনীতি বিসর্পিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির, ৭) নারীমুক্তির পথ রচনার, ৮) পুরুষ মানসিকতার উদারতার, ৯) শিল্পী ব্যক্তিত্বের বিকাশের এবং সর্বোপরি, ১০) নাট্যকলার নিয়ত বিবর্তিত ধারণার অনুসরণ, সপ্রতিভ সৃজনশীলতার।

উপর্যুক্ত দশটি সূত্রই দুশো বছরের থিয়েটার ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এই সব কয়টি প্রসঙ্গই কেবল আমাদের থিয়েটারের অবদান এ কথা আমরা নিশ্চয় বলব না। কারণ থিয়েটার ব্যাপারটা তো একক কোনো স্বয়ম্ভূ নয়, সে একটা আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক মানবিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি। তিলোত্তমা শিল্প বা সমবেত শিল্প যাই বলা হোক, থিয়েটার সব কিছু নিয়ে। সুতরাং একটা শ্রেণীবিভাজিত সমাজের শ্রেণীসংস্কৃতির যা রূপ হওয়া উচিত থিয়েটারে তাই হয়। কেবল অধিপতিশ্রেণীর জোরটা যেদিকে, থিয়েটারের অভিমুখ সেইদিকে ধাবিত হোক, অধিপতিশ্রেণী চাইলেও তা হয় না, থিয়েটার চায় ভোক্তাশ্রেণীর আধিপত্য অঙ্গীকার করতে। থিয়েটারের স্রষ্টা ও ভোক্তা যদি একই শ্রেণীর হয়, যদি তারা শ্রমজীবী সাধারণ জনমানুষের গর্ভ থেকে উঠে আসে, অন্তত সেই চেতনা থেকে, তবেই সেই থিয়েটার দেশের জনগণের থিয়েটার হয়। আমাদের বাংলা থিয়েটার যে লিয়েবেদেফের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল, তিনি অধিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন না, ছিলেন একজন বড়ো রুশি সমাজের ভূমিদাস

পরিবারের ভাগ্যতাড়িত সন্তান, সঙ্গীতজ্ঞ, পর্যটক ও ভারততত্ত্ববিদ্। নিতান্তই মধ্যবিত্তচেতনার আলোকে বাংলা থিয়েটারের পাদপ্রদীপের আলো জ্বেলেছিলেন। তারপর শৌখিন নাট্যচর্চার যুগে ইংরেজের মুৎসুদ্দি রাজামহারাজার কৌতূহল মিটিয়ে বাংলা থিয়েটার নিজের জোর খুঁজে পায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্রষ্টা ও ভোক্তাদের মধ্যে। সময়টা তখন ১৮৭২। তারপর একটানা ১৯৪৩-এ এসে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দর্শনের আধিপত্যে বাংলা থিয়েটারের মধ্যবিত্ত ভাবালুতা ঘুচিয়ে তাকে সাবালক করে তোলা হয়। এই গোটা দুশো বছর ধরে বাংলা থিয়েটার তাই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তার ভোক্তা বিপুল দর্শক সমাজে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই স্বভাবতই এই থিয়েটার উনিশ শতকের সার্বিক চেতনা বিস্তারের কালে শিক্ষা সংস্কৃতির হাত ধরে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের মাধ্যমে অগ্রসরগামী পৃথিবীর উন্নত গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে আমাদের ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্যের অধিকার নিয়ে সংগ্রামমুখর করেছে। সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতা বোধের সুতীক্ষ্ণ পরিচয় দিয়েছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক নারীমুক্তি; সেই অভিমুখে বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাটক, সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যান্য দিকের তুলনায় সব চেয়ে বেশি বলবতী ভূমিকা পালন করেছে। আবার এই নারীর প্রশ্নে বুর্জোয়া প্রভুরা যখন সামন্ত প্রভুদের থেকেও কদর্য ভূমিকা নিয়ে তাদের যৌনপণ্যে পরিণত করে চলেছে, তখনও বাংলা থিয়েটার নারী স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। অবশ্য ততদিনে সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনের আলোকে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের লড়াইকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে নিতে পেরেছি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে, রঙ্গমঞ্চ এখানে সফলতম ভূমিকা পালন করেছে। অতীতের বেশ্যাকে মহীয়সী নারীতে পরিণত করেছে, সম্মানিত করেছে অভিনেত্রীর জীবিকাকে। আজ বাংলার থিয়েটারে কর্তৃত্বকারী শক্তির ভূমিকায় নারী। পুরুষদের পাশাপাশি এক ডজন মহিলা নির্দেশক আজ দুই বাংলার থিয়েটার শাসন করেছে বললে অত্যুক্তি শোনাবে, কিন্তু তার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। সর্বোপরি অভিব্যক্ত হওয়ার পথে এই শিল্পাঙ্গিকের চৌষট্টি কলার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে আমরা পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন না করলেও যতখানি এই দুশো বছরে অধিগত করেছি, তাতে বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি পরিমণ্ডলের নিত্যনতুন কোনো অভিঘাতই বাংলার থিয়েটারকে আর পরাভূত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

এমতাবস্থায় প্রথম পরিচ্ছেদের তোলা প্রশ্নগুলির যদি উত্তর খুঁজি তবে আমাদের বিশদ হতে হবে। প্রথম প্রশ্ন লিয়েবেদেফের বেঙ্গলি থিয়েটারের প্রবর্তন না করলে কি আমাদের বাংলা থিয়েটারের জন্ম হত না ? উত্তর, নিশ্চয়ই হত। কিন্তু লিয়েবেদেফ শুরু করেছেন, এটা ঘটনা। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত ইতিবৃত্ত তাই বলে। পথিকৃতের মর্যাদায় তিনি আজ বাংলা থিয়েটারে সম্মানিত। কোন্ অবস্থায় কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে লিয়েবেদেফ বাংলা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ও নাট্যাভিনয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সে কথা বিস্তারিত আলোচনার জন্য

আমাদের বাংলাদেশের নাট্য বিশেষজ্ঞ হায়াৎ মামুদের *'গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ'* গ্রন্থের বিশ্লেষণে ঢুকতে হয়। থিয়েটারে তাঁর আগ্রহ বা অনুশীলনের কোনো অতীত প্রমাণ নেই। কিন্তু বাংলা বা হিন্দুস্থানি ভাষা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার একটা আন্তর তাগিদ থেকেই তিনি নাটকের অনুবাদে হাত দেন। হয়তো প্রযোজনার চিন্তাও, সেটা হয়তো সঙ্গীতের আসরে আরও কিছু সম্প্রসারিত জনসংযোগ আকাঙ্ক্ষা। এ ক্ষেত্রে লিয়েবেদেফকে তাঁর সারল্য আর বিনয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয় যে থিয়েটার নির্মাণের প্রেরণার জন্য তিনি তাঁর ভাষাশিক্ষক পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের পরামর্শকেই মান্য করেছেন।

যে কাজে এ দেশে কোনো পূর্ব ঐতিহ্য ছিল না, ছিল কথকতা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, কবিগান এবং গীতাভিনয়ের আসর। যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু তখনও বহু চরিত্রের সমাবেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হত কিনা প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় ইউরোপীয় থিয়েটারের আদলে বেঙ্গলি থিয়েটারের প্রবর্তনে নিঃসন্দেহে পথিকৃতের মর্যাদায় তিনি স্বীকৃত হবেন, এটা জেনেও বঙ্গীয় গুরুকেই তিনি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদেন করেছেন। ওটাই তার পূর্ব ইউরোপীয় মহত্ব।

এখন হায়াৎ সাহেব বা অন্য কোনো লিয়েবেদেফ গবেষক যা বলেননি, আমরা তা বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে বাংলা থিয়েটারের প্রবর্তনে রুশি-বঙ্গীয় একাত্মতা সাম্রাজ্যবাদী আভিজাত্য ও উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে একটা স্পর্ধা ও দেশাত্মবোধক আবেগের জন্ম দিয়েছিল। ইউরোপীয় শোষণ বঞ্চনার মধ্য দিয়েই নিঃসৃত হয়ে এসেছিল তাদের উন্নত যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা ও সংস্কৃতি। যা আমাদের জড়ত্বকে ভাঙছিল নানান দিক থেকে, গড়ে দিচ্ছিল স্বাধীন গণতান্ত্রিক মানস। এই উন্নত মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে— তার মধ্যে জনসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে শিক্ষাবিস্তার ও ছাপাখানার যেমন ভূমিকা ছিল, তেমনই ভূমিকা ছিল নাটকের, আরও প্রাঞ্জল করে থিয়েটারের। কোনো ইংরেজ বুদ্ধিজীবী তখনও চায়নি যে বাঙালিরা থিয়েটার করুক। কারণ থিয়েটারের মধ্যে নিহিত আছে জনচেতনা বিস্তার ও তাকে সংগঠিত করার শক্তি। সাধ করে কে আর বিজিত জাতির হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিতে চায়, যতই থাক না তাতে প্রমোদের বহিরাবরণ। তাই বাংলা থিয়েটারের প্রথম যবনিকা উত্তোলিত হল পূর্ব-ইউরোপীয় ও বঙ্গীয় শক্তির সমবেত প্রেরণায়। আমরা সিদ্ধান্ত নেবার কেউ নই, তবু বলতে ইচ্ছে করে গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফের সঙ্গে সমান মর্যাদায় বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের নামও উচ্চারিত হওয়া দরকার। বলতে গেলে গোলকনাথ দাসই সেই সংগঠক, যাঁর প্রভূত পরিশ্রম ও উৎসাহে ১৭৯৫-র ২৭শে নভেম্বর বেঙ্গলি থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। *'কাল্পনিক সংবদল'* বা *'ছদ্মবেশ'* সেই প্রথম নাট্যরূপান্তর যার রেশ আজও বাংলা থিয়েটারের মেদ-মজ্জা, রস-রক্তের শারীরী অস্তিত্বকে নিরন্তর সজ্জিত করেই চলেছে।

লিয়েবেদেফ থেকে দুশো বছরের বাংলা নাটক

'লিয়েবেদেফ থেকে দুশো বছরের বাংলা নাটক' এই শিরোনামে যখন প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় স্থির হয়ে আসে সম্পাদকের দপ্তর থেকে, তখন কিছুটা বিস্মিতই হতে হয়। সম্পাদক কী করে ধারণা করলেন যে লিয়েবেদেফ থেকে বাংলা নাটকের সূত্রপাত? গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ তো আধুনিক বাংলা থিয়েটারের প্রবর্তক। রূপকারও বলা যেতে পারে। থিয়েটার আর নাটক তো এক নয়। নাটক থিয়েটারের একটা অংশ। সাহিত্যরূপেও বিবেচিত। গেরাসিম স্তেপানভিচ রুশি পর্যটক, বহু ভাষাবিদ, ভারততত্ত্ববিদ্ এবং বাংলা থিয়েটার তথা বঙ্গীয় নাট্যকলার প্রথম রূপকার।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা নাটকের ইতিহাস এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিবৃত্তের বিশিষ্ট ও সর্বাধিক বিশ্বস্ত ইতিহাসকারের প্রদত্ত বিবরণে লিয়েবেদেফকে কোথাও নাট্যকার রূপে অভিহিত করা হয়নি।

যা বলা হয়েছে তা হল ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর থেকে বাংলা থিয়েটারের প্রবর্তনা এবং এ কাজে জনৈক বিদেশি রুশীয়র উদ্যোগই প্রথম। গেরাসিম লেবেডফ বা লেবেডেফ তাঁর নাম। দুখানি ইংরেজি নাটক *'Disguise'* ও *'Love is the best doctor'* বাংলায় অনুবাদ করে বা করিয়ে বাঙালি অভিনেতা অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনয় করান। লিয়েবেদেফ যে নিজেই এই নাটক দুটির ভাষান্তর করতে পারেন বা করেছিলেন সে কথাও এই সব ইতিবৃত্তে সঠিক মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করা হয়নি।

আমরা এইরকম তিনজন প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকারের সাক্ষ্য আগে বিচার করে নিই, পরে সিদ্ধান্ত টানা যাবে।

*'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'*র দ্বিতীয় খণ্ডে সাহিত্য ঐতিহাসিক আচার্য সুকুমার সেন লিয়েবেদেফের নাট্যকর্ম সম্পর্কে বস্তুগত নিরাসক্তি থেকে মন্তব্য করেছেন 'বিলাতি ধরনের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল কলিকাতায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তারিখে। গেরাসিম লেবেডেফ (Gerasim, S. Lebedeff, ১৭৪৯-১৮১৮) নামে এক রুশ এই কাজ করিয়াছিলেন। ইহাতেই মঞ্চ গড়িয়া বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের তথা অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার আরম্ভ।' প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার সাহিত্য ইতিহাসে লিয়েবেদেফের নাট্যকর্ম সম্পর্কে মাত্র সওয়া চার পৃষ্ঠা স্থান নির্ধারণ করেছেন সাহিত্য ঐতিহাসিক।[১] আর *'বাংলা নাটকের ইতিহাস'* প্রণেতা ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ লিয়েবেদেফ সম্পর্কে আলোচনা কালে ব্যয় করেছেন ১৬ থেকে ১৮ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ২০টি পঙক্তি।[২]

সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথ্যবিদ্ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'* গ্রন্থের সূত্রপাত করেছেন 'হেরাসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা' শীর্ষক অধ্যায় মাত্র সাড়ে তিন পৃষ্ঠায়। তাতে মন্তব্য করেছেন, 'প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ সনে। ইহার সহিত পরবর্তীকালের বাংলা নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ এই নাট্যশালার বাঙালী অভিনেতা অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন।' এঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের *'বঙ্গীয় নাট্যশালা'*তেও ঐ একই কথা, কোনো নতুন ব্যাখ্যা দেননি।

উপর্যুক্ত তিনজন ইতিহাসবিদ্ মোটামুটি একটি ক্ষেত্রে মতৈক্য পোষণ করেন যে লিয়েবেদেফই প্রথম বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁর উদ্যোগেই যে 'বিলাতি ধরনের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয়' এ কথা সুকুমার সেন বলেন। 'বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয়' এই কথাকে আর একটু বিস্তৃত করে বলেন 'বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের তথা অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার আরম্ভ'। অর্থাৎ লিয়েবেদেফই যে অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার প্রবর্তনা করলেন এবং *'Disguise'* নামক ইংরেজি নাটক থেকে বঙ্গানুবাদ যে তাঁরই করা, আচার্য সেন এ কথা স্বীকার করেন[৩] এবং ঐ 'বাঙ্গালা নাটক' সম্পর্কে বলেন, 'তাঁহার বাঙ্গালা জ্ঞানের যে পরিচয় পাই তাহা বিদেশীর পক্ষে প্রশংসনীয়, এই পর্যন্ত। কথ্যভাষার পদ পদাংশ ও ইডিয়ম কিছু কিছু তাঁহার বেশ আয়ত্ত হইয়াছিল কিন্তু সে ভাষার সিনট্যাক্স তিনি ধরিতে পারেন নাই।' লিয়েবেদেফের এই ইংরেজি নাটকের ভাষান্তরণ, যা আসলে বঙ্গীকরণ বা নাট্যরূপদান, সে সম্পর্কে উওরকালে ড. মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত (১৯৬৩) *'কাল্পনিক সংবদল'*-এর পাঠ বিশ্লেষণ করেও আচার্য সেন লিয়েবেদেফের মূল হস্তলিপির প্রতিলিপি চাক্ষুষ করার সুযোগ পাননি বলে ব্যক্তিগত ক্ষোভ দমন করতে পারেননি। পাদটীকায় লিখে গেছেন, 'প্রকাশিত গ্রন্থের কতখানি খাঁটি আর কতখানি জাল, অথবা সবটাই খাঁটি কিংবা সবটাই জাল সে বিষয়ে আমার মনে সংশয় রহিয়া গেল'। অর্থাৎ লিয়েবেদেফের নাট্যকার অস্তিত্ব স্বীকার করেও স্বীকার করলেন না।

আর ড. অজিতকুমার ঘোষ তো লিয়েবেদেফের *'Disguise'*-এর বঙ্গীকরণের কৃতিত্ব দিয়ে দিলেন লিয়েবেদেফের ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের প্রতি। ড. ঘোষ লিখছেন, 'তিনি Bengali Theatre নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা *'Disguise'* ও *'Love is the best doctor'* নামক দুইখানি ইংরাজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করাইলেন। লিয়েবেদেফের এই বেঙ্গলি থিয়েটার স্থাপন ও *'Disguise'* নাটকের বঙ্গীকরণ *'কাল্পনিক সংবদল'* নিয়ে পরবর্তীতে এত বেশি আলোচনা হয়ে গেছে যে ড. ঘোষের এই প্রথম দিকের অভিমত সম্পর্কে আর কোনো সংশোধিত মন্তব্যই তাঁর গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে নজরে পড়ে না।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ লিয়েবেদেফের উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম বাংলা নাট্যশালাকে স্বীকার করেছেন, 'এই নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেতা অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটকের অভিনীত হওয়া'র ঘটনাকে, কিন্তু 'ইহার সহিত', 'পরবর্তীকালের বাংলা নাট্যশালার কোন যোগ নাই'। কারণ 'ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন'। বাঙালি শ্যভিনিজমই যে আচার্যকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু উপনিবেশবাদের অন্ত্যর্থক ফলশ্রুতিকে কি ওড়ানো সম্ভব? সম্ভব যে নয় এই দুশো বছর বাংলা নাটকের ইতিহাসই সে কথা বলবে।

লিয়েবেদেফই প্রথম আধুনিক বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনক এবং তিনিই পাশ্চাত্য থিয়েটার অনুপ্রাণিত প্রথম বাংলা নাটকের স্রষ্টা।

লিয়েবেদেফ যে বাংলা থিয়েটারের আদি প্রতিষ্ঠাতা নন, আদি নাট্যকারও— এ তথ্য বাংলায় প্রথম উচ্চারিত হয় অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত '*বাসন্তী*' পত্রিকায় প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র নিবন্ধে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। '*পুরাতন প্রসঙ্গ : বাঙ্গালার আদি নাট্যকার*' শীর্ষক আলোচনাটি বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক লিয়েবেদেফ বিশেষজ্ঞ হায়াৎ মামুদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা যাক। অমরেন্দ্রনাথ উল্লিখিত নিবন্ধে লিখছেন :

'আজ যাহার কথা বলিব তিনি বাঙ্গালী নহেন, ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশের লোক নহেন, এমন কি ইংরেজও নহেন, তিনি রুষিয়ার লোক। হেরাসিম লেবেডেফ জাতিতে রুষ বটেন, কিন্তু ভারতের সহিত, বিশেষতঃ বাঙ্গালার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বাঙ্গালী কখনও তাঁহার নাম করে না, নাম বোধ হয় জানেও না, কিন্তু বাঙ্গালার নাট্যমন্দিরের ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। কারণ বাঙ্গালা নাটক তিনিই সর্ব্বপ্রথম লিখিয়াছিলেন এবং এদেশে রঙ্গমঞ্চ জিনিষটাও মনে হয় তাঁহারই হাতে প্রথম গড়িয়া উঠিয়াছিল।

'হেরাসিম জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি কৃষকের সন্তান। প্রথম জীবনে রুষ-রাজদূতের কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তিনি নেপলস্ শহরে গমন করেন, তারপর প্যারিস ও লণ্ডনে কিছুকাল অবস্থান করিয়া রাজদূত রূপে মান্দ্রাজে আগমন করেন। এখানে দুই বৎসরকাল থাকিয়া তারপর ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস সে সময়ে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। বাঙ্গালার রাজনৈতিক আকাশের কুজ্ঝটিকা তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল।

'হেরাসিম এইসময় কলিকাতায় থাকিয়া একজন পণ্ডিতের নিকট বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার বেশ আধিপত্য জন্মিয়াছিল। ১৭৯৫ অব্দে তিনি দি ডিসগাইজ এবং "Love is the best doctor" নামক দুইখানি বিলাতী নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। এই ১২৪ বৎসর পূর্ব্বে নাটকাকারে আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তক এদেশে ছিল বলিয়া অদ্যাবধি শুনি নাই। শুধু তাহাই নহে, হেরাসিম সাহেব এই সময় গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া কলিকাতায় একটি

রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাও করেন। এই রঙ্গমঞ্চেই তাঁহার বঙ্গানুবাদিত প্রথম নাটকখানি (*The Disguise*) অভিনয় হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ও অভিনয়ের নাকি চারিদিক হইতে খুব প্রশংসাও হইয়াছিল। যাহা হউক, হেরাসিম যাহা এদেশে করিয়াছিলেন তাহা স্মরণযোগ্য। ১০৪ বৎসর কাল গত হইল, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।'[৪]

সামান্য তথ্যগত ভুলভ্রান্তি থাকলেও উদ্ধৃত নিবন্ধকার সর্বপ্রথম লিয়েবেদেফকে বাংলার আধুনিক থিয়েটারের পথিকৃৎ নাট্যকারের প্রাপ্য সম্মান দেন ১৯২১-এ। বাংলায় লিয়েবেদেফের নাম ও বেঙ্গলি থিয়েটারের কথা অবশ্য প্রথম জানান নগেন্দ্রনাথ বসু *'বিশ্বকোষ'* গ্রন্থের ১৬শ খণ্ডে ১৯০৪ সালে। এরপর ১৯২৩-এর *'ক্যালকাটা রিভিউ'* পত্রিকায় অধ্যাপক মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় '*The Early English Theatre and the Bengali Drama*' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন আগস্ট সংখ্যায়। এতে বাংলার আদি নাট্যকবি হিসেবে লিয়েবেদেফের নামোল্লেখ না থাকায় ভাষাবিদ্ পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন, যাঁর মাধ্যমে এ দেশের এই শতকের শিক্ষিত মানুষজন লিয়েবেদেফ সম্পর্কে প্রথম অবহিত হন শতকের গোড়ায়, কলম ধরেন *'ক্যালকাটা রিভিউ'*-এর অক্টোবর সংখ্যায় ঐ একই শিরোনামের প্রবন্ধে। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র নভেম্বর সংখ্যায় প্রসঙ্গকে বিস্তারিত করেন। লিয়েবেদেফ যে ভাষাবিদ্ ব্যাকরণবিদ্ তথা প্রথম রুশ ভারততত্ত্ববিদ্ও ছিলেন এ সব তথ্যও ততদিনে আমরা জেনেছি গ্রিয়ার্সনের মাধ্যমে। এরপর লিয়েবেদেফ সংক্রান্ত গবেষণা সবিশেষ গুরুত্ব পায় নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। এই ১৯১৩ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত লিয়েবেদেফ গবেষণায় প্রভূত তথ্য হাতে আসার পরেও উপর্যুক্ত ঐতিহাসিকরা তাঁদের অবস্থান বদলাননি। এতে আশ্চর্য হতে হয়। অবশ্য এই সময়কালের মধ্যেই নাট্য ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত *'প্রথমাভিনীত খাঁটি বাঙ্গালা নাটক'*[৫] শীর্ষক প্রবন্ধে '*The Disguise*' বঙ্গীকরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন অথচ তাঁর *'বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত'* (১৯৪৭) গ্রন্থে মাত্র একটি ৮ পঙ্ক্তির অনুচ্ছেদ রেখেছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর লিয়েবেদেফ প্রসঙ্গ আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতি জগতে বিশেষ গুরুত্ব পায় ভারত-রুশ সম্বন্ধের আন্তরিকতায় এবং বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিপ্লবের পীঠভূমি রাশিয়া তথা সোভিয়েত সম্পর্কে আমাদের দীপ্ত উৎসাহই লিয়েবেদেফের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনার নতুন দরজা খুলে দেয়। এই প্রসঙ্গে ভাষাবিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য মান্য করতে হয়। তিনি ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা সম্পাদিত গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লেবেদেফ রচিত '*A Grammar of the pure and mixed East Indian Dialects*' গ্রন্থের মুখবন্ধে ১৯৬৩তে স্মরণ করছেন 'It was only in 1955 that for the first time in India the memory of Lebedev was sought to be revived, at a meeting by the Indian People's Theatre Association in Calcutta on the occasion of the 160th year of Lebedev's first performance which took place in 1795'। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ১৯৫৫-য়

লিয়েবেদেফ আয়োজিত প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়ের ১৬০ বছর পূর্তির আয়োজন করেছিলেন, আজ ১৯৯৫-এ ২০০ বছর পূর্তির আয়োজন চলছে। ততদিনে লিয়েবেদেফ সংক্রান্ত অনুসন্ধান প্রায় পূর্ণাঙ্গ আকার নিয়েছে তথাপি ২০০ বছর পূর্তিকালেও লিয়েবেদেফ যে বাংলার প্রথম সফল প্লে-স্ক্রিপট রচয়িতা, সে কথা আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে '*The Disguise*' এর মূল পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছে। ড. মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত '*কাল্পনিক সংবদল*'-এ জোডরেল বিরচিত '*দি ডিসগাইজ*' নাটকের জি. এস. লেবেডেফ 'কৃত বঙ্গানুবাদ' গ্রন্থটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এই কালের মধ্যে ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বিলেত থেকে ফিরে '*দেশ*' সাপ্তাহিকের ১৯৫৫-র সাহিত্য সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন '*গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেদিয়েভ*', ১৯৬১-র 'দেশে' আবার লিখলেন 'লেবেডেফ্ চর্চার নূতন পর্ব' এবং ঐ বছরই '*কথাসাহিত্য*' পত্রিকায় লিখলেন '*প্রথম বাংলা নাটক*'। ১৯৬২-তে লন্ডন থেকে ড. শিশিরকুমার দাস মৎ-সম্পাদিত '*গন্ধর্ব*' পত্রিকায় '*ছদ্মবেশ*' প্রবন্ধে '*The Disguise*'-এর উৎসসূত্র ব্যাখ্যা করলেন। আর ১৯৬৩-তে ড. গোস্বামী আমাদের হাতে তুলে দেন নাট্যকার লিয়েবেদেফের আসল নাট্যরূপ।

'*কাল্পনিক সংবদল*' '*The Disguise*'-এর সার্থক রূপান্তর কিনা এ নিয়েও বিস্তর ও বিস্তৃত আলোচনা পেলাম ডক্টর অরুণ সান্যাল রচিত '*বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ*' (১৯৭২) ও হায়াৎ মামুদ রচিত '*গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ*' (১৯৮৬) গ্রন্থদ্বয়ে। লিয়েবেদেফ সংক্রান্ত সর্বশেষ গবেষণা ও আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী ১৯৮৮-তে '*কলকাতায় আমি ও আমার থিয়েটার*' লেবেদেফের আত্মকথা সংগ্রহ ও সম্পাদনার মাধ্যমে।

'*কাল্পনিক সংবদল*' শীর্ষক গ্রন্থ হাতে পাবার পরও যাঁরা লিয়েবেদেফকে বাংলার আদি নাট্যকারের সম্মান দিতে প্রস্তুত নন, তাঁদের বাঙালিত্ব অটুট থাকুক, কিন্তু লিয়েবেদেফ যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কালে অধিপতি সংস্কৃতির রাজ্যে প্রবেশের অন্যতম চাবিকাঠি বাঙালি সংস্কৃতির রথীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তার উপনিবেশ শাসনকে সুসহ করার জন্য বাঙালির মধ্যে বহুবিধ তাঁবেদার খুঁজে গেছে কেরানি থেকে বুদ্ধিজীবী। সাহিত্যের পশ্চিম দুয়ার অবাধে খুলে দিয়েছিল, নাট্য সাহিত্যেরও, কিন্তু বাঙালির থিয়েটার হোক, এটা সম্ভবত তারা চায়নি। কারণ তারা জানত থিয়েটার এমন একটা শাঁখের করাত যা যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। মানুষের চেতনাকে ঘুম পাড়াতেও লাগে, আবার জাগাতেও। এই জাগানোর ক্ষমতা থিয়েটারের হাতে বেশি ছিল বলেই কোনো ইংরেজ বুদ্ধিজীবী বাঙালি তাঁবেদার বুদ্ধিজীবীকে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে উৎসাহ জোগায়নি। রুশি ভারতপ্রেমিক সেই বেঙ্গলি

থিয়েটার নির্মাণ করেছিলেন বলে জাতক্রোধ থেকে ইংরেজ সেই থিয়েটার পুড়িয়ে তাঁকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করল। এ কেবল সাংস্কৃতিক চক্রান্ত নয়; রাজনৈতিক চক্রান্তও। তাই ১৮৭২-এ যখন বাঙালিরা ভারতের প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শুভ্র মুখ নীলবর্ণ করে তুলল *'নীলদর্পণ'*-এর প্রতিবিম্বে, তখন চার বছর যেতে না যেতেই ব্রিটিশ শাসক ১৮৭৬-এ বাঙালি তথা সমগ্র ভারতীয় থিয়েটারে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা বন্ধ করার জন্য কালাকানুন জারি করেছিল। অধিপতি সংস্কৃতি আতঙ্কিত হল বিজিত সংস্কৃতির স্বাধিকার অর্জনে।

সুতরাং *'লিয়েবেদেফ থেকে ২০০ বছরের বাংলা নাটক'* এই প্রতিপাদ্য রচনায় লিয়েবেদেফকেই আজকের বাংলা নাটকের পথিকৃতের স্বীকৃতি দিয়ে *'নন্দন'* পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় কোনো ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেননি।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা *'কাল্পনিক সংবদল'*-এর অনুপুঙ্খ আলোচনায় যাব না। আমরা কেবল এই নাট্য প্রয়াসের মধ্যে লক্ষ করব বাংলা নাটক রচনা, নাট্যমঞ্চ নির্মাণ ও অভিনয় প্রয়োগের মধ্যে বাঙালির পরবর্তী নাটক রচনা ও নাট্যনির্মাণ পদ্ধতির কতকগুলি প্রবণতার, তার বীজের।

লিয়েবেদেফ সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাট্যপ্রবাহ সম্পর্কিত পরম্পরা সৃষ্টি করতে পারতেন। রুশীয় ঐতিহ্যে থিয়েটারের বিশেষ স্থান ছিল, সঙ্গীতেরও। লিয়েবেদেফ কোনো রুশ নাটকও অনুবাদ করতে পারতেন, সে কাজটায় ইংরেজি থেকে রুশ, রুশ থেকে বাংলা করার পরিশ্রম অন্ত বাঁচত। তা না করে তিনি দুখানি ইংরেজি নাটক বাছাই করলেন কেন? এবং দু-খানিই প্রহসন কেন? এবং *'The Disguise'* ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রহসন, আর দ্বিতীয় যে নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন *'Love is the Best Doctor'*, যার কোনো অভিনয়ের সুযোগ পাননি এবং অনূদিত পাণ্ডুলিপিও অদ্যাপি বেপাত্তা, সেটি ফরাসি নাট্যকার মল্যেয়ারের *'L'Amour medecin'* অনুপ্রাণিত কোনো ইংরেজি নাটক থেকে অনূদিত বলে অনুমান করা হয়।

সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পী লিয়েবেদেফ মাদ্রাজ ও কলকাতায় সঙ্গীতের আসর বসিয়ে জনপ্রিয়তা ও অর্থ দুই উপার্জন করেছিলেন। তাঁর জীবিকার্জনের অন্য কোনো বিশেষ তথ্য জানা যায় না। ভাষাচর্চার প্রতি আকর্ষণ ও তন্নিষ্ঠ পরিশ্রম তাঁকে জীবিকার্জনের সুযোগ নিশ্চয়ই দেয়নি। নিতান্তই সঙ্গীতপ্রীতি ও দেশীয় ভাষাচর্চা তাঁকে নাট্যানুবাদে আকৃষ্ট করতে পারে এবং মঞ্চে প্রয়োগের পরামর্শ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের কাছে থেকে। তৎকালে এ দেশীয় আমোদ-প্রমোদ ও লোকরুচির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, অবহিত ছিলেন ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গীত নাচের আসর এবং ইংরেজি থিয়েটারের আয়োজন সম্পর্কে। আমাদের ধারণা বাঙালির নাট্য প্রয়োগের জগৎটা শূন্য দেখে, সেই শূন্যস্থানে পথিকৃতের ভূমিকা পালনের উৎসাহই তাঁকে নাট্যানুবাদ নয়,

নাট্যরূপান্তরে (adaptation) ব্রতী করে। *'ডিসগাইজ'* নাটকের কেবল অনুবাদ করেননি, নাটকের নামধাম পাত্রপাত্রী আচার-বিচার সংলাপ সব কিছুই দেশীয় আধারে রিকাস্ট করে নেন। এবং যথেষ্ট পরিকল্পনা করেই লিয়েবেদেফ এই অকর্ষিত ক্ষেত্রে প্রথম ফসল উৎপাদনে অগ্রসর হন। তাঁর স্লাভ মানসিকতায় এ দেশীয় জনজীবনের গতিপ্রকৃতির সঠিক অনুভব করেছিলেন বলেই কোনো ভাবগম্ভীর বিয়োগান্ত নাটক নয়, এমন কী জনপ্রিয়তম শেক্সপিয়ারও নন, নিতান্তই সাদামাঠা ভুল বোঝাবুঝির প্রহসন মৌখিক ভাষাভঙ্গিতে প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে যেমন তেমনই কলকাতার ইংরেজি মঞ্চেও সেকালে প্রহসন অভিনয়ের কদর ছিল বেশি। আর বাঙালি সমাজের তখন সঙ্ সাজা, সঙের নাচ, গান ও নাট্যাভিনয়ের তারল্যপ্রীতি গেরাসিম লক্ষ করেছিলেন বলেই এই প্রহসনের নাট্যরূপে উৎসাহিত হন। রুশীয় ভাষায় লেখা কোনো নাটক তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই ছিল না। ইংরেজি নাটক পাওয়া সহজ, তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এ নাটক দুটি।

বারান্নিকভ তাঁর *'Book about India's Great Friend'* গ্রন্থে তাই বলেছেন 'Lebedev was well acquainted both with the classical and with the folk theatre of India. Wishing to acquaint the Indians with European theatre, he devoted much effort to organizing a company to teaching the actors how to act in the European manner.'

লিয়েবেদেফের নিজের সাক্ষ্যেও জানা যায় : 'বাংলা এবং হিন্দুস্থানের সাধারণ মিশ্রভাষা শিখতে আমাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। যতদূর সম্ভব শিখেছিলেন সংস্কৃত ভাষাও।'[৬] ...'এবার আমার মূল কাজে হাত দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হলো। আমার সমস্ত জ্ঞান নিয়ে আমার নতুন শব্দভাণ্ডারকে আমি এবার মিশ্রভাষা ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করলাম। শুধু শব্দভাণ্ডারই নয়, সেইসঙ্গে বেশ কিছু সংলাপও আমি অনুবাদ করলাম মিশ্র ও বাংলা ভাষায়। এমন সব সংলাপই চয়ন করেছিলাম যেগুলি প্রতিদিনকার কথাবার্তায় লোকের মুখে মুখে ফেরে।'[৭] লক্ষ করার বিষয়, বাংলা ভাষার মৌখিক নীতি আয়ত্ত করার জন্য নাটক অনুবাদ করার আগেই লিয়েবেদেফ নিজেকে কেমন অনুশীলনরত রেখেছিলেন। তারপর লিয়েবেদেফের নিজের মুখেই শোনা যাক তাঁর কথা 'এইসব গবেষণামূলক কাজে সফল হওয়ার পর আমি একটু বড়ো ধরনের অনুবাদ শুরু করলাম। বাংলায় অনুবাদ করলাম *'দ্য ডিসগাইজ'* এবং *'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর'* নাটক দুটি। অবশ্যই অনুবাদের জন্য এই দুটি নাটক বেছে নেওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম মোটামোটা ভারীগোছের অভিনয় ভারতীয়েদর তেমন পছন্দ নয়। বরং ব্যঙ্গকৌতুক, পরিহাস, ভাঁড়ামো, পুতুলনাচ ইত্যাদিতে তাঁদের উৎসাহটা বেশী। সেই কারণেই বেছে নিয়েছিলাম *'দ্য ডিসগাইজ'* এবং *'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর'*। এই নাটক দুটি আগাগোড়া একদল চৌকিদার, চোর, ঘুনিয়া, উকিল, গোমস্তা এবং বেশ কিছু দস্যু বা লুটেরা চরিত্রে ঠাসা ছিল।'[৮]

লিয়েবেদেফ আত্মকথনের পাশে তাঁর রূপান্তরিত বাংলা *'কাল্পনিক সংবদল'*-এর পাঠ গভীরভাবে অনুধাবনে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর রচিত বাংলা গদ্যসংলাপ সে যুগের পক্ষে কত অনায়াস ছিল, আড়ষ্ট মোটেই নয়। ১৮০১-এর আগে যেখানে বাংলা গদ্যরীতিই লিখিত ভাষারূপ পায়নি, সেখানে *'কাল্পনিক সংবদল'*-এর গদ্যসংলাপকে বলা যায় কেবল বাংলা নাটক বা তার সংলাপের ক্ষেত্রে নয়, বাংলা মৌখিক গদ্য ভাষারও চমৎকার দৃষ্টান্ত। যে সিনট্যাক্সের কথা, কিংবা বিরতিচিহ্নের অভাবের কথা ভাবছি তা তো প্রথম সঠিক রূপ পেয়েছিল বিদ্যাসাগেরর হাতে। মৌখিক গদ্যের অন্বয়কে বিপরীত ক্রমে সাজিয়ে যে সংলাপের মজা করা যায়, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত একালের বিশিষ্ট নাট্যকার উৎপল দত্তের 'সাদা পোশাক' যাত্রাপালায় লক্ষ করা যায়। তাই লিয়েবেদেফের সংলাপে :

রামসন্তোষ ॥ কি তুমি জান তাহাকে

ভাগ্যবতি॥ হঁ গোলাব আওর আওর পরমসুন্দরি কিবা তাহার খুদ্র চরণকমল দুইখানি অছিল দেখসিয়া এক কটাক্ষ সেই অদিস্মী চন্দ্রমখের ছী ছী রামসন্তোষ কি মাপ করিতে বল আমাকে এখন বটে।

যখন পড়ি, তখন অবাক হব কেন, অভিভূত হই। একজন বিদেশি সেইকালে এমন গদ্য লিখেছিলেন কেমন করে। উপরের সংলাপে বিরতি চিহ্ন লিয়েবেদেফ দেননি, সম্পাদক ড. গোস্বামী দিয়েছিলেন ; আমরা তা বাদ দিয়েই ছাপলাম। এবার একালের যে কোনো সমর্থ নাট্য পরিচালক, ধরা যাক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত কিংবা বিভাস চক্রবর্তীকে যদি বলা যায়, এর সঠিক প্রয়োগ করুন, তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে তৎকালীন আঞ্চলিকতার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যসহই এর সঠিক স্ক্যানিং করে মঞ্চপ্রয়োগ করতে পারবেন। যেমন আজ থেকে দুশো বছর আগে নাট্য-পরিচালক গেরাসিম তাঁর বাঙালি নটনটীদের দিয়ে করিয়েছিলেন।

লিয়েবেদেফ কী করতে চলেছিলেন তা তিনি ভালোই জানতেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মর্মমূলে ঢুকে অধিপতি সংস্কৃতির সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির এমন এক সম্পর্ক নির্মাণ করলেন যে সেই সম্পর্কের যোগরূঢ় অর্থ নিষ্পত্তি হল 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। অর্থাৎ বাংলা থিয়েটার হয়ে উঠল সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গম। ১৭৯৫ সালে যখন কলকাতার ডোমটোলায় *'কাল্পনিক সংবদল'* অভিনীত হচ্ছে, ইংরেজি থেকে রূপান্তরিত এক বাংলা নাটক, গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ তার নাট্যকার নির্দেশক ; তখন ১৯৯৫ সালে কলকাতার বিজন থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে *'চন্দনপুরের চোর'*— এক বিদেশি নাটকের বঙ্গীকৃত নাট্যরূপ, নাট্যকার নির্দেশক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আশ্চর্য যে দুটি নাটকেই সঙ বদল ও প্রেমের জয় ঘোষণা হয়েছে। এই সাদৃশ্য নেহাত কাকতালীয় নয়, আন্তর প্রবণতা। লিয়েবেদেফ জন্ম দিয়েছেন নাট্যরূপ দানের এক প্রবণতার। বাংলা থিয়েটারে দুশো বছর ধরে সমান তালে এই প্রবণতা বিদ্যমান। সাধারণ রঙ্গালয়ের মাত্র একটি

দৃষ্টান্ত দিলাম, কলকাতার অন্যধারার থিয়েটারের মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি। এই মুহূর্তে কলকাতার বা মফস্বল বাংলার দুটি উল্লেখ্য প্রযোজনা অবশ্যই বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশিত ইবসেন অবলম্বনে ষাটের দশক মাতানো বহুরূপীর *'পুতুলখেলা'* এবং বহরমপুরের যুগাগ্নি-র *'মা অভয়া'* ব্রেশটের *'মাদার কারেজ'* অবলম্বনে মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে। নান্দীকারের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নির্দেশিত আর্থার মিলার অবলম্বনে *'ফেরিওয়ালার মৃত্যু'* ষাটের দশকে যা চতুর্মুখের প্রযোজনায় *'জনৈকের মৃত্যু'* নামে অভিনীত হত। চেতনা গোষ্ঠীও নান্দীকারের মতো প্রায়শ নাট্যরূপ বা অনূদিত নাটক করায় অভ্যস্ত। বর্তমানে *'দুখীমুখী যোদ্ধা'* অবশ্য সরাসরি বঙ্গানুবাদে হচ্ছে। অনীক গোষ্ঠী *'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'* অনূদিত নাটক মঞ্চস্থ করেছে। প্রতিবছর দশটি নাটকের সাতটি হবে এইরকম নাট্যরূপায়িত নাটক।

নাট্যরূপ প্রবণতার পাশে লিয়েবেদেফ বাঙালি নাট্যপ্রীতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অনুভব করে তাঁর নাটকের রূপান্তরের মধ্যে বেমালুম ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তা হল সঙ্গীতের প্রয়োগ। ভারতচন্দ্রের *'বিদ্যাসুন্দর'* সেকালে জনপ্রিয়তম সঙ্গীতালেখ্য। লিয়েবেদেফ কলকাতার পথে 'কানেরা' < কিন্নর (সঙ্গীত নৃত্যশিল্পী) বা 'গাউয়্যা-বাজিয়্যা-নাচিয়্যা' দলের সংযোজন ঘটান। থিয়েটারে সঙ্গীতের গুরুত্ব বিষয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের সাম্বৎসরিক উৎসবে নাট্যকার মনোমোহন বসুর বিখ্যাত বক্তৃতার কথা নিশ্চয়ই নাট্যরসিকদের মনে আছে 'আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়... যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নহিলে চলে না..... দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস আবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?' এইভাবে মনোমোহন বসু নাট্যপ্রয়োগে গানের প্রয়োজন নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর নিজের নাটক তো বটেই, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল— সবার নাটকেই গান এলো বন্যার গতিতে। গণনাট্যর যুগে নাট্যপ্রয়োগে গানের ব্যবহার কমে গেল বাস্তবতার স্বার্থে। কিন্তু গণনাট্য থেকে বেরিয়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাটক *'মরাচাঁদ'* জনপ্রিয় হল ঐ গানের কারণেই। ষাটের অন্তিমে সত্তরের সূত্রপাতে অন্যধারার থিয়েটারে গান আবার প্রচণ্ড বলবতী হল। নান্দীকারে *'তিন পয়সার পালা'* (১৯৭০) এই ধারার প্রবর্তক। এই সেদিন প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ফেলল সঙ্গীতসমৃদ্ধ আধুনিক লোকনাটক অন্য থিয়েটারের *'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'*। *'জোছনাকুমারী'*ও তাই। সাম্প্রতিক অনূদিত নাটক *'দুখীমুখী যোদ্ধা'*ও সঙ্গীতপ্রধান।

লিয়েবেদেফ কমেদিয়া দেল আর্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৯] তাঁর নাট্যপ্রয়োগে দেশীয় অভিনয় রীতির ভাঁড়ামো অনুসরণ করেছিলেন। এই জন্য *'কাল্পনিক সংবদল'* পড়ে অনুমান করা যায় তিনি সম্ভবত স্ল্যাপস্টিক অভিনয় রীতিই অবলম্বন করেছিলেন।

এই অভিনয় রীতির প্রতি বাংলা থিয়েটারের একটা নিজস্ব দুর্বলতা আছে। গিরিশ যুগে অর্ধেন্দুশেখর এই অভিনয় রীতিতে 'অর্ধেন্দুরী' বলে পরিচিত ছিলেন। প্রহসন রচনা ও অভিনয়ে বাংলা থিয়েটারের যে পারঙ্গমতা তার সূচনা ঐ *'কাল্পনিক সংবদল'* থেকেই। মাইকেলের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা দুখানি প্রহসন, দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক ট্রাজি-কমেডি *'সধবার একাদশী'*, গিরিশচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক *'আবু হোসেন'*, *'য্যায়সা কা ত্যায়সা'*; ক্ষীরোদপ্রসাদের *'আলিবাবা'*ই তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। এইরকম একালেও। উৎপল দত্ত অভিনেতা হিসেবে তো অর্ধেন্দুর সাক্ষাৎ উত্তরসূরী। এবং নাট্যনির্মাণেও ব্যঙ্গকৌতুকের ঔজ্জ্বল্য তাঁর রাজনৈতিক থিয়েটারের বিশিষ্ট ঐশ্বর্য ছিল। নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্রও কমিক অভিনয়ে চমৎকৃত করেছেন। নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্র তাঁর কৌতুক সংলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। *'নরক গুলজার' 'সাজানো বাগান' 'রাজদর্শন'* উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও উদ্ভট ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক সংলাপে অনায়াস। *'মহাকালীর বাচ্চা' 'স্বদেশী নকশা'*, সম্প্রতি রচিত ও সংস্তব প্রযোজিত *'সুন্দর' 'মুষ্টিযোগ'* কিংবা নান্দীপট প্রযোজিত *'মৃত্যু না হত্যা'*, প্লে-মেকার্স প্রযোজিত *'গজানন চরিত মানসে'*র জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে লিয়েবেদেফ আজ থেকে দুশো বছর আগে যে বেগ তৈরি করে গেছেন, বাংলা থিয়েটার আজও সেই বেগে চলছে।

লিয়েবেদেফ *'কাল্পনিক সংবদল'*-এ যা যা করেছেন বাংলা থিয়েটারে দুশো বছর ধরে সেই সবই অনুসৃত হয়ে চলেছে— নাট্যরূপান্তর, গীতিময়তা, প্রাহসনিক কৌতুক-অভিনয় প্রাবল্য। আর তিনি যা করেননি, অথচ এই *'কাল্পনিক সংবদল'* প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে তিনি তাঁর এই নাট্য প্রয়োগের কেন্দ্রে রেখেছিলেন, তা হল নাটকের উদ্দেশ্য 'সত্য যাতে মিথ্যাকে নস্যাৎ করে বিজয়ী হতে পারে'। এটা তো ঠিক ছদ্মবেশ ধারণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষা একটা কমেডি নাটকের সাধারণ লক্ষ্য। আমরা লিয়েবেদেফের এই নাট্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যের মধ্যে আর একটা গূঢ় অর্থ নির্ণয় করে নিতে পারি। তা হল 'সত্য যাতে মিথ্যাকে নস্যাৎ করে বিজয়ী হতে পারে'। থিয়েটারের শাশ্বত লক্ষ্য সত্যের জয়। থিয়েটার নিজে মিথ্যা। সত্যর অনুকরণের মধ্য দিয়েই থিয়েটার ভয়ঙ্কর মারাত্মক সত্যের উদ্ঘাটন করে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত জোসেফ ব্যাটলকে দিয়ে বেঙ্গলি থিয়েটার পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করতে পারে, কিন্তু পুড়েও যা পোড়ে না সেই বাংলা থিয়েটার তার জন্মের সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন ১৮৬০-৭২-র মধ্যে ছোট ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তখনই বোঝা যায় ১৭৯৫-র বেঙ্গলি থিয়েটার নির্মাণের মধ্য দিয়ে লিয়েবেদেফ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এক রাজনৈতিক প্রতিবাদী মঞ্চ। টিনের তলোয়ার মিথ্যা খেলনা হতে পারে, কিন্তু নকল তরবারির উদ্যত নিশানাকে শাসকশ্রেণী বড় ভয় পায়।

দুশো বছরের বাংলা থিয়েটারের এই রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদী ভাষা রচনায় লিয়েবেদেফের প্রত্যক্ষ অবদান নেই, কিন্তু পরোক্ষ অবদান প্রায় ভিত্তিনির্মাণ থেকেই।

বাংলা থিয়েটার সমাজ বাস্তবতার কেবল প্রতিরূপ নয়, তার থেকে ঈষৎ প্রসারিত, ঈষৎ উন্নত একটা সত্যস্বরূপে নিজেকে বারবার ভেঙে গড়ে নতুন এবং আপনার করে গড়তে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সযত্নসাধিত সেই থিয়েটার, যে কখনই বাস্তবের প্রতিকৃতি নয়; বস্তুসত্যের অন্তর্গত দ্বান্দ্বিকতার সার্থক অভিব্যক্তি। গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত— বাংলা থিয়েটারের এই পাঁচটি স্তম্ভ রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারের মতোই কখনই বাস্তবের অবিকল নকল ছিল না, ছিল ঈষৎ প্রসারিত, ঈষৎ উন্নত, সর্ব অর্থে প্রতিস্পর্ধী। বৈপ্লবিক কল্পনার দ্বারা ভাবোন্নত। লিয়েবেদফ থেকে দুশো বছরের বাংলা নাটক কী সাহিত্যমূল্য, কী প্রয়োগমূল্য, যেদিকেই বিচার্য হোক, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার্য।

পাদটীকা :

১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* শ্রীসুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৭৭, পৃঃ ৩৮-৪২।

২। *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* শ্রী অজিতকুমার ঘোষ, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬-১৮।

৩। *'ইংরেজি হইতে দুইটি নাটক লেবেডেফ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।*

৪। *পুরাতন প্রসঙ্গ : বাঙ্গালার আদি নাট্যকার, বাসন্তী,* সাপ্তাহিক, রবিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮। সংখ্যা। দ্রঃ *গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ,* হায়াৎ মামুদ, বাংলা আকাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৯-৪১।

৫। *'প্রথমাভিনীত খাঁটি বাঙ্গালা নাটক', সাহিত্যের কথা,* হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৪৬।

৬। *কলকাতায় আমি ও আমার থিয়েটার,* তন্দ্রা চক্রবর্তী, *নাট্যচিন্তা,* ১৯৮৮, পৃঃ ৪৫, দ্রঃ *Lebedeff's Autobiography* অবলম্বনে।

৭। ঐ, পৃঃ ৩৯।

৮। ঐ, পৃঃ ৪০।

৯। *গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ,* হায়াৎ মামুদ, বাংলা আকাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৩৮।

[*বাংলা নাটকের দুশো বছর, নন্দন* ৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৫, পৃঃ ২৯-৩২]

কলকাতা নামে নাট্যমঞ্চ, নাট্যদল, নাটক

কলকাতা নামে নাট্যমঞ্চ, নাট্যদল আর নাটক প্রকৃতপক্ষে কলকাতা নামক আবেগের উচ্চারণ। একে আর একটু গভীর করে বলতে গেলে বলতে হয় কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গসংস্কৃতির অভিব্যক্তি। সেই কলকাতার আজ তিনশত বৎসর পূর্তির এক ব্যাপক আয়োজন।

কলকাতার জীবনযাপন, জনসংখ্যা, জনবসতি, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা নিয়ে আজ ব্যাপক অনুসন্ধান চলছে কাগজে-কলমে, মাঠে-ময়দানে, সভা-সমাবেশে, এ এক দীর্ঘ ও প্রসারিত আলোড়ন, কলকাতা কবে কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে— সেই স্বপ্নে ১২৮৭ কোটি টাকার দাবি উঠেছে কলকাতাকে বাঁচাতে।

কলকাতা কী তবে মৃত নগরী, মুমূর্ষু নগরী, দুঃস্বপ্নের নগরী? না, কলকাতা এর কোনোটাই নয়, কলকাতা এক ডায়ালেকটিস্।

'হঠাৎ নির্বাচিত, হঠাৎ সৃজিত শহর'ই বলা হোক, আর প্রাসাদপুরী কলকাতা কিংবা মিছিলের শহর বা দুঃস্বপ্নের নগরী বলেই চিহ্নিত করতে চাওয়া হোক না কেন, কলকাতা হল কলকাতাই। কলকাতা হল গোটা বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ নামক দেশ এবং বিশ্ব-পৃথিবীর আন্তর্জাতিক জনজীবনের জায়মান জীবন্ত নগর। সেই নগরীর নাটক, নাট্যদল আর নাট্যমঞ্চ তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনচেতনারই অপর নাম।

১৭৯৫-এ রুশদেশের নাগরিক কলকাতাকে ভালোবেসে এই শহরের বুকে প্রথম গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গলি থিয়েটার, কিন্তু তারও আগে ব্রিটিশরা এই শহরকে ভালোবেসে, এ শহরের বেঁচে থাকাকে আনন্দময় করতে দ্বিতীয় যে থিয়েটার নির্মাণ করে ১৭৭৫-এ, তার নাম দেয় দি নিউ প্লেহাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার', তারপর ১৮৩২ থেকে ১৮৭২-এর মধ্যে এ শহরের নাগরিক আগ্রহেই সৃষ্টি হয় নিজস্ব থিয়েটারের পরিমণ্ডল, এবং সেই উদ্যোগেরই মধ্যবিত্ত ব্যাপ্তি ও প্রসারিত স্বপ্নে স্থাপিত হয় প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭২-এ। এবং এই উদ্যোগের সূত্রপাতে প্রথম যে নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল তার নাম ছিল কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিকাল সোসাইটি।[২] 'কলিকাতা' নাম পরে বর্জিত হয় জাতীয় চেতনার উপর গুরুত্ব দিয়ে। এবং সেই নাটমঞ্চে যে নাটক *'নীলদর্পণ'* মঞ্চস্থ হল, তার প্রশংসায় বলা হয়েছিল 'নীলদর্পণের নবযৌবন হইয়াছে' অর্থাৎ নাট্য-সম্পাদনা ও প্রযোজনা-সৌকর্য যে নাট্যবস্তুর মর্মসত্যের উদ্ঘাটন করেছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ; কিন্তু সেই একই সমালোচনায় সমালোচক একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, 'নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে, মফস্বলে যে কাণ্ড

হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরীব রাইয়ত ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল. তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগরে, যশোহরে বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়।'[৩] অর্থাৎ নাট্যবস্তুর রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রযোজনার সার্থকতা কোথায় সে সম্পর্কে কলকাতা ও মফস্বলের দর্শক মানসিকতা প্রসঙ্গে সমালোচকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—যে প্রশ্ন বিংশ শতাব্দীর সাত বা আটের দশকের গ্রামজীবনভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামী নাটকের আকাদেমি রবীন্দ্রসদন কেন্দ্রিক প্রযোজনার সার্থকতা একালের বুর্জোয়া কাগজের নাট্যসমালোচকরাও মাঝেমধ্যেই তোলেন। তবে উক্ত সমালোচক, সম্ভবত শিশিরকুমার ঘোষ, একালের নেতিবাদী সমালোচকের মতো বলেননি; উনি বলেছেন কলকাতাবাসী দর্শকসমাজের একাংশের 'সমানুভূতি'র অভাব লক্ষ্য করে, কিন্তু এ প্রযোজনা যে কলকাতা তথা সমগ্র বঙ্গভূমির 'সমাজবাদ'-কর্ম এবং এর দ্বারা 'অভিনয়সমাজের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন' হবে, এ ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত। উক্ত ন্যাশনাল থিয়েটার, আমাদের বক্তব্য কলকাতায় পরিকল্পিত হয়েছে এবং কলকাতার মঞ্চভাবনা বা নাট্যরচনা যে কেবল কলকাতার নিজস্ব ব্যাপার নয়, সারা দেশের সমস্যা বা তার সমাধান; কিংবা দুটি দিক নিয়েই বিতর্ক সৃষ্টি করার সামর্থ্য রাখে, কলকাতা সেই কাজটাই সম্পন্ন করেছে, সাধারণ থিয়েটারের জন্ম দিয়েছে, এইটাই বাংলা থিয়েটারের ভিত্তিস্থাপনের পক্ষে কলকাতার আত্মস্থ ভাবনার কথা।

২

কলকাতা একটা ভৌগোলিক অবস্থান শুধু নয়, কলকাতা একটা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চেতনার দ্বান্দ্বিক আবেগ। সেই আবেগ কলকাতার বুকে স্থাপিত নাট্যমঞ্চে এরপর শিরোনামরূপে আর বেশি ব্যবহৃত হয়নি, দুটি মাত্র উল্লেখ মিলছে। তার মধ্যে একটি উনিশ শতকের, দ্বিতীয়টি বিশ শতকের। উনিশ শতকের যেটি, তার উল্লেখ মিলছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত অভিনয়ের তালিকায়[৪], এবং সেটি ভুল। তা হল 'কলিকাতা অপেরা হাউস', *'হিন্দু পেট্রিয়ট'*-এর ১৪ জুলাই ১৮৭৩ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা যাচ্ছে মধুসূদনের *'কৃষ্ণকুমারী'* নাটক ঐ মঞ্চে ১৬ জুলাই ১৮৭৩-তে অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয় ছিল ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্মিলিত অভিনয়। এবং এই অভিনয় হয়েছিল লিণ্ডসে স্ট্রিটস্থ অপেরা হাউস ভাড়া করে।[৫] কলিকাতা অপেরা হাউস ওর নাম নয়। এই অপেরা হাউস বর্তমানে গ্লোব সিনেমায় রূপান্তরিত। দ্বিতীয় যে

শিরোনাম মিলছে রঙ্গালয়ের, সেটি বিশ শতকের এবং সেটিও একটি পুরানো রঙ্গালয়েরই মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে চালু করা হয়েছিল এক বছরের জন্য।

এই রঙ্গালয়টি হল ক্যালকাটা থিয়েটারস্ (১৯৩৬-৩৮), ২/এ রাজা রাজকিষেণ স্ট্রিটে অবস্থিত নাট্যনিকেতন (১৯৩১) মঞ্চেরই নতুন নামাঙ্কন। নাট্যনিকেতনের প্রবোধচন্দ্র গুহের পরিবর্তে যশোদানন্দন ঘোষ হয়েছিলেন নতুন মালিক। এঁদের প্রথম নাটক *'কেদার রায়'* এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথের *'গোরা'* প্রযোজনা সেকালে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। ১৯৩৮-এর গোড়ার দিকেই ক্যালকাটা থিয়েটারস্ উঠে যায়।[৬] বর্তমানে নানান হাতবদল হয়ে এই মঞ্চটিই বিশ্বরূপা।

নাট্যশালা স্থাপন এবং তার নামকরণের মধ্যে সেকালে কলকাতার সাংস্কৃতিক রুচি ও প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২)-এর আগে কলকাতায় যেসব শৌখিন উদ্যোগে নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল তাদের যেসব নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল সে নামগুলি অধিকাংশই এলাকার নামে অভিহিত হত। যেমন ইংরেজি নাট্যশালাগুলির মধ্যে হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (১৭৯৭-৯৮) ঐ নামের অধুনালুপ্ত এক রাস্তার উপর ছিল, যে রাস্তাটি বর্তমানের রাজভবনের নীচে চাপা পড়েছে বলে অনুমান।[৭] চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-১৮৩৯) গড়ে উঠেছিল চৌরঙ্গি ও থিয়েটার রোডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। কলকাতার উত্তরে দমদম থিয়েটার (১৮১৬-১৮২৪) এবং মধ্য কলকাতার বৈঠকখানা এলাকায় বৈঠকখানা থিয়েটার (১৮২৪-১৮২৫) এই রকম স্থাননামে সেকালে পরিচিতি অর্জন করেছিল।

আবার বাঙালির থিয়েটারও স্থাননামে চিহ্নিত হত, ইংরেজি থিয়েটারের অনুসরণে সেইটাই তখন রেওয়াজ। নবীনবাবুর শ্যামবাজার থিয়েটার (১৮৩৫), প্যারীমোহনবাবুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৫৪), পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮-১৮৬১), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৫-১৮৭৩), শোভাবাজার রাজবাড়িতে স্থাপিত শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৪-১৮৬৭), ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৬৫-১৮৬৭), বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় (১৯৬৮-১৮৭৫) এই ধারার থিয়েটাররূপে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মকালের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

ন্যাশনাল থিয়েটার যখন গড়ে উঠল ১৮৭২-এ, তার আগে বাঙালিত্ব জ্ঞাপক থিয়েটার গড়া হয় বেঙ্গল থিয়েটার (১৭৯৫), আর হিন্দু জাতির সাম্প্রদায়িক আদর্শে গড়ে ওঠে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (১৮৩২) ; কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ার পরে আবার সেই জাতীয় ভাবধারারই অনুবর্তন চলল :

১। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩) (লিন্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউস)
২। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার (১৮৭৩) কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ি, ২২২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা
৩। বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩-১৮৯০), ৯ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

৪। দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার (১৮৭৫) প্রযত্নেঃ বেঙ্গল থিয়েটার, ৯ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা
৫। রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৯০-১৯০১), ৯ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা
৬। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩-১৮৭৭), ৬ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা
৭। ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৭-১৮৮৫), ৬ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা
৮। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৮৬), ৬ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

এই পর্যন্ত জাতীয় থিয়েটারের স্বপ্ন নিয়ে দল ভাঙাভাঙির খেলায় কলকাতা ছিল তর্কে-বিতর্কে উত্তাল। অর্থাৎ কলকাতা একটা সামান্য ভৌগোলিক অবস্থান নয়, সে একটা জাতীয় ভাবধারার ধারক-বাহক। কলকাতার এই বিশিষ্ট ভূমিকাটি বাংলার নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠার পূর্বেই স্পষ্টত চিহ্নিত হয়ে থাকল।

এরপর কলকাতার মধ্যে যেসব রঙ্গালয় স্থাপিত হল, তাদের নামকরণে সাধারণভাবে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। এক মালিকানাভিত্তিক অর্থ-বিনিয়োগের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি— এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজি ও বাংলা উভয় থিয়েটারেই রঙ্গমঞ্চের নামকরণ হয়েছে রাজানুগত্য বা পারিবারিক স্মারক হিসেবে। আর এর বিপরীতে, থিয়েটারে নেতৃত্বের শিল্পরুচির দৃষ্টিকোণ থেকে। এর মূলে রয়েছে নাট্যশিল্পের সামাজিক ও শৈল্পিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বাস।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেকালের কলকাতার ইংরেজি থিয়েটারের উদ্যোক্তার ব্যক্তিনামে যে থিয়েটার আখ্যায়িত হল, তার নাম হল মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (১৭৮৯-১৭৯০)। মিসেস ব্রিস্টো ছিলেন হেস্টিংসের আমলের কলকাতার অভিজাত ইংরেজ ব্যবসায়ী মিস্টার ব্রিস্টোর স্ত্রী, এমা র‍্যাংগহাম। অসামান্য সুন্দীর নৃত্যপটিয়সী এই মহিলার প্রতিভা নিয়ে হিকির গেজেট, ক্যালকাটা গেজেটে নিয়মিত গালগল্প ছাপা হত। এমার অভিনয় ক্ষমতার জন্যই ব্রিস্টোর উৎসাহে চৌরঙ্গির এক ভবনে খোলা হয়েছিল এই থিয়েটার। ১৭৯০-এর গোড়াতেই মিসেস ব্রিস্টো কলকাতা ছেড়ে বিলেতে ফিরে গেলে এই নাট্যমঞ্চ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার অভাবে কলকাতার ইংরেজ নাট্যামোদী এইচ ই বাস্টিড লেখেন : For long Calcutta refused to be comforted.[১]

কলকাতা অবশ্য প্রমোদের এ অভাব বেশিদিন ফেলে রাখেনি। যাইহোক ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হাতে এরপর কলকাতার যেসব থিয়েটার হল তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে রাজানুগত্য প্রকাশের বাসনা ব্যক্ত হয় এম্পায়ার/ওল্ড এম্পায়ার/ফার্স্ট এম্পায়ার (বর্তমানে এটি রক্সি সিনেমা), নিউ এম্পায়ার স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বাংলা থিয়েটারে এই ধারার চলন হয় ১৮৯০-এ যুবরাজ অ্যালবার্ট ভিক্টরের ভারত আগমনে বেঙ্গল থিয়েটার তাঁর সম্মানার্থে মঞ্চের নাম বদলিয়ে রাখে রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৯০)।

কর্নওয়ালিশ, লর্ড কার্জন ভারত ইতিহাসে যতই নিন্দিত হোক, দেখা যাচ্ছে এ দেশীয় একাংশের আনুগত্যে স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের নামে নাম দিয়ে কর্নওয়ালিশ থিয়েটার

(বর্তমানে এটি শ্রী সিনেমা) এবং কার্জন থিয়েটার (১৯০৪) (বর্তমানে নাম গ্রেস সিনেমা)। ঐ কালেই স্থাপিত হয়েছিল আজকের মুনলাইট সিনেমা, তখন তার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল থিয়েটার। এ সব ঘটনা ঘটেছে ১৮৭৬-এর নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পর। অর্থাৎ বাবুদের রাজন্যতোষণ নীতি। সংস্কৃতির জগতে কলকাতার এই রাজভক্তির চেহারাটাই অবশ্য সব নয়। এর বিপরীতে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিবাদী ও বিক্ষুব্ধ মনন থেকে জাত নাট্যশিল্প কলাদ্যোতক রঙ্গমঞ্চের নামকরণও হয়েছে যথেষ্ট। এই জাতীয় নামকরণের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৭৭-এ রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা' থিয়েটার স্থাপনার মধ্য দিয়ে। বীণা হল সারস্বত সাধনার প্রতীক। এই নান্দনিক রীতির নামকরণে এরপরে মেলে সেই বিখ্যাত স্টার থিয়েটারের আবির্ভাব (১৮৮৩), যে নামের আড়ালে অভিনেত্রী বিনোদিনীর বি-থিয়েটারের নাম অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে। স্টারের পরে স্থাপিত হয় মিনার্ভা (১৮৯৩), ক্লাসিক (১৮৯৭), নাট্যমন্দির (১৯২৪), নাট্যনিকেতন (১৯৩১), রংমহল (১৯৩১), নব নাট্যমন্দির (১৯৩৪), নাট্যভারতী (১৯৩৯); শ্রীরঙ্গম (১৯৪১), থিয়েটার সেন্টার (১৯৫৪), অবন মহল (১৯৭৪), বিশ্বরূপা (১৯৫৬), মহাজাতি সদন (১৯৫৮), শ্রীশিক্ষায়তন (১৯৫৮), মুক্তাঙ্গন (১৯৬২), রবীন্দ্রসদন (১৯৬৬), কলামন্দির (১৯৬৮), আকাদেমি অব ফাইন আর্টস (১৯৭০), রঙ্গনা (১৯৭৪) ইত্যাদি এবং এই ধারাই বর্তমান পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে চলেছে। তবে এই ধারায় সে যুগের এবং এ যুগের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বদের অবদানের স্মারক হিসেবে কয়েকটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ হয়েছে যেগুলি বর্তমানের প্রগতিশীল নাট্যচর্চার কেন্দ্র। এ সবের উদ্যোক্তা কোনো ব্যক্তি-মালিকানা নয়, কোনো ট্রাস্ট কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই মঞ্চগুলি হল যোগেশ মাইম (১৯৭৭), শিশির মঞ্চ (১৯৭৮), অহীন্দ্র মঞ্চ (১৯৭৮), রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ, বিজন থিয়েটার (১৯৭৯), গিরিশ মঞ্চ (১৯৮৬), দীনবন্ধু মঞ্চ (১৯৮৭) এবং প্রস্তূয়মান মধুসূদন মঞ্চ (১৮৮৯-৯০-এর মধ্যে সম্ভবত চালু হবে)।

কলকাতার এই নাট্যমনস্কতার পরিচায়ক এই রঙ্গমঞ্চগুলির অস্তিত্ব কিন্তু নির্ভর করেছে এই নগরীর জনজীবনের ওপর, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বের সমান্তরালভাবে।

একই মঞ্চ বা থিয়েটার মন্দায় এবং নিজস্ব দলাদলিতে কতবার হাতবদল হয়েছে, সঙ্গে নামবদলও হয়েছে। এই মঞ্চগুলির উত্থান-পতন মূলত নাট্য আন্দোলনের উত্থান-পতন। উনিশ শতকের অনেকগুলি মঞ্চই নামবদল ও স্থানবদল হয়ে বিশ শতকের মধ্য দশকে এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র পাঁচটিতে। স্টার, মিনার্ভা, রংমহল, বিশ্বরূপা, নিউ এম্পায়ার। তারপর স্বাধীন ভারতে কলকাতার নতুন ধারার গণমুখী নাট্য আন্দোলনের স্বার্থে ১৯৫৮ পরবর্তী নতুন রঙ্গমঞ্চগুলি গড়ে ওঠে।

এর মধ্যে সত্তর দশকের প্রগতিশীল থিয়েটার আন্দোলন ও বাংলার বামপন্থী রাজনৈতিক থিয়েটারের দর্শককে বিভ্রান্ত করার জন্য সাধারণ রঙ্গালয়গুলি ব্যবসায়িক

প্রতিযোগিতায় নেমে এমন কতকগুলি হলকে রঙ্গালয় বানায় বা নতুন নির্মাণ করে, যার অনেকগুলিই আজ দর্শকের ঘৃণায় ও উপেক্ষায় বন্ধ হয়ে গেছে। কলকাতা এবং বাংলার মানুষ এটাও সেই সময়ে লক্ষ করেছিলেন যে, এইসব রঙ্গমঞ্চের মালিক বা পৃষ্ঠপোষক হলেন উনিশ শতকের সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারক-বাহকদের নামাঙ্কিত ট্রাস্ট বা প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী রাজনৈতিক লাইনের প্রবক্তা কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থক ক্লাব। যে হলগুলি চালু হয়ে আটের দশকে উঠে গেছে বা ঝাঁপ বন্ধ করেছে সেগুলি হল রামমোহন মঞ্চ (১৯৭৪), শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ (১৯৭৬), বিধান মঞ্চ (১৯৭৭), বাসুদেব মঞ্চ (১৯৭৯), গালিব থিয়েটার (১৯৭৬)। টিকে আছে বা খুঁড়িয়ে চলছে এমন মঞ্চ হল প্রতাপ মঞ্চ, সুজাতা সদন, নেতাজী রেলওয়ে মঞ্চ ও ক্লেম ব্রাউন ইনস্টিটিউট মঞ্চ, বিধান মঞ্চ (১৯৭৭)। বয়েজ ওন মঞ্চ (১৯৭১), সারকারিনা (১৯৭৮), কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ (১৯৬৩), একদা অপনাটকের আখড়া হলেও এখন সুস্থ নাট্যচর্চায় নিবেদিত। ঐ সময়ের অপনাট্যচর্চায় যে তিনটি মঞ্চ কলকাতার কলঙ্ক বলে চিহ্নিত হয়েছিল সেগুলি হল প্রতাপ মঞ্চ, বিশ্বরূপা ও মিনার্ভা থিয়েটার।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সব থেকে বেদনাদায়ক অধ্যায়টি হল অভিনেত্রী বিনোদিনীর নামে বি-থিয়েটার না হয়ে স্টার থিয়েটার (১৮৩৩)-এর জন্মলাভের ঘটনা। বিনোদিনীর নামাঙ্কিত থিয়েটার আজও তাই কলকাতায় অপেক্ষিত থেকে গেছে।

৩

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল কলকাতা কেন্দ্রিক জনজীবনের জোয়ার-ভাটায় আন্দোলিত নাট্যশিল্পীদের কলকাতার নাম দিয়ে থিয়েটারের দল গঠন করা বা নাটক রচনার গর্ববোধ। কলকাতা তথা বাংলার থিয়েটার চর্চার মূলসূত্র তো ইংরেজি তথা ইউরোপীয় থিয়েটারের প্রতি স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি, তাই ১৮৭৩-এ ন্যাশনাল থিয়েটারের সাম্বৎসরিক উৎসবে *'মধ্যস্থ'*[১০] পত্রিকার সম্পাদক ও সমালোচক নাট্যকার মনোমোহন বসু যখন এক সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন চিৎপুর রোডের সেই মধুসূদন সান্যালের বাড়ির সভায়, তখন বাংলার নিজস্ব থিয়েটার গড়ার সেই স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞার এক স্পষ্ট উচ্চারণ এখানে আমাদের করতেই হয় :

'আজ কি আহ্লাদ! আজ আমাদের স্বজাতীয় নাট্যসমাজের বর্ষোৎসব! জাতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্মদিন! গত বৎসর এই দিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়। ... কিন্তু এই যত নাম ব্যক্ত করা গেল, অস্ভাবতই অবৈতনিক রঙ্গভূমি হইয়াছিল। তাহাতে সমাজের দর্শনেচ্ছা সম্যগ্‌রূপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। ... যে বিষয় সভ্য সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত, সে বিষয় সেরূপ না হইয়া যেন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত; সুতরাং সর্বসাধারণের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে বিপুল বাধা ছিল। যে কয়েক বৎসর সেই সমস্ত অবৈতনিক রঙ্গভূমি প্রতি বৎসর নূতন

নূতন রঙ্গ প্রদর্শনে তৎপর ছিল, সেই কয় বৎসর সর্বদা সকলের মুখে শুনা যাইত, যে, যদিও ইহা মন্দের ভাল হইল বটে, কিন্তু যতদিন কোনো বৈতনিক সম্প্রদায় কর্তৃক রঙ্গভূমি নির্মিত না হইতেছে, ততদিন অভাব নিবারণ ও আশা পূরণ হইল বলিয়া কোনোমতেই স্পর্ধা করা যাইতে পারে না।'

এই স্পর্ধার কথা সে যুগের নাট্যকার শিল্পীরা কলকাতার বুকে বসে কী রকম ভাবতেন তার আরও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন নাট্যকার :

'এই জল্পনা চলিতেই ছিল, কোনো দিগে প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল না। বান্ধবমণ্ডলী যখনই একত্র মিলিতাম, এই কথা উঠিবামাত্র সকলেই এই বলিয়া নিরাশ্বাস হইতাম, 'আমাদের সমাজ ততদূর উন্নত হয় নাই, যে, বৈতনিক রঙ্গভূমিকে প্রতিপোষণ করিতে পারে। আমরা আরো ভাবিতাম, যে, যদিও তাহার দর্শক শ্রেণীতে সাধারণে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু এমন বুকওয়ালা সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মধ্যে কে আছে, যাহারা সাহস করিয়া অগ্রে অগ্রসর হয় ?'

এই বুকওয়ালা বাগবাজারের সম্প্রদায় যখন সত্যই এগিয়ে এলো তখন *'মধ্যস্থ'* সম্পাদকের মতো অনেকেই বলেছিলেন :

'বাঙ্গালীর অসাধ্য কোনো কার্যই নাই। বাঙ্গালীর সম্মুখে যদ্যপি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না পড়ে (বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ যে প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় পরাধীনতা পরাজয়করণে অক্ষম) তবে বাঙ্গালী সকল কর্মেরই যোগ্য।'

এই যোগ্যতা প্রমাণ করেছিল বাংলার মানুষ, ইউরোপীয় থিয়েটারের প্যারালাল থিয়েটার করে এবং যে 'রাজকীয় পরাধীনতা পরাজয়করণে অক্ষম' বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা মনে করেছিল কলকাতাবাসী বাংলার মানুষ, তারাই কিন্তু উত্তরকালে রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর করা কিংবা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরণের জন্য সংগ্রামের সূচনা করেছিল এই কলকাতার বুকে।

কলকাতার বুকে এরপর প্রতিবাদের আবেগে উদ্বেল হয়ে যেসব নাট্যগোষ্ঠী সংগঠিত হয়ে নাট্য আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিল, তাদের মধ্যে ঐ ১৮৭২-র কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির সময় থেকে এই তিন শত বছরের কলকাতায় জীবিত থাকা অনেক নাট্য প্রতিষ্ঠান কলিকাতা নামটির ব্যঞ্জনা শীর্ষনাম হিসেবে ধারণ করেছে। এর মধ্যে সে যুগের পেশাদারি কিছু নাট্যদলের নাম যেমন রয়েছে, তেমনই একালে অপেশাদারি বেশ কিছু গ্রুপ থিয়েটারের নামও আছে। পুরানো আমলের সব দলই আজ উঠে গেছে, যেগুলি বেঁচে আছে সেগুলিকেও অনেক ভাঙাচোরা আঁকাবাঁকা পথে এগোতে হচ্ছে। এই যে উঠে যাওয়া বা নানান ভাঙচুরের কারণ, বাংলার নাট্য আন্দোলনের সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেই তা নিহিত আছে।

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ারস এইরকম নাট্যগোষ্ঠী, যাঁরা পেশাদারি মনোভাব ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়েই ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বর্তমানের গ্রুপ থিয়েটারের অনুরূপ বিভিন্ন মঞ্চে উন্নত ও শিল্পসুন্দর প্রযোজনা উপহার দিয়ে তিরিশের দশকের কলকাতাকে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজকে যাদের আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে অন্য থিয়েটার বলে চিহ্নিত করি, সি এ পি বস্তুত তাই। সি এ পি-র নামকরণে কলকাতা নামটি স্থান পেয়ে যাওয়ায় ভাবতে স্বভাবতই আমাদের ভালো লাগে যে কলকাতা সেই কেন্দ্রবিন্দু, যে কেন্দ্রবিন্দু বাংলার যা-কিছু নতুন, তার সব কিছুরই সূচনা করে, তাকে লালন করে, পালন করে। সি এ পি-র মূল সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত জিওলজিস্ট পি এন বসুর পুত্র মধু বসু এবং তাঁর পত্নী সাধনা বসু। সাধনা বসু ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের নাতনি। মধু বসুর সৃজনশীল কল্পনা আর সাধনা বসুর নৃত্য ও অভিনয়ে সি এ পি-র প্রযোজনা বাংলার পেশাদার থিয়েটারের ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করল, যে মাত্রার স্বাদ ইতিপূর্বে ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্র ঘরানায় মিলেছিল।

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ারস আর একটি বড় কাজ করেছিলেন সে যুগে তা হল বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রী সমাজে উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা শিল্পীদের আবির্ভাবকে বাস্তবায়িত করা। ইতিপূর্বে অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা, যাঁরা মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া থিয়েটারে নেমেছিলেন। পেশাদারি মঞ্চের প্রযোজনা জগতে সি এ পি-র এই আয়োজন তাই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সাধনা বসুর সঙ্গে আই সি এস জ্ঞানাঙ্কুর দে-র কন্যা মঞ্জু দে, সুপ্রভা মুখার্জি প্রমুখ অভিনেত্রীর মঞ্চাবতরণ কলকাতার থিয়েটার জগতে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল।

চল্লিশ-এর দশকের শেষে বহুরূপী যেমন তাঁর প্রযোজনার জন্য চৌরঙ্গিপাড়ার নিউ এম্পায়ারকে বেছে নিয়েছিলেন, সি এ পি-ও সেইরকম সাহেবপাড়ার ফার্স্ট এম্পায়ারকে পছন্দ করতেন বেশি।

সি এ পি-র প্রথম প্রযোজনা ক্ষীরোদপ্রসাদের *'আলিবাবা'*, যা একসময়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিকের প্রযোজনায় নৃপেন বসুর আবদাল্লা আর কুসুমকুমারীর মর্জিনা দিয়ে কলকাতাকে ঐতিহাসিকভাবে মাতিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইরকমই মধু বসু ও সাধনা বসুর আবদাল্লা-মর্জিনা কলকাতাকে নতুন করে মাতিয়ে দিল। কলকাতা শুধু অনুকরণ বা পুরাতনের আবর্তন করে না, নতুন করে সৃষ্টি করে। *'আলিবাবা'*র পরে সি এ পি-র প্রযোজনা তালিকায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের *'মন্দির'*-এর পরে মন্মথ রায়ের একাধিক নাটক ও রবীন্দ্রনাথের *'দালিয়া'* উল্লেখ্য প্রযোজনা ছিল। বস্তুতপক্ষে নাট্যকাররূপে মন্মথ রায়ের জনপ্রিয়তার মূলে সি এ পি-র প্রযোজনামূল্য ছিল অনেকখানি। সে যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রযোজনার পাশে সি এ পি-র প্রতিটি প্রযোজনা ঝকঝকে মুক্তোর মতো নিটোল ও দ্যুতিময়। অবশ্য দু-বছর পরেই সি এ পি-র কাজ থেমে গেল চলচ্চিত্রের রুপোলি আকর্ষণে।[১১]

৪

এরপরে কলকাতার থিয়েটারে নতুন তরঙ্গ উঠল বাংলার তৃণমূল থেকে সঞ্চিত শোণিত-রসে সব চেয়ে আশ্চর্য কলকাতার তখন নিতান্ত দুঃসময়।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষ তথা বাংলা তথা কলকাতা তখন লড়াই সংগঠিত করছে নানান ফ্রন্টে। একদিকে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের অহিংস পন্থার আপসকামিতার স্বাধীনতার সংগ্রাম, অন্যদিকে কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে থেকে কমিউনিস্টদের আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সেই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনে দেশ তখন উত্তাল। ইতিমধ্যে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ত শক্তির উত্থান ও তার প্রতিরোধে সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের যোগদানের পর ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো সেই যুদ্ধে ভারতের পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করায় ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা ছাড়াই ঔপনিবেশিক সরকারের এই কর্মকাণ্ডের ফলে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করে। এই বছরের শেষে শ্রমিক-কৃষক সহ মধ্যবর্গীয় স্তরের মানুষ যুদ্ধের ধাক্কায়, অর্থনৈতিক মন্দায় নিত্যব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য ও ফাটকাবাজির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে শামিল হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের-বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে বামপন্থীরা সচেষ্ট ছিল ন্যাশনাল ফ্রন্ট গঠনের, কিন্তু দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলবাদের স্বার্থে এই ফ্রন্ট গঠনে বাধা সৃষ্টি করে। ইংরেজও আতঙ্কিত ছিল বামপন্থী শক্তির সমাবেশে। ইতিমধ্যে ১৯৪১-এ হিটলার কর্তৃক বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধের চরিত্র যায় বদলে। স্বাধীনতার জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি তখন ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধের স্তরে বিবেচনা করে। সাম্রাজ্যবাদের শত্রু বিবেচনায় যে কমিউনিস্টদের ইংরেজ এতদিন কারাগারে ভরে রেখেছিল, তাদের মুক্তি দিতে তারা বাধ্য হয়। বামপন্থীরা রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির আন্দোলনের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিপদ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এক সর্বাত্মক জনযুদ্ধের লড়াই চালায়। কলকাতা তখন নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাংলার মানুষজনের সমাধিস্থল। জাপানি বোমার আক্রমণে পূর্ববাংলা তখন জ্বলছে, কলকাতাও আতঙ্কিত কখন সে বোমা পড়ে। পথেঘাটে ট্রেঞ্চ আর বাফ্‌ল ওয়ালে কলকাতা এক রণক্ষেত্র। পথে পথে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিয়েছেন। কে তখন সিনেমা-থিয়েটার দেখে। সাধারণ রঙ্গালয়ের তখন চরমতম দুর্দিন। কোনোরকম টিকে আছেন শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্র গুপ্তরা। কলকাতার সে গভীরতম দুঃসময়।

কিন্তু না, সেই দুঃসময়েই জন্ম নিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গণসংস্কৃতির এক সর্বাত্মক আন্দোলন। বিশ্ব ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণনাট্য আন্দোলনে সেকালের দ্যুতিময় প্রতিভার কে না এসেছেন— পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, মুলকরাজ আনন্দ থেকে শুরু করে বাংলার বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুধী প্রধান সবাই।

১৯৪০-এ গঠিত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্পাদক সাহিত্যিক সোমেন চন্দ ঢাকায় খুন হলেন ফ্যাসিবাদের সমর্থকের হাতে ১৯৪২-এ। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র হল ১৯৪২-এর শেষাশেষি। নতুন সংগঠন গড়ে উঠল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।[১৩] এই সংঘের প্রথম সম্মেলন হল ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। ওদিকে ১৯৪০-এর মাঝামাঝি YCI সংগঠনের উদ্যোগে ইংরেজি ও বাংলায় কয়েকটি ছোটনাটক রচনা করে অভিনয় করা হয়েছিল। তার মধ্যে জলি কাউলের লেখা '*Politicians take to rowing*'-এর কয়েকটি চরিত্র ছিল চার্চিল (দিলীপ বসু), চেম্বারলেন (সুব্রত ব্যানার্জি), হিটলার, গোয়েবলস (জলি কাউল), লিন্‌লিথ্‌গো (কমল বসু), গান্ধিজী (সুনীল সেনগুপ্ত) প্রমুখ।[১৪] এই সংগঠনের বাংলা নাটক লেখা হল '*অঞ্জনগড়*' ও '*কেরানী*'। ১৯৪০-৪১-এর মধ্যে '*অঞ্জনগড়*' ও '*কেরানী*' অভিনয়ের পরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাট্য বিভাগ হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ১৯৪৩-এর মে মাসে বিজন ভট্টাচার্যের '*আগুন*' ও বিনয় ঘোষের '*ল্যাবরেটরি*' সর্বপ্রথম অভিনয় করে। তার কয়েক মাস পরে বিজন ভট্টাচার্যের '*জবানবন্দী*' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের '*হোমিওপ্যাথি*' নাটিকা দুটি অভিনীত হল।[১৫] '*নবান্ন*' লেখা হয়েছিল ১৯৪৩-এ। অভিনীত হল ১৯৪৪-এর ২৪শে অক্টোবর কলকাতার খোদ থিয়েটার পাড়ার শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের প্রচ্ছদের পরে প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা নিবন্ধে '*বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের আবির্ভাব*'-এ লেখা হল :

'বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিরাট সংকট, রাজনীতির ক্ষেত্র জুড়ে প্রকাণ্ড হতাশা, সামাজিক জীবনে ভাঙনের অতিকায় প্রেতচ্ছায়া— এমনি সময়ে আত্মপ্রকাশ করলো গণনাট্য সঙ্ঘ একদল আশাবাদী তরুণ-তরুণীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। বাংলার নাট্যশালাগুলো দর্শকদের সত্যিকার চাহিদা মেটাতে পারছে না, বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তায় সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াস পেলো। সে দিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক।

'এই সঙ্ঘের কাজ হল যেমনি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে

উঠবে। মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।'

এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাগিদের পেছনে ছিল জাগ্রত জনচেতনার বলিষ্ঠ বিশ্বাস ও সৃজনশীল উদ্যম, ফলে এর প্রতিটি বাক্যই আজ ধ্রুব সত্য হয়ে উঠেছে। সেদিনের কলকাতা যা জন্ম দিয়েছিল আজ ৪৫ বছর পরে তারই ভাবাদর্শ কলকাতা ছাড়িয়ে গোটা দেশের নাট্য-আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়েছে। '৪৮ সালে গণনাট্য সংঘের মূল নিউক্লিয়াসে ভাঙন এলেও তার থেকে যেসব নতুন নিউক্লিয়াস জন্ম নিয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই সৃজনশীলতায় যে গণতান্ত্রিক শিল্পসৃষ্টির বাতাবরণ তৈরি করেছে, তার মূল্য আজ অপরিসীম। আজ সেইসব গণতান্ত্রিক নাট্যসংস্থা বা নাট্যদলগুলির সৃষ্টিকর্মই বাংলার নাট্যজগতের মূল স্রোতোধারা। এর জন্ম এই কলকাতায়, কিন্তু কলকাতা সেদিন এইসব সৃজনশীলতার জঠর হয়ে উঠেছে বলে নিজে কোনোদিন গর্ব করেনি, কলকাতা যা কিছু করেছে সবই গোটা দেশের কথা ভেবে এবং গোটা দেশও তাই রাজধানীর সৃষ্টিকর্মকে রাজ্যের সকল মানুষের সৃষ্টিকর্মের মর্যাদায় বিবেচনা করেছে।

কলকাতা এই নতুন ধারার গণনাট্যমুখী নাট্য আন্দোলনের এক শরিক বিজন ভট্টাচার্যের লালিত আবেগে তাঁর নাট্যদলের শিরোনাম রূপে আবার দেখা দিল ১৯৫১-য়। ক্যালকাটা থিয়েটারের জন্ম হল বিজন ভট্টাচার্যের রচনা ও নির্দেশনায় *'মরাচাঁদ'* ও *'কলঙ্ক'* প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। মাঝখানে আট বছর বাদ দিয়ে ১৯৫৯-এ ক্যালকাটা থিয়েটার আবার জেগে উঠল ১৫ই অগাস্টে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে *'গোত্রান্তর'* প্রযোজনায়। কলকাতার এক নতুন সমস্যা পূর্ববঙ্গের বাস্তুচ্যুত মানুষদের জীবনধারা ও গোত্রান্তর নিয়ে এই নাটক। আলোকশিল্পী তাপস সেন ও মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরীর সহযোগিতায় প্রয়োগশিল্পী এবং মুখ্য চরিত্রাভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের এক মর্মন্তুদ শিল্পসৃষ্টির স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে এই *'গোত্রান্তর'*। বাস্তবতায় গাঁথা যাদবপুর-গড়িয়ার কলোনি যেন উঠে এসেছিল মঞ্চে। এঁদের *'জীয়নকন্যা'* পালার এক মূল্যবান অভিনয় হয়েছিল রঙমহলে। বিজন ভট্টাচার্যের নিরন্তর সৃজনশীলতায় আবেগের প্রাধান্য যত ছিল, সাংগঠনিক গৃহস্থালীর অভাবও ছিল তত। তারপর ক্যালকাটা থিয়েটার বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী অনেকগুলি নাটক *'ছায়াপথ'*, *'গর্ভবতী জননী'* এবং পূর্বের প্রযোজনা *'মরাচাঁদ'*, *'কলঙ্ক'* তারপর *'দেবীগর্জন'*, *'চলো সাগরে'*, *'লাস ঘুইর‍্যা যাউক'* প্রভৃতি মঞ্চস্থ করেও তার সমকালীন অন্যান্য কয়েকটি নাট্যসংস্থার সমান প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেনি। তবে ১৯৬৬-তে বাংলার কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় রচিত 'দেবীগর্জন' এক মহৎ প্রযোজনার খ্যাতি অর্জন করেছিল।

গণনাট্য আন্দোলনকে ইতিমধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করতে হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবনাট্য আন্দোলনের এক সর্বব্যাপক ভাসমান

শ্লোগানের বিরোধিতায়। রাজনৈতিক থিয়েটারের সংজ্ঞাকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করতে চাওয়া হয় সামাজিক ও শৈল্পিক অন্যান্য প্রশ্নের অবতারণা করে। আসলে কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ লাইনের দ্বন্দ্বেও বুর্জোয়া শিল্পের ভাবাদর্শে অনেক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা (তৎকালীন বহুল-উক্ত) সংশোধনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। গণনাট্য আন্দোলনে বিশ্বাস রেখেও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য নয় এমন সব সংস্থার প্রযোজনার সমালোচনা কালেও কোনো কোনো দৈনিকপত্রের সাংবাদিকরা এক 'নতুন ধারার নাটক' বা 'নবনাট্য আন্দোলন' বলে বিশেষণে চিহ্নিত করায় ও পরে কোনো কোনো বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীর বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে এই 'নবনাট্য আন্দোলন' কথাটির চল হয়। ছয়ের দশকে অবশ্য কমিউনিজম বিরোধিতার লাইন থেকেও (ম্যাকার্থি থিয়োরি অনুযায়ী) অ্যাবসার্ড থিয়েটারের তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে যায় অনেক তরুণ অপরিণত ভাবনার শিল্পীগোষ্ঠীর কাজকর্মের মধ্যে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এ তত্ত্বের চেয়েও নাটক কেবল রাজনৈতিক ভারি কথায় ভর্তি থাকবে কেন, এই ভেবেও সমাজের উপরিতলের সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে নিছক আনন্দের সামগ্রীরূপে পরিবেশনের ঝোঁকও এই সময় দেখা দেয়। তারই ফলশ্রুতিতে ক্যালকাটা মেরি মেকার্স ক্লাব নামক এক শৌখিন নাট্যদলের জন্ম হয় ১৯৫৬-য়।

ক্যালকাটা মেরি মেকার্স ক্লাব (১৯৫৬) হাল্কা হাসির নাটক নিয়ে আসর জমাতে আসে। নাট্যকার শৈলেশ গুহনিয়োগী এর মূল সংগঠক, নাট্যকার ও পরিচালক। এদের প্রযোজনাগুলির নাম ও বিষয় সবই প্রায় লঘুস্তরের। *'কলেজ হোস্টেল'*, *'গোলপার্ক'*, *'ক্যাম্প থ্রি'*, *'ফ্লু'*, *'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ'*, *'পাহাড়ী ফুল'*, *'বৌদির বিয়ে'*, *'ক্লান্ত রূপকার'* প্রভৃতি। কলকাতার অফিস ক্লাব, যাদের ওপর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রভাব খুব সবল ছিল না. যারা একদা *'কেদার রায়'*, *'প্রতাপাদিত্য'*, *'সিরাজদ্দৌলা'*, *'তাইতো'* ইত্যাদি নাটক করত বিনোদনের জন্য, তারাই শৈলেশ গুহনিয়োগীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

কলকাতার বৃহত্তর ও জটিল জীবনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই রকমই আর একটি নাট্যদল জন্মেছিল ১৯৬৩-তে, যারা *'আলমগীর'* প্রযোজনা করেছিল কলিকাতা নাট্য সম্প্রদায় নাম দিয়ে। নিতান্তই শৌখিন উদ্যোগ। এতে লাভ না হলেও মূল নাট্যপ্রবাহের কোনো ক্ষতি হয়নি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এইরকমই আর একটি সংস্থার নাম মেলে, যারা নর্থ ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাব নাম দিয়ে ১৯৬৫-তে নাটক করেছিল *'জীবন যেথায় স্থির'*। নাট্যকার বা প্রযোজনার বিস্তারিত তথ্য না মিললেও নাটকের নাম দেখে অনুমান হয়, কলিকাতা নাট্য সম্প্রদায়ের মতো এরা খুব শৌখিন দৃষ্টিভঙ্গির নয়, এদের একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা সম্ভবত নেতিবাদী জীবনদর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে।

১৯৬৫ সাল কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে ঝড় ওঠার আগের মুহূর্ত।

৬৬-র বিখ্যাত খাদ্য-আন্দোলনে পশ্চিমবাংলা আলোড়িত। ৪৩-৪৪-এর দুর্ভিক্ষের কালেও এত বড় খাদ্য আন্দোলন সংঘটিত হয়নি, যত বড় খাদ্য আন্দোলন সারা রাজ্যজুড়ে এবার সংঘটিত হল। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতায় চাল-ডাল-তেল সবেরই সংকট। গ্রাম-শহর জুড়ে বামপন্থী শক্তি তখন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণাকে সংগঠিত করল। ইতিপূর্বেই ৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র কাছে তখন জনসাধারণের প্রত্যাশা বেড়েছে এবং কংগ্রেস পার্টিতেও ভাঙন লেগেছে— সরকার নির্মমভাবে পুলিশি সন্ত্রাস চালিয়ে বামপন্থী নেতাদের বন্দী করে। বন্দী হয় বেশ কিছু সাহিত্যিক ও নাট্যকর্মীও।

গণনাট্য সংঘ তখন নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে সংশোধনবাদ ও শাসকশ্রেণীর নীতিহীন রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রচারে নেমে পড়েছে।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এ রাজ্য কংগ্রেসের ভাঙন ও পরাজয় ঘটিয়ে বামপন্থী শক্তি শিবিরে শক্তি সমাবেশ এবং পরপর দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ তখন উত্তাল। ১৯৬৭ থেকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও উগ্রপন্থা একই সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে শ্রমিক-কৃষকের সম্মিলিত শক্তি সমাবেশ, সংগঠনগুলির উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে। এবং তারই জেরে ৭১-র নির্বাচনে সি পি আই (এম) ও সহযোগী দলগুলি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল ও কেন্দ্রের পক্ষপাতিত্বে স্বল্পদিনের পি ডি এফ সরকার গঠন করে। এর পরে কলকাতাসহ রাজ্যব্যাপী নেমে আসে কংগ্রেসি সন্ত্রাস। ৭২-এর সাজানো নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে এসে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস। একদিকে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, অন্যদিকে যুগ যুগ জিও-র শ্লোগানে কলকাতায় কান পাতা দায়; বাতাসে তখন যত্রতত্র বারুদের গন্ধ। কলকাতায় জীবনের এই রাজনৈতিক টালমাটালে সাধারণ মানুষ তখন বোবা। প্রতিদিন কলকাতা ও তদ্‌সন্নিহিত শ্রমক-কৃষক মধ্যবিত্তের জনপদে রক্ত ঝরছে—ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কৃষক, শিক্ষক-সংস্কৃতিকর্মী প্রভৃতি সংগঠকদের বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে। ১৯৭৬-এ কেন্দ্রের সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করল। ফলে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে দেশের শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অকংগ্রেসি রাজনৈতিক দল ও বামপন্থীরা জনগণের সঞ্চিত বিক্ষোভকে সংগঠিত করার সুযোগ পায়। এবং এর প্রত্যুত্তরে ৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে স্বৈরতান্ত্রিক কংগ্রেসের পতন ও কেন্দ্রে সম্মিলিত বিরোধীদের সরকার গঠন। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে।

এই ৬৭ থেকে ৭৭ প্রায় এক দশক জুড়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে স্বৈরতন্ত্র ও

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চলল গেরিলা কায়দায় সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

এই সময়ে শুধু কলকাতার থিয়েটার নয়, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গড়ে উঠল অসংখ্য ছোট ছোট নাট্যদল বা গ্রুপ থিয়েটার এবং তারা সম্মিলিতভাবে গণনাট্য আন্দোলনের ভাবধারায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সপক্ষে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গড়ে তুলল সাংস্কৃতিক ব্যারিকেড। কংগ্রেসের পেছনে বাজারি সংস্কৃতি সংগঠন ছাড়া অন্য কোনো সমর্থন ছিল না। তবে অ্যাবসার্ড থিয়েটার নামে বামপন্থী মতাদর্শের বিরোধিতায় এক নতুন রীতির থিয়েটার আবির্ভূত হয়েছিল অল্পদিনের জন্য আঙ্গিক সর্বস্বতা নিয়ে। তাকে কলকাতার রাজনৈতিক থিয়েটার মোকাবিলা করেছিল মার্কসবাদী নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেশটের এপিক থিয়েটার দিয়ে।

এই দশকের বামপন্থী থিয়েটারে অবশ্য মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ছিল প্রবল— একদিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিতে সংশোধনবাদ ও অতিবামপন্থার বিরোধিতা করে গণনাট্য আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি লাইনে বিপ্লবী পরিস্থিতি সমর্থনের দৃষ্টিভঙ্গি। আটের দশক পর্যন্ত এ দৃষ্টিভঙ্গির লড়াই এখনও রয়েছে, তবে মূল রাজনৈতিক লাইনের ব্যর্থতায় উগ্রপন্থার সমর্থক শিবির এখন হতাশায় নিমজ্জিত।

৬৭-৭৭-র সময়সীমায় উত্তাল কলকাতা রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। এই রক্তাক্ত কলকাতা তখন এক আবেগের জন্ম দেয়—যে আবেগে কলকাতা আবার নাট্যদলের শিরোনামে, কিংবা নাটকের বিষয়ে প্রাধান্য পেয়ে যায়।

১৯৬৯-এ ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার *'সূর্যচেতনা'* (১৯৬৯), *'দর্পণে মিছিল'* (১৯৭০), *'এরিনা'* (১৯৭০) প্রভৃতি নাটক নিয়ে আবির্ভূত হয়। ১৯৭০-এ আবির্ভূত হয় সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা নাট্যশিক্ষণ কেন্দ্র ক্যালকাটা ল্যাব থিয়েটার। ১৯৭১-এ আবির্ভূত হয় ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার। অর্থাৎ ক্যালকাটা এবং আর্ট থিয়েটার কথায় মাঝখানে পিপলস্ কথাটি তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তা থেকেই জন্ম নেয়। এই সংস্থাটি ঐ সময়কালে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল অসিত বসুর *'কলকাতার হ্যামলেট'* (১৯৭৩) নিয়ে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ কলকাতার আর্তনাদ আর প্রতিবাদে হ্যামলেটের এই উপমান সম্ভবত প্রেরণা পায় শ্যামাকান্ত দাসের *'ম্যাকবেথ ৭২'* থেকে।

১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার প্রাক্কালে সন্ত্রাস-কবলিত কলকাতায় আরও তিনটি নাট্যদলের দেখা মিলেছিল। সেগুলি হল কলিকাতা নাট্যমঞ্চ (১৯৭৫), এদের নাটক ছিল কৌশিক সান্যালের লেখা *'গুরু ও গণিকা'*; ক্যালকাটা থিয়েট্রিক্যাল ফোরাম (১৯৭৫), এদের নাটক হল বিমল মিত্রের উপন্যাস অবলম্বনে *'চলো কলকাতা'* (১৯৭৮); আর ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অব কালচার (১৯৭৫), এদের নাটকের নাম *'সাইক্লোন'* (১৯৭৫)।

এরপর রাজ্যে যখন বামফ্রন্টের শাসন, নাট্যজগৎ যখন সন্ত্রাসমুক্ত, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ; তখন আর্ট থিয়েটার ক্যালকাটার (১৯৭৯) দেখা মেলে। তাঁরা সুস্থ নাট্যচর্চার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ প্রতিষ্ঠার বছরেই যে তিনটি নাটক প্রযোজনা করে সেগুলি হল *'যোগাযোগ'*, *'নববিধান'* ও *'রজনী'*।

১৯৮০-তে সুস্থ ও জীবনসুখী নাট্যচর্চার দৃষ্টিভঙ্গিতে কলকাতার বিখ্যাত ছয়টি গ্রুপ থিয়েটার—নান্দীকার, চেতনা, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, থিয়েটার কমিউন, শূদ্রক ও চার্বাক মিলে ব্রেশটের *'গালিলিওর জীবন'* প্রযোজনার লক্ষ্যে ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটার বা কলিকাতা নাট্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই একটি প্রযোজনা করেই সংস্থাটি উঠে যায়। কিন্তু এঁদের এই প্রযোজনা একটি ঐতিহাসিক স্পন্দন সৃষ্টি করে—ফ্রিৎস বেনেভিটস-এর নির্দেশনা, শম্ভু মিত্রের গালিলিও চরিত্রাভিনয় ও ছটি বিখ্যাত দলের সম্মিলিত শক্তিকে সংহত করে একটি মহৎ প্রযোজনার সৃষ্টি—কলকাতা সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কলকাতার, নানাবিধ অভিমান ও সমস্যার চাপে এই মহৎ উদ্যোগ ২০টি প্রদর্শনের পরেই থেমে যায়।

১৯৮৬-৮৭-তে কলকাতায় আর একটি নাট্যদলের শিরোনামরূপে কলকাতা শব্দ ব্যবহৃত হয়। সঞ্জয় গুহঠাকুরতার লেখা নাটক ও নির্দেশনায় এই দল ক্যালকাটা কোরাস থিয়েটার এখনও সক্রিয় রয়েছে।

৪০-এর দশকের আন্দোলনমুখী অপেশাদারি থিয়েটার পেশাদারি হয়ে উঠতে চাইলেও দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর জন্যই সম্ভব হচ্ছে না। ইতিপূর্বে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের দখল নিয়ে কোনো কোনো গ্রুপ থিয়েটারের পেশাদারি ভিত্তিতে চলার উল্লেখ্য নজিরই হয়ে আছে, যেমন মিনার্ভায় সামান্য কিছুদিনের জন্য বহুরূপী, পরে লিটল থিয়েটার গ্রুপ পুরো এক দশক ; তারপর রঙ্গনায় নান্দীকার ৫ বছরের জন্য, কিংবা মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক বা বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিট ; কিন্তু লিটল থিয়েটার গ্রুপ ও নান্দীকার ছাড়া অন্য অভিজ্ঞতাগুলি আশাব্যঞ্জক নয়।

সাধারণ রঙ্গালয়ের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভালো থিয়েটার বানানোর অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে খুব স্বাস্থ্যকর নয় বলেই বাংলা থিয়েটার আগে কলকাতা ও কলকাতার বাইরের অসংখ্য ছোট ছোট নাট্যদলের সামর্থ্যে নির্ভর করে থিয়েটারের মূল স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ জন্য কলকাতা কলকাতার সমগ্র পশ্চাদভূমি পশ্চিমবঙ্গেরও যথেষ্ট গর্ব করার আছে।

১৯৬৭ এবং তার পরবর্তীকাল জুড়ে সমগ্র ভারতের শাসকশ্রেণী বনাম শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সম্মিলিত মোর্চার, (যার নেতৃত্বে মার্কসবাদী বামপন্থীরা) এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এ কলকাতা মহানগরী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরীর এই সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি সমাজতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক দেশ উভয়েই উৎকর্ণ হয়েছিল; এবং স্বাধীন ভারতের পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শক্তির প্রতিভূ যে শাসকশ্রেণী, তার রাতের

ঘুম, দিনের তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখছিল কলকাতাকে নিয়ে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই কলকাতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছিল মিছিল নগরী, মৃত নগরী বলে। তাই শাসকশ্রেণীর দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতা ফুঁসে উঠল এক প্রতিবাদী আবেগে— সে আবেগের মধ্যে ঘৃণা প্রত্যয়, প্রেম ও অপ্রেম, রাগ ও অনুরাগ সবই মিশে গেল। বিপ্লবী শপথ ও বিদ্রোহী আস্ফালন যেমন ছিল, তেমনই ছিল হতাশার দর্শন পরাজিতের আর্তনাদ।

কলকাতা নামে ইতিপূর্বে একটিও নাটক রচিত হয়নি, যদিও কলকাতার জীবন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংকট নিয়ে একাধিক নাটক উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের পরিবর্তমান রাজনৈতিক থিয়েটারের জগতে অনেকই লেখা হয়েছিল; কিন্তু এই প্রথম কলকাতা উঠে এল নাটকের শিরোনামে, নাটকের বিষয়ে, নাটকের মঞ্চায়নে।

এ পর্যন্ত রচিত ও অভিনীত ১১টি নাটক আমরা পাচ্ছি যার কেন্দ্রীয় বিষয় কলকাতার জীবন, কলকাতার সংগ্রাম। এই ১১টি নাটক হল :

১। কলকাতার ইলেকট্রা / বুদ্ধদেব বসু, রচনাকাল : ১৯৬৭, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮
২। একাত্তর কলকাতা / অলক রায়চৌধুরী, রচনাকাল ও প্রথম চারণ দল প্রযোজনা : ১৯৭২
৩। কলকাতার হ্যামলেট / অসিত বসু, রচনা ও প্রথম সিপিএটি প্রযোজনা : ১৯৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৭
৪। দুঃস্বপ্নের নগরী / উৎপল দত্ত, রচনা ও প্রথম পি এল টি প্রযোজনা ১৯৭৪, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৯
৫। কোলকাতা কোলকাতা / লোকনাথ ভট্টাচার্য, রচনা ও প্রথম মাইমেসিস প্রযোজনা : ১৯৭৪
৬। কলকাতা, রচনা ও প্রথম দ্বান্দ্বিক প্রযোজনা : ১৯৭৪
৭। কলকাতা থেকে দূরে / শম্ভু ভট্টাচার্য, রচনা ও প্রথম একতারা নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজনা : ১৯৭৪
৮। কলকাতার ভগবান / সুদীপ্ত বসু, রচনা ও প্রথম ভ্রমর প্রযোজনা : ১৯৮২
৯। কলকাতার যীশু (একাঙ্ক) / সমীরণ আচার্য, রচনা ও প্রথম প্রযোজনা : ১৯৮২
১০। স্বয়ম্বরা কলকাতা / ইন্দ্র মাইতি, রচনা ও প্রথম সংবিৎ প্রযোজনা : জুলাই ১৯৮৫
১১। কলকাতা কবিতা (পোস্টার নাটক) / তপন দাস, রচনা ও প্রথম ঋত্বিক প্রযোজনা : ১৯৮৫

এই এগারোটি নাটকের মধ্যেই সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি ধরা পড়েছে, যে রাজনৈতিক অস্থিরতায় কলকাতা তখন একটা প্রতীক। এর অনেক পরে প্রায় দেড় দশক পরে কলকাতার জীবনী শক্তি নিয়ে এক হাসির নাটক প্রযোজিত হয়। সেটি হল :

১। কলকাতা দর্শন / রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রচনা ও প্রথম প্রকাশ লেকসাইড লাফিং ক্লাব : মে ২০০০

বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বনাম সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নানান তির্যক প্রতিফলনে রচিত উক্ত নাটকগুলি রক্তাক্ত কলকাতায় একটা সময়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে আলোচিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক হল উৎপল দত্তের *'দুঃস্বপ্নের নগরী'* এবং যার প্রদর্শন বন্ধ করার জন্য তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর

গুন্ডাবাহিনী আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং সেই সন্ত্রাস মোকাবিলা করেই দিনের পর দিন নাটকটির প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়ার ঘটনা কলকাতার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এক ঐতিহাসিক কালপর্ব রচনা করে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর *'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'*, অসিত বসুর *'কলকাতার হ্যামলেট'* থেকে সমীরণ আচার্যের *'কলকাতার যীশু'* পর্যন্ত রক্তাক্ত ধর্ষিত নগরীর কালিক আর্তনাদ প্রতিবাদে যখন উচ্চকণ্ঠ হতে চেয়েছে, তখন সেই প্রতিবাদী কলকাতাকে, তার সংগ্রামী দৃঢ়তাকে বিশ্ববাসীর সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরেছিল উৎপল দত্তের *'দুঃস্বপ্নের নগরী'*। কলকাতা তখন বলতে চেয়েছিল :

আমার প্রিয়াকে আর কত দেবে গাল,
কলঙ্কিনী বলে ডাকবে কত কাল ?
ছিন্নবসনা সে ধূলিধূসরা,
দেহকে নাকি করেছে পসরা
তবু ভালবাসি তার করুণাদীর্ণ মুখ,
সে আমার রাত্রির সান্ত্বনা, দিবসের সুখ,
কড়াপড়া হাতে সে মুছিয়ে দেয় ঘাম,-
কলকাতা আমার প্রিয়ার নাম।
ধোঁয়ার অবগুণ্ঠনে তার মুখ ঢাকা,
প্রাচীর লিখনে বলিরেখা আঁকা,
কালো পিচের রাজপথে তাঁর ছড়ানো চুল,
ক্লেদ ও পঙ্কের উল্কিতে সম্রাজ্ঞী সমতুল,
কংক্রিটের প্রাসাদে তার শুভ্র অনামিকা,
নিয়ন বাতির অঙ্গুরীয়ে আমার নাম লিখা,
বিদ্যুতের হীরকমালা পরিয়ে দিয়েছিলাম,
কলকাতা আমার প্রিয়ার নাম।
প্রিয়া আমার নগ্ন আজিকে ধর্ষিতা কৃষ্ণা,
ক্ষুধায় ক্লিষ্ট ছিন্নভিন্ন মুখে তার তৃষ্ণা,
কৌরবে আজ নিংড়ে নিচ্ছে রূপ-যৌবন মান,
খুবলে খাচ্ছে দেহের মাংস রক্ত করছে পান।
রক্তচিহ্ন প্রিয়ার ভালে ক্রোধে সে কম্পিত,
চোখের সামনে মরতে দেখেছে সন্তান শতশত
তাই যুদ্ধের সাজে সেজেছে প্রিয়া লড়ছে অবিরাম,
কলকাতা আমার প্রিয়ার নাম।

*'দুঃস্বপ্নের নগরী'*র প্রস্তাবনা দৃশ্যের এই গান কলকাতা থিয়েটারের গানের ঐতিহ্যে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। অলোক খাস্তগিরের উদাত্ত-বেদনার্ত কণ্ঠে পরিবেশিত এই গান ৭০-এর কলকাতাকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চিনিয়ে দেয় এবং নাটকের সমাপ্তিতে স্বপন চরিত্রে অলোক শেষ যে গানটি গায়, তার প্রতিটি কথা *'দুঃস্বপ্নের নগরী'*র স্পষ্ট সওয়াল জবাব হয়ে থাকে কলকাতাবাসী বঙ্গবাসীর অন্তরে।

রাত্রির শেষে নিভে যায় শহরের আলো,
পূবের নীল শাড়িতে লাগে বাসন্তীর রঙ
এই মুহূর্তটিকে যতই ভাব কালো
ভোরের ঘণ্টা একটু বাদেই বাজবে ঢং ঢং।
আমার কলকাতাকে কে বলেছে দুঃস্বপ্নের নগরী
কে বলেছে ভয়ংকর মিছিলের নগরী ?
হ্যাঁ, কলকাতা চিরদিন শাসকের দুঃস্বপ্ন।
তার মিছিলে হরতালে আতঙ্কিত অত্যাচারী।
কলকাতা মানে না ক্ষণিকের অন্ধকার,
সে দেখেছে আগামী দিনেব পূবালী রঙ
এক বুক ঘৃণা নিয়ে উষার প্রতীক্ষা তার,
অত্যাচারীর শেষ ঘণ্টা বাজবে ঢং ঢং।

পাদটীকা :

১। *কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়.* অমল মিত্র, পৃঃ ৯।
২। *সুলভ সমাচার.* ১০ ডিসেম্বব, ১৮৭২
৩। *অমৃতবাজার পত্রিকা.* ১২ ডিসেম্বব ১৮৭২।
৪। *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস.* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, পৃঃ ১৮২।
৫। *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান.* শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৬।
৬। *The Story of the Calcutta Theatres* by Sushil Kumar Mukherjee. 1982. p-224
৭। *কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়.* অমল মিত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৪।
৮। *তদেব,* পৃঃ ৫০।
৯। *Echoes from Old Calcutta.* H E Busteed Calcutta. 1882
১০। *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস.* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১।
১১। *The Story of Calcutta Theatres.* S K Mukherjee, Calcutta, 1982, p-253
১২। *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* আন্তোদভা, লেভিন কতোভস্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃঃ ৬০১।
১৩। *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* সরোজ মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৯৮৬, পৃঃ ১৫, ২০, ৩২।
১৪। *নবান্নের পৃষ্ঠপট,* চিন্মোহন সেহানবিশ, *বহুরূপী* নবান্ন সংখ্যা, পৃঃ ১৫২ ১৫৩।
১৫। নবান্নের স্মারক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় *'বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের আবির্ভাব শীর্ষক নিবন্ধ'।*
দ্র চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত *বহুরূপী,* নবান্ন স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ৩৩।
১৬। নাট্যকার ও নাট্য গবেষক সলিল সরকারের প্রদত্ত তথ্যপঞ্জী।
১৭। *প্রচার-নির্বাচন নাটক,* বিষ্ণু বসু, *গ্রুপ থিয়েটার,* ২য় বর্ষ, ২য সংখ্যা, পৃঃ ৯৪ ৯৫।

[*পশ্চিমবঙ্গ,* কলকাতা বিশেষ সংখ্যা, ২৩ বর্ষ সংখ্যা ৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৮৯, পৃ ২৩৬ ২৪৩]

কলকাতার থিয়েটারে দুইধারা ও ঝোড়ো হাওয়া

কলকাতার থিয়েটার যেদিন থেকে পাবলিক বা সাধারণ থিয়েটারের পথে পা বাড়িয়েছিল, সেইদিন থেকে সূচিত হয়েছিল কলকাতার থিয়েটারে দুই ধারার দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকেই শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া এবং দ্বন্দ্বের মাত্রার ওপরেই যে সেই ঝোড়ো হাওয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে, এ কথা আমাদের সকলেরই জানা।

থিয়েটার নিয়ে শহর কলকাতায় প্রথম ঝোড়ো হাওয়া ওঠে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে, যে ঝোড়ো হাওয়ায় শহরের বাবু সংস্কৃতির মধ্যে উপ্ত ও ব্যাপ্ত হয়েছিল প্রতিবাদী চেতনার বীজ— যে বীজ শুধু কলকাতা শহরের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বল শহর ও শহরতলিতে, তবে সীমিত পরিমাণে।

'কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা সখের অভিনেতাদের প্রদর্শিত নাট্যাভিনযের দ্বারা আনন্দলাভ করিযাছিল। তখন যুবকদের দ্বারা শেকসপীয়রের কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট নাটক অভিনীত হয় এবং যে যে ধরণের অভিনয় তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার মূলগত ভাবটি ধরিবার চেষ্টা করেন ও অনেকটা কৃতকার্য্য হন। আশানুরূপ কৃতকার্যতা লাভ না করিলেও, তখন জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া দেশীয় সমাজ—এইরূপ অভিনয় সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিল, তাহা হইতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা ছিল, শুধু যদি থিয়েটারের কার্য্য নির্ব্বাহকেরা সেই চমৎকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা নাটক সম্বন্ধে এই রুচি পুনঃপুন উত্তম অভিনয়ের দ্বারা পূর্ণ বিকশিত না করিযা, যেটুকু উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও ছোটখাট ঈর্ষা ও দলাদলির দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নাট্যশালার উপর যে যবনিকাপাত হইল, তাহা আর উত্তোলিত হইল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া আমাদের যে একটা জিনিষ ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, **পূর্ববর্তী নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায় আর একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়— যে নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক**।'[১]

১৮৫৭-র ৫ই ফেব্রুয়ারির *'হিন্দু পেট্রিয়ট'* পত্রিকার সংখ্যায়, সম্ভবত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই লিখে জানালেন যে ঐ নাটকটি *'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'* আশুতোষ দেবের বাড়ির মঞ্চে ৩০শে জানুয়ারি অভিনীত হয়েছে এবং বাংলা ভাষায়। লক্ষ করার বিষয়, সময়টা ১৮৫৭ এবং পূর্বতন প্রচেষ্টার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায় বঙ্গীয়

নাট্যশালার আবির্ভাব এবং সর্বোপরি 'বাংলা ভাষায় বাংলা নাটকে'র অভিনয় নিয়ে এই শ্লাঘাবোধ শুধু *'হিন্দু পেট্রিয়ট'*র নয়, তৎকালীন অন্য সংবাদপত্রেরও যথেষ্ট গর্ব ও প্রত্যয়ের কারণ রূপে বিবেচিত হয়েছে। একালের রাইট-আপ লেখার মতো করে *'সংবাদ প্রভাকর'* লিখেছে, 'আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার সভ্য সকলে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহুদিবস **আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই**'।[২] *'সমাচার চন্দ্রিকা'* লিখলেন, অভিনয়ের সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় 'আমরা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ করিতেছি যে **স্বজাতীয় আমোদে রসাস্বাদন গৃহীতা হইয়াছেন**'।[৩] স্থূলাকার চিহ্নিত অংশের বক্তব্য কলকাতার তৎকালীন দেশীয় শিক্ষিত মানুষ-জনের স্বজাতীয় চেতনার আত্মমর্যাদা বোধকেই ব্যক্ত করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'বাংলা নাটক' বলা হচ্ছে, অথচ নাটকটি তো সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ। ১৮৫৭-র আগে ইংরেজি থিয়েটারের সঙ্গে স্পর্ধায় বাঙালির উদ্যোগে থিয়েটার করার সময় সবই বিদেশি নাটকের অভিনয় হয়েছে; এই প্রথম সংস্কৃত অর্থাৎ বাংলার উৎসের দিকে মুখ ফেরানোয় দেশীয় উত্তরাধিকারের স্বাদ মিলছে, তাছাড়া আজকের যে বাংলা নাটক, তারও অধিকাংশের উৎস-মুখ এই রকম বঙ্গানুবাদ বা বঙ্গীকরণ প্রচেষ্টাই তো লক্ষ করা যায়।

কথা হল ১৮৫৭-র ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী কৃষক পরিবারের ঘরের ছেলেরা যখন সৈনিকের উষ্ণীষ নিয়েই স্বাধীনতাপ্রেমী সামন্তরাজাদের নেতৃত্বে— স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই শুরু করেছিল, তখন দেওয়ান মুৎসুদ্দি বেনিয়া পরিবৃত নগর কলকাতার রাজধানীতে ব্রিটিশ শাসককুল কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারেনি; যদিচ এই স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে রাজধানীর বুদ্ধিজীবীরা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থই হয়েছিলেন, তবু এই কালেই সাদা-কালোর শহরে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আলোকিত রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন ও ডিরোজিও-পন্থী ইয়ং বেঙ্গল ও অক্ষয়কুমার হরিশচন্দ্রের প্রতিবাদী চিন্তাধারার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিল ১৮৫৭ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত কলকাতার থিয়েটার ও নাট্যচর্চার ঝোড়ো হাওয়া।[৪]

এই ঝোড়ো হাওয়ায় *'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'* বিশুদ্ধ প্রেম পরিণয়ের নাটক নয়, সামন্তযুগে রাজা ও প্রজার সম্পর্ক, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, রাজন্যবর্গ কর্তৃক নারীত্বের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক। অ্যারিস্টটল ও ভরতের নাট্যশাস্ত্র এসে মিলে গেল সাতুবাবুর বাড়ির বাংলা নাট্যাভিনয়ে। এই স্বাধিকার বোধেই লেখা হয়েছিল আগে *'কুলীনকুলসর্বস্ব'*, অভিনয় হল নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭-র মার্চ মাসে।

১৮৫৮-র *'সংবাদ প্রভাকরে'* লেখা হল 'একজন সভ্যতা পথের পথিক' স্বাক্ষরিত পত্রে :

বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধূমধাম।
যেথাসেথা শুনা যায় অভিনয় নাম॥
বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ॥
নাটক লইয়া সবে রঙ্গরসে থাক।
কালিদাস হোয়ে সবে কালীনাম ডাক॥

বাংলা থিয়েটারে কালিদাস জন্মাতে পারল কি না, সে তথ্য আমাদের অজানা নয়, তবে 'কালীনাম' ডাকার দ্বন্দ্ব যে কাটাতে পারেনি অন্তত ১৮৭৬-র পর, সে তথ্য আমরা জানি। এবং এই দ্বন্দ্ব নিয়েই বাংলা তথা কলকাতার থিয়েটারে উপ্ত হয় দুই ধারার বীজ।

২

১৮৭২ থেকে কলকাতায় যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার অস্তিত্বের মধ্যেই ছিল কলকাতার থিয়েটারের দুই ধারার বীজ এবং এক ধারা সেইটাই মূল ধারা, তা হল সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী প্রতিবাদী থিয়েটারের ধারা, *'নীলদর্পণ'* নাটককে অবলম্বন করে যা আত্মপ্রকাশ করেছিল। ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, দি ইণ্ডিয়ান ('লেট' গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার সূত্রে ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬-এর ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা থিয়েটার বা কলকাতার থিয়েটার সরাসরি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে বাংলার মানুষের পরাধীনতার জ্বালা ও সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার কুৎসিত দিকগুলিকে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে উদ্ঘাটন করে কলকাতার থিয়েটারকে জাতীয় থিয়েটারের মর্যাদা দান করে। *'নীলদর্পণ'*, *'সধবার একাদশী'*, *'জামাইবারিক'*, *'একেই কি বলে সভ্যতা'*, *'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'*, *'বাজারের লড়াই'*, *'নয়শো রুপেয়া'*, *'কেরানী দর্পণ'*, *'যেমন কর্ম তেমন ফল'*, *'মোহন্তের এই কি কাজ'*, *'বিধবা বিবাহ নাটক'*, *'সতী কি কলঙ্কিনী'*, *'বঙ্গের সুখাবসান'*, *'শরৎ-সরোজিনী'*, *'সাক্ষাৎ দর্পণ'*, *'পদ্মিনী'*, *'হীরকচূর্ণ নাটক'*, *'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'*, *'সরোজিনী'*, *'নগরের নবরত্নসভা'*, *'গজদানন্দ ও যুবরাজ'*, *'হনুমান চরিত্র'*, *'পুলিশ অব পিগ এন্ড শিপ'* প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন ছিল এই ধারার সৃষ্টি। এই সব রচনার সবগুলির হয়তো সাহিত্যমূল্য খুব বেশি নেই, কিন্তু নাট্যমূল্যে তৎকালীন সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতিক বাতাবরণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছে নিঃসন্দেহে।

এই ধারার নেতৃত্বে তখন দেশের অগ্রণী শ্রেণীর মানুষজনেরাই ছিলেন—সংবাদপত্রে এই নাট্যচর্চার উদ্যোগকে যেভাবে স্বাগত জানান হয় এবং সাধারণ দর্শক ও নাট্যামোদী যুবকরা যেভাবে নাট্যচর্চায় এগিয়ে আসেন, তা দেখে তদানীন্তন ইংরেজ শাসক বাংলা নাটক ও থিয়েটারের প্রভাব বিস্তারী ভূমিকা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দেই

কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে। কলকাতার এই নাট্যচর্চা কেবল কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মফস্বলেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত যে কলকাতা থিয়েটারের উন্মেষ, ১৮৫৭ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাট্যচর্চার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শে ইংরেজি থিযেটারের প্রতি স্পর্ধা প্রদর্শন করে সমাজের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষজনের আগ্রহে, সেই নাট্যচর্চাই যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বিস্তৃতি লাভ করল এবং রাজরোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল; তখন কলকাতার থিয়েটারের ভূমিকা থেকে উচ্চবিত্তের একাংশ সরে দাঁড়ায় থিযেটাবের এই গণমুখীনতায় তাঁদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায়, এবং রাজরোষের হাত থেকে বাঁচার আশায়; আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটা বড অংশ থিয়েটার থেকে তাঁদের সমর্থন গুটিয়ে নেয় পতিতা সমাজ থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ ও পতিতা সংশ্রবে দেশের যুবসমাজের অধঃপতন লক্ষ করে। এ বিষয়ে তৎকালীন পত্রপত্রিকার সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায় থিয়েটারকে তখন ভিতর-বার দুদিককেই সামাল দিতে হয়—একদিকে দর্শকের চাহিদা ও নিয়ত দর্শকাগমকে সুনিশ্চিত করার জন্য নাটক নির্বাচনের প্রশ্ন, অন্যদিকে শাসকবর্গের রক্তচক্ষুকে আড়াল করে নাটক করে থিয়েটারকে বাঁচান। একটা বাইরের চাপ; আর একটা ভিতবেব চাপ। ভিতরের চাপ হল অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের সমালোচনাকে সামাল দিয়ে নিজেদের থিয়েটার করার প্রতিজ্ঞায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকা, এবং তার জন্য পারস্পরিক মতপার্থক্য ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতে দল ভাঙাভাঙি এবং আপস-কামিতার নীতি অবলম্বন। আর বাহরের চাপ হল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনেব ভীতি ও রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষা। এই দুই চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কলকাতার থিয়েটার তার সংগ্রামের ভাষা বদলায়—থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই দর্শকাগম সুনিশ্চিত কবাব জন্য পৌরাণিক ভক্তিবাদ গীতিনাট্য অপেরা প্রভৃতি মনোরঞ্জন ধর্মিতা প্রাধান্য পেয়ে যায়। অভিনয় সৌকর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চমাযা ও জৌলুস বৃদ্ধিব দিকে মন দিতে হয়—বিভিন্ন থিয়েটারের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায কলকাতার থিয়েটার তখন থেকে কথঞ্চিৎ ব্যবসায়ী হয়ে পড়ে।

৩

থিয়েটারে যে ঝোড়ো হাওয়া উঠেছিল তাকে একরকম জোর করেই যেন পোড়ো বাড়িটায় আবদ্ধ করে ফেলা হল। এবং এ কাজে সে যুগের দুর্ধর্ষ থিয়েটারি প্রতিভা গিরিশচন্দ্র সুকৌশলে এই গ্রন্থিবন্ধনের কাজটি সম্পন্ন করলেন। রাজরোষকে যথাসম্ভব এড়িয়ে সংস্কারমুখী ও সংস্কার বিমুখ জনসমাজের মধ্য থেকে থিয়েটারের বেঁচে থাকার মতন একটা নির্দিষ্ট দর্শক সমাজ তিনি তৈরি করে নিলেন। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সে যুগের বাংলা সংবাদপত্রের একটা বড় অংশের প্রতিবাদ (*অমৃতবাজার*

পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, সাধারণী প্রভৃতি) ইংরেজ শাসক সুনজরে দেখেনি, পরবর্তীকালে সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতাড়নের মতো ঘটনা কিংবা আফগান যুদ্ধে (১৮৭৮) ইংরেজ সরকারের ভূমিকা নিয়ে সংবাদপত্রের সোচ্চার প্রতিবাদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাকে স্তব্ধ করার জন্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮) জারি করল ইংরেজ সরকার। ১৮৭৯-এ জারি করল আর্মস অ্যাক্ট। অর্থাৎ সর্বপ্রকার দমনমূলক আইন জারি করে এ দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে স্বাদেশিকতার জঙ্গি মনোভাব পরিবর্তনে যেমন বাধ্য করে; তেমনই তাদের প্রবর্তিত এই সব আইনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনেও বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ এগিয়ে আসে—এবং যথেষ্ট জঙ্গি মনোভাব নিয়েই শিশিরকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান লিগ (১৮৭৬), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতসভা (১৮৭৬) প্রভৃতি সভা স্বাদেশিকতার আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। অপর দিকে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিখণ্ডিকরণ, এবং হিন্দুধর্মের পুনরুভ্যুত্থানে সাংস্কৃতিক জগতে প্রগতিশীলতা ও প্রগতি বিরোধিতা দুই প্রবণতাই মাথা চাড়া দেয়। গ্রামবাংলা জুড়ে চলে একের পর এক কৃষক ও ক্ষুদে কারিগরদের বিদ্রোহ। কৃষকদের পক্ষ নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র কলম ধরেন এবং ইংরেজ স্বার্থদর্শী দেশীয় জমিদার ও মধ্যবিত্তের বাবুবিলাসিতার সমালোচনা করেন শাণিত ভাষায়। শিক্ষা বিস্তার ও নারী মুক্তির আন্দোলন যেমন দানা বাঁধে, তেমনই হিন্দু রক্ষণশীলদের পক্ষ নিয়ে এর বিরোধিতাও করা হয়। দ্রষ্টব্য অমৃতলাল বসুর একাধিক প্রহসন। শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব তখন ছোটবড় নানান আদলে চললেও মূল শ্রেণীদ্বন্দ্ব কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের কালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন দেশীয় মানুষের স্বাধীনতা সাম্যমৈত্রীর গণতান্ত্রিক শ্রেণীস্বার্থ। থিয়েটার খুব সন্তর্পণে এই শ্রেণী সংঘাতের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করে যেতে লাগল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে থিয়েটারকে আবদ্ধ করে ফেললেও গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বাদেশিকতার আকাঙ্ক্ষাকে গোপন করতে পারেননি, ফলে তাঁর '*পৌরাণিক নাটক*' শীর্ষক প্রবন্ধ 'জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম-ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।'[৫] বলা সত্ত্বেও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে দেশহিতৈষিতার তাগিদেই রচনা করেন '*সিরাজদ্দৌলা*' (১৯০৫) '*মীরকাশিম*' (১৯০৬)। তার আগে অবশ্য দেশের বুকে রাজনৈতিক উত্তাপ সঞ্চিত হওয়ার কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ '*বঙ্গের প্রতাপাদিত্য*' (১৯০৩), '*রঘুবীর*' (১৯০৩), হারাণচন্দ্র রক্ষিতের '*বঙ্গের শেষ বীর বা প্রতাপাদিত্য*' (১৯০৩) অবলম্বনে ক্লাসিক থিয়েটারের '*প্রতাপাদিত্য*' মঞ্চস্থ হয়ে সমকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মানসিকতাকে উদ্দীপিত করেছে। কলকাতার থিয়েটারের এই দুই ধারা অর্থাৎ একদিকে

জনতোষণ অর্থাৎ থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা ; অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ জনগণের মানসিক উদ্দীপনাকে জাগ্রত করার দায়বোধ-এর কোনোটাকেই অস্বীকার করেনি কলকাতার থিয়েটার।

৪

সাধারণ থিয়েটারের পোড়ো বাড়িগুলো এই সময়ে আর একটা কাজ করার চেষ্টা করেছিল—ঝোড়ো হাওয়ার মতোই উপলব্ধির সমগ্রতা থেকে উঠে আসা এক নতুন থিয়েটারের ধারা যা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকল্পিত হয়েছিল ; সেই রবীন্দ্র নাটককে পেশাদারি ব্যবস্থাপনায় মেলাতে চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু মেলান যায়নি। তবে জনরুচি এই নতুন থিয়েটারের মঞ্চভাষায় যে সুরুচির ছাপ দেখেছিল, সেই সুরুচি প্রতিষ্ঠায় গিরিশোত্তর যুগে শিশিরকুমারের অবদান ছিল যুগান্তকারী। ১৯২১ থেকে ১৯৪৩-৪৪ পর্যন্ত শিশিরকুমার প্রয়োগকর্তা হিসেবে, সুদক্ষ নট হিসেবে এই দুই ধারার মেলবন্ধন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন, এবং ঝড় তুলেছেন।

যুগ চেতনার স্বাস্থ্যবান মূল্যবোধগুলিকে তাঁর নাট্য নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন—দেশাত্মবোধক আবেগ কিংবা নারীর প্রতি মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিত্বের গৌরব ; কিন্তু নতুন কোনো নাটক বা নাট্যকারের সম্ভাবনাকে তিনি বাস্তবায়িত করে যেতে পারেননি ; যেমন পারেননি রবীন্দ্র নাট্যকে সাধারণ মঞ্চে জনপ্রিয় করাতে। 'আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানাদিক থেকে।'[৬]

১৯২১ পরবর্তী দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের পদধ্বনি শুনতে তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু থিয়েটারের টোটালিটিতে এত মগ্ন ছিলেন যে দেশজোড়া গণবিক্ষোভ আর ক্ষুধিতের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে কিছু করে উঠতে পারেননি। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের প্রথম দশ বছর বাদ দিলে তারপর আর নতুন কিছু করতে পারেননি, নিজের অতীতকেই সৃষ্টি করেছেন।[৭]

১৯১৭-এর রুশবিপ্লব, ১৯২৪-এর কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহম্‌দ, ডাঙ্গে, শওকত ওসমানি ও নলিনী গুপ্তের চার বৎসর কারাবাস, ১৯২৭ সালে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস্ পার্টি, ঐ বছরেই ডকমজদুর ধর্মঘট, ১৯২৮-এ কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গর ধর্মঘট, ১৯২৯-১৯৩৩ মিরাট কমিউনিস্ট মামলা ; ওদিকে ১৯১৭ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিস্ট অংশের ভূমিকা, ১৯৩৯ থেকে ৪৩-৪৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের মানুষ তখন উত্তেজিত।

এই উত্তেজনায় বাংলার যুবসমাজের বৃহত্তর অংশ, কী কলকাতায়, কী গ্রামাঞ্চলে থিয়েটার বা সঙ্গীতচর্চার চেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল শরীর-চর্চা, লাঠিখেলা, সড়কি চালান, বন্দুক চালান। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের ডাক, সন্ত্রাসবাদের আহ্বান, সাম্যবাদী কমিউনিজমের আদর্শে মজদুর কৃষকদের সংগঠিত গণআন্দোলন, কংগ্রেস-বিরোধী জাতীয়তাবাদী পার্টির নানা সংগঠন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক ও আজাদহিন্দ ফৌজের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগ্রামের আহ্বান— মূল কথা স্বাধীনতা, এই চিন্তা তখন প্রবল। এই প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিগ্বিজয়ী শিশিরকুমারকে থিয়েটারের পোড়ো বাড়িতেই আবদ্ধ থাকতে হল। কারণ তাঁর চারপাশে তখন বালিতে মুখ গুঁজে থাকা মধ্যবিত্ত মাপের বাবুরা।

আর এই রাজনৈতিক ঝোড়ো হাওয়ায় শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম ছাড়া বাকি মঞ্চগুলিতে তখন ঝুলকালি পড়লেও বাদুড়ঝোলা ভিড় বোধ করি ছিল না। এ বিষয়ে তৎকালীন সাধারণ থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য প্রথমে নেওয়া যাক, তিনি *'গণনাট্য'* শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন :

'মাঝামাঝি সমাজই থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরে আছে। সস্তা সিনেমার যুগে, ভারতের অন্যত্র, থিয়েটারের যখন নাভিশ্বাস, বাঙালীর কলকাতায় তখন পাঁচটি থিয়েটার চলছে, আর ভালই চলছে বলতে হবে। বাংলার বুকের ওপর যখন দুর্ভিক্ষ-মহামারীর তাণ্ডব, তখন থিয়েটার ভালো চলা উচিত ছিল না। চলছে সেই শ্রেণীর জন্যে, যে শ্রেণীর পক্ষে দেশের এ দুর্দৈব নয়, যে শ্রেণী দেশব্যাপী দুর্দৈবের প্রতি চোখ বুজে থাকতে চায়, আর থাকতে পারে। এ শ্রেণীর লোক নীচের দিকে তাকায় না, লক্ষ্য তাদের ওপরের দিকে। তলাকার টানে ভেতরের ভাঙ্গনকে অস্বীকার করবার দুরূহ প্রয়াস ক'রে ক'রে এদের জীবনও যেমন নানা অসঙ্গতিপূর্ণ, থিয়েটারেও তেমনি সেই সব অসঙ্গতি প্রতিফলিত। জীবন ও সমাজের আপাত সমস্যা সব দুরূহ বলে এড়িয়ে গিয়ে নির্বিচারে পুরাতন আদর্শের মহিমা কীর্তনের মধ্যেই থিয়েটারের কর্তব্য ও কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ।'

পেশাদারি সাধারণ থিয়েটারের অভিনেতা হয়েও মহর্ষি রূপে খ্যাত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মূল প্রতিবাদী ধারার থিয়েটারের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। জীবিকার স্বার্থে যুক্ত থাকা সাধারণ থিয়েটারের দুর্দশা, যা তিনি উদ্ধৃত অংশে ব্যক্ত করেছেন তার পরিবর্তনে, তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। কারণ তিনি তো শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র বা মহেন্দ্র গুপ্ত হতে চাননি ; তিনি চেয়েছিলেন থিয়েটারকে মানুষের চেতনা উদ্বোধনে উদ্দীপিত করতে; তাই ১৯৪৩-এ যখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জন্ম নেয়, তখন সহজেই তিনি সেই সংঘের বাংলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

৫

'জীবন ও সমাজের আপাত সমস্যা সব দুরূহ বলে এড়িয়ে গিয়ে নির্বিচারে পুরাতন আদর্শের মহিমা কীর্তনের মধ্যেই থিয়েটারের কর্তব্য ও কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ' রূপে যখন স্থিরীকৃত, তখন তদানীন্তন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের লেখা *'এক শো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ'* গ্রন্থের সাক্ষ্য নেওয়া যাক :

'সপ্তম দশক॥ [ইং ১৯৩২-১৯৪১ সন।]
নাটক রচনা : ১৪২ খানি। অভিনীত নাটক : ৮৪টি।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা – ৮ : স্টার, মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন, রঙমহল, নবনাট্য মন্দির, রঙ্গমহল (নতুন বাজার), চিপ থিয়েটার (ধর্মতলা), নাট্য-ভারতী। উল্লেখযোগ্য নাট্যকার : ৩৪ জন। রবীন্দ্রনাথ একদিকে, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ অপর প্রান্তে। উল্লেখযোগ্য অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যা – ৭০ জন। একদিকে শিশিরকুমার, অপর প্রান্তে কার্তিক দে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে : দানীবাবু, অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ; এবং আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সতু সেন কর্তৃক রঙমহলে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন।

শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্ত তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নবীন নাট্যকার। মূলত শরৎচন্দ্রের মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সুপরিচিত কাহিনীর সার্থক নাট্যরূপ দানের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের বিশ্বাস অর্জন করেন। উপরোক্ত যে যুগ বিভাগ করে সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন তা ১৮৭২-র সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম সময় ধরে। ঐ সময়ের অনেক পরে তিনি থিয়েটারের একজন ঘনিষ্ঠ দর্শক। ভেতরে ভেতরে সেই সময় যুক্ত হওয়ার প্রস্তুতিও চলছিল। ১৯২৯ থেকে তিনি নাট্যরচনায় ব্রতী হন, তাঁর প্রথম নাটক *'রামের সুমতি'*র নাট্যরূপ দিয়ে রঙমহলে যোগ দেন। তারপর থেকে সাধারণ থিয়েটারে নাট্যকার রূপে যোগ দিয়ে এ পর্যন্ত ৩৬ খানি নাট্যরচনা, নাটক ও থিয়েটারের জগৎ নিয়ে ৮ খানি গ্রন্থেরও রচয়িতা। সুতরাং সাধারণ রঙ্গালয়ের আমরা যখন দুঃসময় অনুমান করছি, তখন শ্রীগুপ্তের এই পরিণত বয়সের মূল্যায়নকে আমাদের গুরুত্ব দিয়েই দেখতে হয়,[৮] অবশ্য মহর্ষির' প্রতিবেদন মনে রেখেই।

শ্রীগুপ্ত উপরে যে আটটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা কিন্তু আসলে সাতটি। শিশিরকুমারের নব নাট্যমন্দির আসলে স্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ভবনেরই সাময়িক নাম। এই দশকে দুটি নতুন রঙ্গমঞ্চ চালু হয়, ধর্মতলা স্ট্রিটের চিপ থিয়েটার ও আপার চিৎপুর রোডের নতুন বাজারের কাছে রঙ্গমহল। চিপ থিয়েটার চালু হয় বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের *'ক্রীতদাসী'* দিয়ে ১৯৩৩-এর ৭ই জানুয়ারি আর ১৯৩৩-এর ২৫শে ডিসেম্বর রঙ্গমহল চালু হয় *'চিত্রাঙ্গদা'* নিয়ে। এরপর ১৯৩৫-এর চিপ

থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ সদলবলে রঙ্গমহলে যোগ দান করে রঙ্গমহলকে রূপমহলে পরিণত করেও বেশিদিন চালাতে পারেননি, দুটি থিয়েটারই বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৩৬ নাগাদ।

আর বর্তমানের গ্রেস সিনেমা যে ভবনে, সেখানে ১৯৩৯-এ নাট্যভারতীর উদ্বোধন হয় *'তটিনীর বিচার'* দিয়ে এবং এই মঞ্চটি চালু থাকে ১৯৪৩-৪৪ পর্যন্ত। তাহলে এই দশকে মঞ্চের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচটি। ১৯৪৩-এ স্টার থিয়েটার ভবনে আর্ট থিয়েটারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে নব নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪-এর জুলাই-এ, আর ১৯৩৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এর আয়ুষ্কালে অভিনীত হয়েছে *'বিরাজবৌ'*, *'সরমা'*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *'দশের দাবি'*, *'বিজয়া'*, *'শ্যামা'*, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের *'রীতিমত নাটক'*, শরৎচন্দ্রের *'গৃহদাহ'* অবলম্বনে *'অচলা'* ও রবীন্দ্রনাথের *'যোগাযোগ'*। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫-এর তিন বছরে নাট্যনিকেতন মঞ্চে ১৬টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য প্রযোজনার মধ্যে ছিল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের *'চক্রব্যূহ'*, অনুরূপা দেবীর *'মা'* প্রভৃতি। তারপর আবার প্রবোধ গুহের পরিচালনায় নাট্যনিকেতন চলে ১৯৪১ পর্যন্ত। এ সময়ে শচীন সেনগুপ্তের *'সিরাজদ্দৌল্লা'*, মন্মথ রায়ের *'মীরকাশিম'*, শরৎচন্দ্রের *'পথের দাবি'* ও তারাশংকরের *'কালিন্দী'* ছিল উল্লেখ্য প্রযোজনার তালিকায়। নব নাট্যমন্দির বিলুপ্তির পর ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত স্টার থিয়েটারে বিমল পালের ব্যবস্থাপনায় *'বিদ্যাপতি'*, *'অভিসারিকা'* ও শচীন সেনগুপ্তের *'কালের দাবী'* মঞ্চস্থ করে নতুন মালিক সলিল মিত্রের কাছে হস্তান্তরিত হয় ১৯৩৮-এর মে-জুনে। ১৯৩৭ পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটার চলেছে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। এখানে অভিনীত নাটকের নাম হল মহেন্দ্র গুপ্তের *'গয়াতীর্থ'*, *'ধর্মদ্বন্দ্ব'*, বিধায়কের *'চিরন্তনী'*, শচীন সেনগুপ্তের *'কাঁটাকমল'*। রঙমহল থিয়েটার নির্মিত হয় ১৯৩১-এ। আর এক দশকের মধ্যে 'একাধিক ব্যক্তি রঙমহল থিয়েটারের কর্তৃত্ব নিয়েছেন এবং ছেড়েছেন।' সতু সেন যোগদানের পর রঙমহলে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ থেকে মঞ্চমায়া পর্যন্ত অনেক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেও থিয়েটার ব্যবসায়ীরা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেনি। যদিচ এই সময়কালে রঙমহলে মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রযোজনা নাকি সাড়া ফেলেছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল *'মহানিশা'*, *'অশোক'*, *'তটিনীর বিচার'*, *'মাটির ঘর'*, *'বিশ বছর আগে'*, *'রত্নদীপ'*, *'রক্তের ডাক'* প্রভৃতি। ১৯৪২-এ রঙমহলে *'ভোলা মাস্টার'* বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

দেবনারায়ণ গুপ্তের এ সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে কলকাতার থিয়েটার তদানীন্তন সময়ের উত্তাপকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেও ছুঁতে পারেনি—মূলত কোনো নাটকেই জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা আনা যায়নি। এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আনীত অভিযোগই শেষ পর্যন্ত টিঁকে যায়। পোড়ো বাড়ির শূন্যতা নিয়ে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের কলকাতার থিয়েটার প্রবহমান ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে মাত্র।

৬

পরবর্তী দশক ১৯৪২ থেকে ১৯৫১। উত্তাল কলকাতা, উত্তাল বাংলাদেশ। সাধারণ থিয়েটারে তার তিলমাত্র ঢেউ লাগল না—মাথার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ায় বয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগাস্ট আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ, বাস্তুহারার স্রোত, তেভাগা, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবার গণআন্দোলন—থিয়েটার, কলকাতার থিয়েটার সাধারণ রঙ্গালয়ের বুকের উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে গেল—প্রখর তাপে মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত বাতাস যখন উত্তপ্ত হয়, তখনই তো ঝড় ওঠে, ততো সেই ঝড়ে কলকাতার থিয়েটার এমন আলোড়ন তুলল যে পাবলিক থিয়েটারের নাটক নীরক্ত দেহে মুখ থুবড়ে পড়ল, আর এই নতুন গণনাট্য বাংলা থিয়েটারের মূলধারা হয়ে উঠল। *'নীলদর্পণ'*-এর পর গণনাট্য সংঘের *'নবান্ন'* সেই ফলক চিহ্ন নির্মাণ করল, সেখান থেকে বাংলা নাটক বাস্তবের জীবন সংগ্রামের আলেখ্যই শুধু নির্দেশ করল না, নির্দেশ করল বাস্তববাদী জীবনরসে সম্পৃক্ত এক নতুন মঞ্চভাষার। স্বভাবতই এই সময় থেকে বাংলা থিয়েটার সম্পূর্ণত দুই ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল। নাট্যবস্তু নির্বাচন, নাট্যরচনা, এবং প্রযোজনা বৈশিষ্ট্যে সাধারণ রঙ্গালয় হয়ে উঠল পুরোমাত্রায় ব্যবসায়িক, আর বিপরীতক্রমে গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার নাট্যরচনা ও প্রযোজনা বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠল বাংলা থিয়েটারের মূলধারা।

৭

এই সময়কালে সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্যে শ্রীরঙ্গমের চলতি নাটক ছিল *'উড়ো-চিঠি'*, *'দেশবন্ধু'*, *'মায়া'*, *'মাইকেল'*, *'বিপ্রদাস'*। ১৯৪৪-এর ২৪ শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গমে গণানাট্য সংঘের *'নবান্ন'* প্রথম অভিনীত হয়। তার আগে শিশিরকুমার অভিনীত ও নির্দেশিত শ্রীরঙ্গমের নতুন নাটক হল *'বিপ্রদাস'*, এর প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৩। আর *'নবান্ন'*-র ঐ মঞ্চে শেষ অভিনয় ২০শে নভেম্বর ১৯৪৪। এরপর শিশিরকুমার ঐ মঞ্চে তার নতুন প্রযোজনা নামালেন *'বিন্দুর ছেলে'*। এতে স্বাস্থ্যের কারণে, দেবনারায়ণ গুপ্ত জানাচ্ছেন, 'শিশিরকুমার কোনো অভিনয় করেননি। কথিত আছে, গণনাট্য সংঘকে *'নবান্ন'* অভিনয়ের জন্য এরপর আর শ্রীরঙ্গম দেওয়া হয়নি।[৯] গঙ্গাপদ বসু *'নবানের আগে'* স্মৃতিচারণ লিখেছেন :

'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, পেছনের প্ল্যাটফর্মটা কেন ? বলাবাহুল্য, আমাদের উত্তর তাঁর মনঃপূত হলো না। তারপর বললেন ; এ সব নাটক তোমার দুএকদিন করলে, লোকে দেখলো,— কিন্তু আমরা করলে লোক আসবে না, বলবে ওটা ভিখিরীদের থিয়েটার। স্টেট ব্যাকিং না থাকলে এ সব'— বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন। অবশ্য 'ভিখিরীদের থিয়েটার' তিনি পরে করেছেন যদিও নিজে নামেননি—*'দুঃখীর ইমান'*।[১০]

এই *'দুঃখীর ইমান'* শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪৬-র ১২ ডিসেম্বর। দেবনারায়ণ গুপ্ত এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে *'দুঃখীর ইমান'*-এর মতো নাটক মঞ্চস্থ করে নাট্যাচার্য তাঁর শেষ জীবনে নাট্যপ্রয়োগ নৈপুণ্যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।'[১১]

'ভিখিরীদের থিয়েটার'—অর্থাৎ দেশের মর্মন্তুদ দারিদ্র্যের জীবননাট্য এমন একটা ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করল, যাকে শেষ পর্যন্ত নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের দাম্ভিকতাকেও মেনে নিতে হল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তো ব্যবসায়ী থিয়েটার, কলকাতার থিয়েটারের এই দর্শকচরিত্র সম্পর্কে মহর্ষির কথাই স্মরণ করা যাক,

'থিয়েটার যাঁরা সচরাচর দেখেন, তাঁরা ভদ্রলোক। অন্ততঃ ভদ্রলোক সেজে থিয়েটারে আসতে হয়, নিমন্ত্রণ বাড়ি যাবার মতো। থিয়েটারে নিমন্ত্রণ, একেবারে খাতিরে হয় না বলা চলে না, কিন্তু নিমন্ত্রণপত্র মূল্য দিয়ে কেনাই নিয়ম। ন্যূনতম মূল্য ও ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতার সংস্থান যাঁদের নেই, তাঁরা থিয়েটারে অপাঙ্‌ক্তেয়। আমাদের দেশের খুব বেশির ভাগ লোকই এ রূপ সঙ্গতিবিহীন। খুব বেশির ভাগ লোককে যদি জনসাধারণ বলি, তবে থিয়েটারের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ, এক কথায় নেই। থিয়েটার ভদ্র সাধারণের।'[১২]

অন্যত্র লিখেছেন, 'দরিদ্র কৃষক শ্রমিক শ্রেণী থিয়েটারের আনাচ কানাচ মাত্র স্পর্শ করতে পেরেছেন। কী করে সে শ্রেণীর কাছে থিয়েটার আপনার করে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই হচ্ছে সমস্যা।'[১৩] গণনাট্য সংঘ এই থিয়েটারের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে তৎকালে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে অপেশাদার থিয়েটার আন্দোলন এত ব্যাপক গভীর হতে পেরেছিল।

এখন আমাদের প্রশ্ন কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দর্শক হল ভদ্র-সাধারণ—তাঁরা কী চাইতেন, আর গণনাট্য বা তার ভাবাদর্শে বিভিন্ন অপেশাদার নাট্যদলের দর্শক হল জনসাধারণ—তাঁরা কী চাইতেন? এই দুই চাহিদার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্যটা কী।

'অপেশাদার সংস্থাগুলি যে নাটক প্রযোজনা করে থাকেন, তা সাধারণত শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় বা অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সর্বশ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জন করার একটা দিক থাকে।'[১৪] মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কলকাতার পাবলিক থিয়েটারের যে 'ভদ্র সাধারণ' দর্শকদের কথা বলেছেন, তাঁরাই শ্রীগুপ্তের ভাষায় 'সর্বশ্রেণীর দর্শক' এবং তাঁদের মনোরঞ্জন করাই ছিল তো সাধারণ থিয়েটারের উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য এখনও আছে। অর্থাৎ এই সর্বশ্রেণীর ভদ্র সাধারণ একটাই জিনিস চাইতেন তা হল সহজবোধ্য মনোরঞ্জন। আর গণনাট্য সংঘ বা অপেশাদার নাট্যদলের দর্শক হলেন সেই গরিব শ্রমিক কৃষক বা মধ্যবিত্ত জনসাধারণ, —যাঁরা শিক্ষিত। কথাটা সম্ভবত তাহলে দাঁড়ায় দেশের আর্থ-সমাজিক রাজনৈতিক

প্রশ্নে যাঁরা উদ্বিগ্ন এবং সচেতন থাকতে অনাগ্রহী, মহর্ষির ভাষায় যাঁরা 'দেশব্যাপী দুর্দৈবের প্রতি চোখ বুজে থাকতে চায়', তাঁরাই ছিলেন সাধারণ থিয়েটারের দর্শক, এবং আমরা জানি এই দর্শকের কারণেই শ্রীরঙ্গমের *'দুঃখীর ইমান'* বেশিদিন চলেনি।

কলকাতার থিয়েটারের দুই ধারা এই ভাবে যখন স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ১৯৪৩ পরবর্তী কালে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটক আর তার থিয়েটার ভাষা কখনই মূলধারা হতে পারেনি এ তথ্যও সত্য। কিন্তু এই দুই ধারার পারস্পরিক সংঘাত ও সংমিশ্রণের বিশ্লেষণও আজ একান্ত জরুরি কারণ কলকাতা থিয়েটারের শহর, আর কলকাতার থিয়েটার শুধু কলকাতার নয়, সারা পশ্চিমবাংলার। পশ্চিমবাংলার সচেতন মানুষ পাবলিক থিয়েটারের ক্ষেত্রে এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি নেবে, আর গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রে ভিন্নরকম—এ পার্থক্য তো দূর করে উভয়কে মেলান যায়। বিগত ৪০ বছরের ইতিহাসে কিন্তু এ দুই থিয়েটারের মিলনের চেষ্টা হয়েছে—নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে এবং সাংগঠনিক উদ্যোগেও।[১৫]

কিন্তু মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে। একটা বাণিজ্য, কমোডিটি; দ্বিতীয়টা আদর্শ, ক্রিয়েশন। দর্শক বিন্যাসও তাই, অসম বিকাশ; সুতরাং দর্শক রুচিতে, চাহিদায় এত পার্থক্য। প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এঁদেরও সামাজিক শ্রেণী অবস্থানগত পার্থক্য। সাধারণ থিয়েটারে যা পেশা, ভিন্ন থিয়েটারে তা শৈল্পিক তাগিদ। একমাত্র নেপথ্যশিল্পী যাঁরা তাঁরা উভয় থিয়েটারেই পেশাগতভাবে যুক্ত। মফস্বলের ক্ষেত্রে অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, এখানে একমাত্র যাঁরা আলো ও রূপসজ্জার কাজে ব্যস্ত. তাঁরা মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটার ও শৌখিন যাত্রা নাট্যানুষ্ঠানেই জীবিকা অর্জন করেন। এই জীবিকার প্রশ্নে কিংবা আদর্শে স্থিতনিষ্ঠ থাকার প্রশ্ন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে পারফর্মিং আর্টসের শিল্পীদের তাই কোনো নিরাপত্তা নেই। মানুষের মৌলিক অধিকার সংবিধানে যা প্রদত্ত আছে, বাস্তবে তার অমিল এতটাই যে জীবিকার প্রশ্ন বা কাজের অধিকার সেখানে দাবি হিসেবে স্বীকৃতিই পাচ্ছে না—ফলে স্বাধীনতার ৪২ বৎসর পার হয়ে আসা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে—যেখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষকে জীবনধারণ করতে হয় শতকরা ৬০ ভাগ, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় শতকরা ৭০ ভাগ, সে দেশে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের জগতের শিল্পীদেরও দুই ধারার থিয়েটারে পারাপার করে লড়াই করতে হয়। অন্তত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও আদর্শ স্থিতনিষ্ঠ থেকেই পেশাদার সাধারণ থিয়েটারে যোগদান করে কিংবা ভিন্ন কোনো জীবিকায় মাথা গুঁজে শিল্পীকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এমনটা হত না, যদি থিয়েটারের ঝোড়ো হাওয়ায় উপরিকাঠামোসহ ভিতটাকেই বদলে দেওয়া যেত। কিন্তু একা থিয়েটার সে কাজ সম্ভবত করতে পারে না, যদি না তার সঙ্গে দেশের শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতির গভীর সংশ্রব থাকে। আমাদের কলকাতার তথা বাংলার অন্যধারার থিয়েটারের সেই যোগটা আছে বলেই এ রাজ্যের মানুষের শ্রেণীসচেতনতার

সংগ্রামকে সে উন্নীত করতে পারছে। আর পারছে বলেই বাংলা তথা কলকাতার রাজনৈতিক থিয়েটারকে ভারতের শাসক শ্রেণী ভয় পায়, আর ভয় পায় বলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে তার কিছু কিছু নিউক্লিয়াসকে স্বীকৃতি ও শিরোপা দিয়ে দুর্বল করে ফেলতে চায়। কিন্তু কলকাতার থিয়েটার শ্রেণীসংগ্রাম ও শিল্পসৃষ্টির সংগ্রামকে এক করে দেখে বলেই সে শাসকশ্রেণীর শিল্পপ্রীতির জারিজুরিকে তছনছ করে ঝোড়ো হাওয়া তুলে এগোয়।

চল্লিশ থেকে এই আশির দশকের মধ্যে কলকাতার থিয়েটার বাংলা তথা ভারতের অনেক ঘটনার সাক্ষী, অনেক ঘটনার স্রষ্টা। চল্লিশের দশকে কলকাতা শহরে যখন গণনাট্য আন্দোলন ঝড় তুলেছে, তখন রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়টি—স্টার, শ্রীরঙ্গম (বিশ্বরূপা), মিনার্ভা, রঙমহল, কালিকা ও নিউ এম্পায়ার। পাঁচের দশকে গণনাট্য সংঘ ও বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, শৌভনিক, অনুশীলন, গন্ধর্ব প্রভৃতি অপেশাদার নাট্যদলের থিয়েটারচর্চা বিস্তৃতি লাভ করেছে যখন, তখন কালিকা উঠে গেল কিন্তু নতুন রঙ্গমঞ্চ হল তিনটি—থিয়েটার সেন্টার (১৯৫৪), অবনমহল (১৯৫৫) ও শ্রীশিক্ষায়তন (১৯৫৮)। ষাটের দশকে আরও সাতটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি হল—মুক্তাঙ্গন (১৯৬২), রবীন্দ্রসদন (১৯৬৬), কলামন্দির (১৯৬৮), হিন্দি হাইস্কুল, ত্যাগরাজ হল, প্রতাপ মঞ্চ (১৯৬২), কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ (১৯৬২), বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন (১৯৬৫)। সত্তরের দশকে হয় অ্যাকাদেমি অব্ ফাইন আর্টস (১৯৭০), বয়েজ ওন (১৯৭১), রামমোহন মঞ্চ (১৯৭৪), রঙ্গনা (১৯৭৪), যোগেশ মাইম (১৯৭৭), শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ (১৯৭৬), অহীন্দ্র মঞ্চ (১৯৭৮), শিশির মঞ্চ (১৯৭৮), সারকারিনা (১৯৭৮), বিজন থিয়েটার (১৯৭৯)। আশিতে তৈরি হয় জ্ঞানমঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ (১৯৮৬), বিড়লা সভাঘর মঞ্চ। কলকাতার বাইরে শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চ। রায়গঞ্জে ছন্দম মঞ্চ (১৯৯৯)। প্রতিটি জেলা শহরে দু-তিনটি করে সরকারি ও বেসরকারি মঞ্চ। বালুরঘাটে বালুরঘাট নাট্যমন্দির ও ত্রিতীর্থ মঞ্চ। আসলে গত তিন দশকে কলকাতা ও রাজ্যব্যাপী যত মঞ্চ হয়েছে, এতগুলি মঞ্চ ভারতের আর অন্য কোনো শহরে বা রাজ্যে হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট হয় এ রাজ্যের জনমানসে থিয়েটারের পরিধি কত বিস্তৃত। এবং এই যে সাতের দশক থেকে রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল, এর মূলেও কিন্তু দুই ধারার থিয়েটারের দ্বন্দ্বই কার্যকরী ছিল। এইসব রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টির পেছনে একদিকে ছিল গ্রুপ থিয়েটারের হলের সমস্যা দূর করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্তরের উদ্যোগ ; অপরদিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে অপসংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দিয়ে গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলনকে ধ্বংস করার এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত। সুখের কথা বাংলার দর্শকসমাজ অপসংস্কৃতির চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। কলকাতা আজ থিয়েটারে ছয়লাপ।

সত্তরের দশকে আমাদের থিয়েটারের সবচেয়ে সুসময় ও দুঃসময় গেছে বলে অনেকের অভিমত। এ অভিমতের বাস্তবতা হল—কলকাতার থিয়েটারের এই দ্বি-ধারার দ্বন্দ্ব।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ রাজ্যের বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের মূল্যবান অধ্যায় সূচিত হয় ছয়ের দশকের শেষে, তারই এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধির সময় গেছে সত্তরের দশকে। দক্ষিণপন্থী ও উগ্রপন্থীর দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এইকালে। তার সঙ্গে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিবাদী জমিদারি স্বার্থের রক্ষক শাসক কংগ্রেসের স্বৈরাচারী আক্রমণ ঘনীভূত হয় এ রাজ্যের বামপন্থীদের উপর। এ আক্রমণের সঙ্গে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বন্দ্ব ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন মদতও যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। এই রাজনৈতিক বাত্যার মধ্যে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মধ্যবিত্তের সচেতন অংশের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে এবং শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকটের ফলশ্রুতিতে জনগণের জয় হয়। সেই জয়ে ১৯৭৮ থেকে যে বামফ্রন্টের ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এ রাজ্যে, তার সাফল্যের সাংস্কৃতিক ভাগিদার নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের গণনাট্য সংঘ ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্মিলিত প্রয়াসে সংঘবদ্ধ গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন। সত্তরের দশককে কলকাতা তথা বাংলা থিয়েটারের সুসময় বলতে গেলে এই স্বৈরতন্ত্র বিরোধী প্রগতিশীল থিয়েটারের পোড়ামাটি নীতির সংগ্রামকেই বোঝাবে। শাসকশ্রেণী কলকাতাকে *'দুঃস্বপ্নের নগরী'* বললে এ রাজ্যের থিয়েটারই তার মুখের মতো জবাব দেয়। এবং সে জবাবের পক্ষেই জনগণের রায় হয়। শেকস্‌পিয়র থেকে বার্টোল্ট ব্রেশট, দীনবন্ধু থেকে উৎপল দত্ত (*এবার রাজার পালা / দুঃস্বপ্নের নগরী*), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (*রাজরক্ত / মহাকালীর বাচ্চা*), মনোজ মিত্র (*নরক গুলজার*) এই সংগ্রামে আরও অসংখ্য নাট্যকারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অন্য ধারার থিয়েটার নিয়ে। আর দুঃসময় বলতে গেলে মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা নিয়ে যে কিছু শিল্পী ছিলেন এই আন্দোলনের আশেপাশে, শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে তাঁদের ক্রিয়াকলাপও শুরু হয়ে যায় এই দশকের শেষে ; থিয়েটারকে পণ্যে পরিণত করে অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেয় প্রগতি বিরোধিতার জন্য। বিদেশি দূতাবাসগুলির মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে সাংস্কৃতিক উপঢৌকনের জাল পাতে, তাতেও কিছু কমিউনিজম-বিরোধী শিল্পীর আঙ্গিক নাট্যচর্চা শুরু হয় এই সময়। কিন্তু কলকাতার থিয়েটার সত্তর দশক পার হয়ে আসা সংগ্রামী বাংলার সংগ্রামী থিয়েটার। তাই তার গায়ে কোথায় দু-পাঁচটা আঁচড় কাটল ভূতের নৃত্য, তাতে কিছু যায় আসে না। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের 'এ' মার্কা নাটক আজ কলকাতার রুচিবান মানুষের সমর্থন না পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। স্টার থিয়েটার এই সাধারণ থিয়েটারের নোংরামির বিরুদ্ধে একমাত্র আলোকবর্তিকার মতন দীপ্যমান ছিল ঐ দুঃসময়ের কালে, তারাই জিতল, আর প্রতাপ মঞ্চ থেকে শুরু করে বিশ্বরূপা পর্যন্ত সবাই নোংরা ঘেঁটে মরল। সাধারণ থিয়েটার তাই *'নামজীবন' 'নীলকণ্ঠ' 'পেটো পাঁচু'*র মতন আবার সুস্থ সুরুচির নাট্যচর্চায় নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে পারল। এ জন্য অবশ্য কলকাতার ও মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটারগুলির সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গির নিরলস সৃজনধর্মী নাট্যপ্রযোজনার ঝোড়ো হাওয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকেই সদর্থে দায়ী করতে হয়।

পাদটীকা :

১। *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতুবাবুর বাড়িতে বাংলা নাটকের অভিনয় শীর্ষক অধ্যায়, পৃঃ ৩৫।

২। *সংবাদ প্রভাকর,* ১৫ জানুয়ারি ১৮৫৭।

৩। *সমাচার চন্দ্রিকা,* ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

৪। *The Indian Theatre,* Adya Rangacharya, Page 98-99

৫। *পৌরাণিক নাটক,* গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *রঙ্গালয়,* ৩০ চৈত্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

৬। *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ,* শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

৭। *শিশিরকুমার প্রসঙ্গে* : শম্ভু মিত্র, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত সাক্ষাৎকার।

৮। *একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ* : দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ইং আগস্ট ১৯৮২।

৯। *বহুরূপী,* নবান্ন সংখ্যা, পৃঃ ৮৯।

১০। *বহুরূপী,* নবান্ন সংখ্যা, পৃঃ ১৪৬।

১১। *একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ* : দেবনারায়ণ গুপ্ত, পৃঃ ৬১।

১২। *থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮২।

১৩। *থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮০।

১৪। *একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ* : দেবনারায়ণ গুপ্ত, পৃঃ ১০২।

১৫। *বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদ (১৯৫৭)-এর কার্যক্রম ও সাতের দশকের শেষে গ্রুপ থিয়েটারের পেশাদারি হয়ে ওঠা বিষয়ক বিতর্ক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।*

[*গ্রুপ থিয়েটার*, ১২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, আগস্ট অক্টোবর ১৯৮৯, পৃঃ ৪৯ ৬৪]

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার

'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার' নামেই[১] সম্প্রতি একখানি সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার বিষয় রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভা কীভাবে রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে তদানীন্তন সাক্ষ্যপ্রমাণে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করা ; এ ছাড়া রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য ও তার প্রয়োগভাবনা বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি এতাবৎ কম লিখিত হয়নি; রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর নাট্যভাবনাকে নানাভাবে গ্রথিত করে গেছেন নাট্যরচনা ও প্রযোজনার পাশাপাশি, সেই রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারকে কেন বাংলা থিয়েটারের মূল ধারার থিয়েটার রূপে বিবেচনা করা গেল না, অথচ এই রবীন্দ্র থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছে বাঙালি মন ও মননের নিজস্ব নাট্যরূপটি, তারই এক বিনীত অনুসন্ধানে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনকালে তেষট্টি বছর[২] ধরে নিরন্তর নাট্যচর্চার দ্বারা তদানীন্তন বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চপ্রয়োগের ধারায় একটি পৃথক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় উল্লেখ্য নাট্যরচনা-ও প্রযোজনা তাঁর জীবনকালেই সমাদৃত হয়েছিল এবং উত্তরকালে তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছে রুচিশীল নাট্যপ্রেমিকের কাছে। তা সত্ত্বেও তাঁর নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চভাষাকে বাংলার নিজস্ব নাট্যধারার প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া গেল না, এর কারণ কী? এর কারণ. কী সেই বহুকথিত প্রবাদবাক্য যে রবীন্দ্রনাথের নাটক কেবল আইডিয়ার বাহনমাত্র? এতে নাট্যগুণ নেই। কিংবা যে নাটক পাবলিক স্টেজে পর্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল, সেই *'রাজা ও রাণী'* সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যখন বলেন যে 'এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্রাবল্য, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি'।[৪] এবং এই বক্তব্যই তাঁর অধিকাংশ নাটক সম্পর্কে প্রযোজ্য? কিংবা রবীন্দ্রজীবনকালে তাঁর প্রতিটি নাটকের সফলতম মঞ্চপ্রয়োগের যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক[৫] থেকে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যপ্রবাহে সার্থকতম রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনার ঐতিহ্য নির্মাণ সত্ত্বেও রবীন্দ্র সাহিত্য গবেষক প্রমথনাথ বিশীর ভবিষ্যদ্বাণী 'দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচির যতই উন্নতি হোক রবীন্দ্রনাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না।'[৬]—মন্তব্যই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠবে।

এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বিষয়ে শিশিরকুমারের মন্তব্যটি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিশিরকুমার লিখছেন :

'বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রারম্ভ হতে যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানাদিক থেকে।'

এ পর্যন্ত শিশিরকুমার যা বলেছেন, তা তাঁর অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন বাস্তবতাও বটে; তবে এর পরেই নাট্যকার ও প্রয়োগশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি একটি অভিযোগ করেছেন, যে অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে শিশিরকুমারও নিশ্চিত ছিলেন না এবং উত্তরকালও এ অভিযোগের কোনো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেনি। শিশিরকুমার অভিযোগ করছেন :

'সে অপূর্ব প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত আপনার আলোকে উজ্জ্বল করে বিশ্বসাহিত্যের সভায় বাংলা সাহিত্যের হয়ে সমান আসন দাবী কবা সম্ভব করে তুললো, সেই নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ নাটকে তাঁর শক্তির এবং প্রাচুর্যের অতি অল্প অংশই ব্যয় করলেন। যেভাবে শেক্সপীয়ার, ইবসেন বা হাউপ্টম্যান তাঁদের জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সবল করে তুলবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠতো তা হলে আজকে বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চ সুসম্পন্নপ্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো।'[৮]

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও তার নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, সে অবদান সম্পর্কে শিশিরকুমারের অভিযোগ যে যথার্থ নয়, এ কথা আজ বাংলা থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র নাট্যচর্চা ও ভাবনা সম্পর্কে অবহিত সামান্যতম কৌতূহলী পাঠকও স্বীকার করবেন। শিশিরকুমারের এ অভিযোগের মধ্যে আক্ষেপ আছে, তথ্য ও যুক্তির সমর্থন তত নেই।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় যখন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার নামাঙ্কিত হয়ে যাত্রা শুরু করে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র এগারো এবং ১৮৭৭-এ তিনি যখন '*এমন কর্ম আর করব না*'য় অলীকবাবু-র ভূমিকায় প্রথম তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন, তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে '*সতী কি কলঙ্কিনী?*', '*আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ*' (বেঙ্গল থিয়েটার), '*আদর্শ সতী*', '*চোরের উপর বাটপাড়ি*', '*প্রণয়কানন*', '*বিদ্যাসুন্দর ও কুব্জ*' প্রভৃতির পাশাপাশি '*সরোজিনী ও চিতোর আক্রমণ নাটক*', '*কৃষ্ণকুমারী নাটক*' (গ্রেট ন্যাশনাল), '*মেঘনাদ বধ*' (ন্যাশনাল থিয়েটার) ইত্যাদির অভিনয়

চলছিল। ১৮৮১তে প্রথম যখন তাঁর *'বাল্মীকি প্রতিভা'* বিদ্বজ্জনসভায় মঞ্চস্থ হচ্ছে, তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হচ্ছে *'হামির'*, *'রাসলীলা'*, *'তিলতর্পণ'*, *'শিবের বিবাহ'*, *'কুঞ্জ'*, *'পলাশীর যুদ্ধ'* প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক এবং ধর্মপ্রাণ দর্শকরুচির উপযোগী অতিশায়িত ভাবাবেগের নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন।

সাধারণ রঙ্গালয়ের এইসব নাটক ও তার প্রযোজনা-রীতি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে খুব একটা উৎসাহিত করেনি, যদিচ সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধের প্রেরণা এবং এই প্রেরণাসূত্রেই সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচালক ও নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক থিয়েটারের পরিচালক ও শিল্পীদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। *'রবিজীবনী'* সূত্রে জানা যাচ্ছে ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত *'সধবার একাদশী'* ও *'নবীন তপস্বিনী'* দেখতে যান রবীন্দ্রনাথ, কিংবা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'*-এর জন্য (গ্রেট ন্যাশনালে ১৫ জানু শনিবার ১৮৭৬ প্রথম অভিনীত) দেশাত্মবোধক গান 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' রচনা কবে দেন তিনি এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সঙ্গে তাঁদের ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ও করেছেন বলে শোনা যায়।[১০]

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষানবিশি পর্বে যেমন সময় দিয়েছেন, তেমনই তাঁর নাট্যজীবনের সূচনাপর্ব থেকে (১৮৮৬-র ৩রা জুলাই গ্রেট ন্যাশনালে কেদার চৌধুরী নাট্যরূপায়িত *'বৌঠাকুরানী'* উপন্যাসের নাট্যরূপ *'রাজা বসন্ত রায়'* কিংবা ১৮৯০-এর ৭ই জুন এমারেল্ডে অভিনীত হয় *'রাজা ও রাণী'*) পরিণত কাল পর্যন্ত তাঁর একাধিক নাটক ও উপন্যাস-গল্পের নাট্যরূপের প্রযোজনায় নিরন্তর আগ্রহী ছিলেন। অপরদিকে, একটি তথ্যে দেখা যায়, একমাত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাড়া সে যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের সব বিশিষ্ট ও শক্তিমান পরিচালক, নটনটীরাই তাঁর নাটকে অভিনয় করেছেন।[১১] অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী ও নরেশ মিত্র রবীন্দ্রনাথকে বাংলা রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় করার জন্য একাধিকবার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও জাতির দুর্ভাগ্য কোনো উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি, যদিচ কোনো প্রযোজনাকেই প্রয়োগশিল্পের বিচারে ব্যর্থ বলা যায়নি। এই যখন তথ্য, তখন রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেওয়া যায় না ; তিনি আসলে সাধারণ রঙ্গালয়ের থেকে তাঁর নাট্যভাবনাকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পরিচালিত করেছিলেন তাঁর শিল্পভাবনা ও জীবনজিজ্ঞাসার কারণে।

আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয় ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের থেকে এবং ভেতর থেকে বেশি পরিমাণেই জানতেন এবং নাট্যকার ও কবি রবীন্দ্রনাথকেও যে তিনি খুব দূর থেকে জানতেন, তা নয় ; এবং তাঁর এই উভয় জানাকে তিনি মেলাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মেলেনি। রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেছেন, তাঁর

নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় করার জন্য একাধিকবার পুনর্লিখন, বর্জন, সংযোজন সবই। তা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই টিকে থেকেছে, আর রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাগুণে সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরাল এক অ-সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

শিশিরকুমার পুরোপুরি থিয়েটারের লোক, সেই থিয়েটারের আবির্ভাব, বিকাশ ও তার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেছেন ; রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন তার থেকে খুব পৃথক নয়, তবে তিনি এই থিয়েটারের লোক নন বলেই হয়তো তাঁর মূল্যায়ন কিছুটা নির্মম। শিশিরকুমার লিখেছেন :

'আমার দেশের যাত্রা ছিল আমাদের দেশের মাটীর জিনিষ। দেশের লোকের প্রাণের সাড়া পেয়েছিল এবং দেশের লোকের প্রাণে নাড়া দিয়েছিল যাত্রার গীতাভিনয়। ঠিক যেভাবে যাত্রা আমাদের দেশের মাটীতে শিকড় নিয়েছিল, আমাদের অভিনব থিয়েটার, যার বয়স তখনও সত্তর পার হয়নি, ঠিক সেইভাবে দেশের লোকের প্রাণের সঙ্গে, দেশের মাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে কিনা সেটা ভেবে দেখবার জিনিষ।'[১২]

অনত্র লিখছেন :

'যাত্রার লোকপ্রিয়তা ছিল, প্রশংসনীয় পালার নাম হতো, ভালো গাইয়ে বাজিয়ের নাম হতো কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি হতো না। সুধী সমাজে যাত্রার দলের লোক তা সে যত বড় শিল্পী হোক না কেন আদৃত হতো না। .. তারপর এলো থিয়েটার। ১৮৭২ সাল থেকে থিয়েটারের আরম্ভ হলো। থিয়েটারে আমরা আসর তুলে দিলাম। নটদের তুলে নিলাম মঞ্চের উপরে। সচরাচর অক্ষম চিত্রকরের আঁকা দৃশ্যপটের অগ্রভাবে দাঁড়িয়ে পাত্রপাত্রী অভিনয় শুরু করে দিলেন। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বেই দেখি ধনশালী ও কৃতবিদ্য লোকেরা যেন দেশে বিলাতী ধরণের থিয়েটার না থাকাটা খুব লজ্জার বিষয় এই মনে করে অর্থব্যয় করে দল জুটিয়ে দেশের এই অগৌরব মোচন করতে লেগে গেলেন।'[১৩]

আর এক স্থলে লিখেছেন :

'এই যে নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে তা জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। দেশে ভাবের বন্যা এনেছে নিঃসন্দেহে। বহুকালব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাট্যশালার দায় কম নয়। কিন্তু ঐ নাট্যশালা আজও সমাজের অঙ্গ বলে স্বীকৃত নয়।'[১৪]

বাংলা থিয়েটারের উৎপত্তি ও বিকাশের ওপর শিশিরকুমারের এই পর্যবেক্ষণে যে বেদনা ও আক্ষেপ জড়িয়ে আছে, সেই বেদনা ও আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন অধিকতর উন্নত ও পরিব্যাপ্ত বলে তিনি একটি সমান্তরাল থিয়েটার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যে থিয়েটার বাংলার জাতীয় থিয়েটারের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করতে পেরেছে বলে একালের নাট্যবিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

'বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহাতে বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দু সন্তানের মতো কাজ হয়।'[১৫]

'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় (পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ইং ১৯০২) উপরের মন্তব্য করার পর ২৫ বছর বাদে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *'নাচঘর'* পত্রিকায় পেশাদারি রঙ্গালয়ের বিপরীতে তাঁর নিজের কথা লিখেছিলেন এই ভাবে :

'যেভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠোতে পারবে না।'[১৬]

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে *'ভারতী'* পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত *'অন্তর বাহির'* প্রবন্ধে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যরীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর বিরূপতা প্রকাশ করছেন এই বলে :

'রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা যে কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাঁহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়।'[১৭]

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপতা নিয়ে সেকালে যথেষ্ট আলোচনা হত। এই প্রসঙ্গে মণি বাগচি তাঁর *'পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের নাটক'*[১৮] শীর্ষক প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিখছেন :

'বছরটা আমার ঠিক স্মরণে নেই, নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ[১৯] একবার 'রক্তকরবী' অভিনয় করলেন। কবি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। একেবারে সামনের দিকে একখানা গদি আঁটা চেয়ারে কবি বসেছিলেন।... অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।... অভিনয়ের পর কবিকে-আমি একটা প্রশ্ন করলাম প্রবোধবাবুর অনুরোধেই। 'পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতি আপনার সহানুভূতি নেই, সহযোগিতা নেই, এই অভিযোগ অনেকদিনের। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ভিন্ন জাতির উন্নতি হতে পারে না, একথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন।'

কবি সেদিন ভালো 'মুডে'ই ছিলেন। স্বল্প কথায় সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্মটা এই ছিল :

'আমি যে পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছি, সে পরিবেশের সঙ্গে পেশাদার থিয়েটারের একটা বড় রকমের অমিল দেখতে পাই। শিশিরকুমার আমার সঙ্গে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন সাধারণ মঞ্চে, আমি সম্মত হতে পারিনি এই কারণেই। সহানুভূতি বা সহযোগিতার প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা অমর দত্তর যুগ থেকেই আমার নাটক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে, সে অভিনয় দেখতে আমি এসেছি, একালের থিয়েটারেও আমি একাধিক নাটকের অভিনয় দেখেছি, বিশেষ করে শিশিরের অভিনয়। তোমরা যে ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা বলো, তার মধ্যে একটা যুগের প্রেরণা ছিল, গিরিশচন্দ্র ছিলেন তারই প্রতীক। তবুও আমি এর থেকে দূরে ছিলাম, কাছে আসতে পারিনি।'

এরপর গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করায় স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ মণি বাগচিকে জানিয়েছিলেন :

'দ্যাখো, গিরিশচন্দ্র যে একজন জিনিয়াস, এবং তিনিই যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, এই প্রচলিত মতবাদ সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা অভিমত আছে, যেটা আমি প্রকাশ্যে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করেছি পাছে কারো মনে আঘাত লাগে। তিনি একটা বিশেষ চিন্তাধারার পরিবেশন করেছেন যার সঙ্গে আমার চিন্তাধারার কোন মিল দেখতে পাই না। পেশাদার মঞ্চের তিনি নাট্যগুরু এবং তাঁর এই গৌরব লাঘব না করে আমি শুধু এইটুকু স্বীকার করব যে, এদেশে থিয়েটার বস্তুটিকে বাঙালির চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে তাঁর প্রতিভা সার্থক হয়েছে।'

সাধারণ রঙ্গালয়, তার নাটক, প্রযোজনা-বৈশিষ্ট্য ও তার প্রতি তদানীন্তন জনসমর্থন রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল খুব স্পর্শকাতর বিষয়। তাঁর নাট্যভাবনায় তাঁর কবিসত্তাই নিয়ন্ত্রক। তা সত্ত্বেও দেশি ও বিদেশি থিয়েটারের ধ্রুপদী ও সমকালীন রীতিনীতিকে অঙ্গীকার করেই তিনি তাঁর নিজস্ব একটা থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন যে থিয়েটারে দেশীয় লোকনাট্য যাত্রা এবং এলিজাবেথীয় থিয়েটার হাত ধরাধরি করে নিজস্ব জাতীয় ভাব ভাষা সংস্কৃতিতে মূর্ত হতে চেয়েছিল। (নাট্যকার ও প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরাল যে থিয়েটারের প্রবর্তন চেয়েছিলেন সে-থিয়েটারও একটি আন্তর্জাতিক ভাবনা।) বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকেই সাধারণ পেশাদারি রঙ্গালয়ের সমান্তরাল লিটল থিয়েটার প্রবর্তন হয়েছিল, আমাদের দেশে তার প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি লিখলেন :

'সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকের মুখ চেয়ে যেমন চলবে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যে সব নাটক নির্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে-সব

উঁচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে।

এমন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হলে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।'[২০]

এই কারণে খুব সঠিকভাবেই *'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার'*-এর গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন :

'গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমরেন্দ্র থেকে শুরু করে অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমার অহীন্দ্র চৌধুরী পর্যন্ত বিস্তৃত পেশাদারি থিয়েটারের সমান্তরালে নাট্যপ্রযোজনার 'অক্লান্ত কর্মী' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল বাঙালীর যথার্থ নাট্য আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারই আমাদের প্যারালাল থিয়েটার।'[২১]

এ দেশে এই প্যারালাল থিয়েটার বা স্বতন্ত্র ধারার মঞ্চভাষার প্রথম সার্থক প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। যেমন আইরিশ থিয়েটারে ডবলু বি ইয়েটস, ফরাসি থিয়েটারে পিপলস থিয়েটারের প্রবক্তা রোমা রোঁলা, জার্মান থিয়েটারে বার্টোল্ট ব্রেশট, আমাদের বাংলা থিয়েটারে তেমনই রবীন্দ্রনাথ। শিশিরকুমার যে আবেগে জার্মান থিয়েটারে গার্টুড হাউপ্টম্যান বা নরওয়েজিয়ান থিয়েটারে ইবসেনের ভূমিকার কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই ধারণায় বাংলার পাবলিক থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করা। হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) ছিলেন নরওয়ের থিয়েটারের সমালোচনামূলক বস্তুবাদী ধারার প্রবর্তক, যে ধারার নাট্যসৃষ্টির জন্য উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ইবসেনীয় নাট্যাদর্শ প্রচলিত হয়ে গেল। কবি ইবসেন নরওয়েজীয় জাতীয় রোমান্টিক ধারার নাট্যরচনা শুরু করে সমকালীন সমাজ সমালোচনামূলক বস্তুবাদী ধারার প্রবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক রচনার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন। মানুষ ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্রে রেখে মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ইবসেনের *'পিলারস অব দি সোসাইটি'*, *'ডলস্ হাউস'*, *'গোস্ট'*, *'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল'*, *'রোজমারসম'* তাঁর নাট্যবিশ্লেষণ ও রচনারীতির জন্য সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছিল। বাংলা থিয়েটারে ইবসেনের অভাব লক্ষ করেছিলেন শিশিরকুমার, সে তার মঞ্চভাষার প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষতার কারণে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ একই বার্তা বহন করেছেন সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানুষের জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাঁর নাট্যের মঞ্চভাষা বস্তুবাদী ছিল না, তা ছিল কাব্যনাট্যের ভাষায় প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়। ফলে রবীন্দ্রনাথ কেন ইবসেনের মতো প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষতাসহ এলেন না থিয়েটারে, এ আক্ষেপ টেঁকে না। ঠিক তেমনই জার্মান থিয়েটারে গার্টুড হাউপ্টম্যান (১৮৬২-১৯৪৬) মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে শাণিত প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে যে থিয়েটার গড়েছিলেন, তার মঞ্চভাষা ছিল বস্তুবাদী ইবসেনের থেকেও প্রাত্যহিকতার অনুপুঙ্খতায় আরও নগ্ন। তাঁর নাটকে

অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নায়ক আর একক নায়ক থাকেনি, যৌথ নায়কে রূপান্তরিত হয়েছিল, সমাজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য। উত্তরকালের বিপ্লবী নাট্যকার ব্রেশটের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল হাউপ্টম্যানের মধ্যে। এই বস্তুবাদকে বাংলা মঞ্চে আনবার স্বপ্ন দেখেছিলেন শিশিরকুমার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর সমগ্র জীবনসাধনায় প্রকৃতিবাদের কাছেও ঘেঁষেননি; যদিচ বিপ্লবের পদধ্বনি তিনি যথাকালেই শুনিয়েছেন *'কালের যাত্রা'*, *'রথের রশি'*র মধ্যে হাউপ্টম্যানের সমকালেই।

২

সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারার সমান্তরালভাবে রবীন্দ্রনাথ তবে কোন ধারণায় বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, সে ধারণা কি দেশীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক রসবোধের বাইরের কোনো ধারা, না কি একান্ত অন্তর্গত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববোধের সমীপস্থ কোনো নান্দনিক পালারূপ যার রূপ খুঁজে ফিরেছেন চিত্রপট থেকে চিত্তপটে।

কবি, তারপর তিনি নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী। তাই তাঁর সমগ্র কবিজীবনের সমান্তরাল যে নাট্যশিল্পীর জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন, তার পরতে পরতে তিনি তাঁর এই নাট্যবোধকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, আমরা তারই অনুসরণে চেষ্টা করি তাঁর নাট্যবোধ ও মঞ্চভাষাকে বুঝে নিতে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' তাঁর দ্বিতীয় নাট্যরচনা। ১৮৮৪-তে প্রকাশিত। এটি তাঁর জীবনকালে অভিনীত হয়নি। এই নাট্যকাব্য প্রসঙ্গে *'জীবনস্মৃতি'*-তে কবি নাট্যকার লিখছেন 'আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'

'এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া প্রকাণ্ড বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে।' কবি বর্ণিত প্রকৃতির প্রতিশোধের এই বিষয়বস্তুই যেন সমগ্র রবীন্দ্রভাবনার নির্যাস। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের পার্থিব ভাবনার দ্বন্দ্বের এক সমীভবন ঘটে যায় তরুণ রবীন্দ্রমননে।

সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত এই পালার মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথকে যেমন খুঁজে পান, তেমনই কবি রবীন্দ্রনাথ যে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ভবিতব্য নির্ধারণ করে দেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বাংলা নাট্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনদর্শন সংযুক্ত করলেন তা মূলত বস্তুবাদী মানবিকতা এবং মঞ্চভাষা নিঃসন্দেহে কাব্যরূপময় রোমান্টিকতা।

৩

'বাল্মীকি প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যরচনা। ১৮৮১-র ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অন্যধারার থিয়েটারের প্রবর্তন করলেন। এই গীতিনাট্য রচনায় সাঙ্গীতিক রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার ও অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের ওপর নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং সর্বোপরি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থিয়েটার ও তার সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ করে দেশীয় থিয়েটারের একটি আদর্শ মঞ্চভাষা যেন তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন। এডওয়ার্ড টম্পসন বলেছিলেন, 'দ্য টিউনস্ অব দ্য জিনিয়াস অব বাল্মীকি আর হাফ ইণ্ডিয়ান, হাফ ইউরোপীয়ান, ইনস্পায়ার্ড বাই মুর'স আইরিস মেলডিজ্'। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছিলেন 'দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল'। এবং আমরা বলব এই *'বাল্মীকি প্রতিভা'*-র সূত্রেই বাংলা থিয়েটারে প্রথম পালাবদল হল। প্রথম অভিনয় ও তার পরবর্তীতে বহু অভিনয়ধন্য এই গীতিনাট্যের প্রয়োগ-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদকে কাটাতে পারেননি। বাংলা মঞ্চেও তখন এই বাস্তবধর্মিতা ছিল প্রবল। মঞ্চের সাজসজ্জা ও শিল্পীদের রূপসজ্জায় হরিশচন্দ্র হালদার, অবনীন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ তাঁদের কল্পনা অনুযায়ী রূপারোপ করেছেন, বাল্মীকিবেশী রবীন্দ্রনাথের যে ছবিখানি আজ সর্বাধিক নন্দিত, তাতে বাল্মীকির পিঠের দিকে 'বিলিতি রাজরাজড়াদের ম্যান্টল্-এর আদলে'[২২] কেন জোব্বা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বা দস্যুদলকে কেন কাবুলবাসীর পোশাকে সজ্জিত করা হয়েছিল—তার কারণ তো একটাই যে দৃষ্টিনন্দন করা। 'দর্শকরা কবির সেই বাল্মীকির বেশ দেখে চিত্রার্পিতের মত নির্নিমেষনেত্র'।[২৩] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আর একটি তথ্য জানা যায় যে 'রাঙাপদ পদ্মযুগে' গানখানির বাগেশ্রী রাগিণীর সুরে মুগ্ধ দর্শকরা নেপথ্যগমনোদ্যত বাল্মীকিকে 'এনকোর এনকোর' ধ্বনি দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে এনে 'গানের পূর্ববৎ আমূল পুনরাবৃত্তি' করিয়েছিলেন। তদানীন্তন বাংলা মঞ্চের 'এনকোর' প্রথার কাছে রবীন্দ্রনাথকে এভাবেই তখন হার মানতে হয়েছিল। পরবর্তীতে এম্পায়ার থিয়েটারে *'বিসর্জন'* অভিনয়কালে (২৫, ২৭ ও ২৮ অগাস্ট ১৯২৩) ৬২ বছরের রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহরূপে মঞ্চাবতরণকালে দর্শকরা যাতে উৎসাহিত হয়ে হাততালি দিয়ে নাটকের রসভঙ্গ না করে, তার জন্য আগে থেকেই গ্যালারিতে ঘুরে ঘুরে দর্শকদের সতর্ক করা হত।[২৪] এই হল সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন।

১৮৮১ থেকে ১৯৪০ দীর্ঘ ছয় দশক ধরে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ছিল রেপার্টরি থিয়েটার। কলকাতার জোড়াসাঁকো, স্টার থিয়েটার, কাশিয়াবাগান, বির্জিতলা বিজনি রাজবাড়ি, পার্ক স্ট্রিট, সংগীত সমাজ, জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা, আলফ্রেড থিয়েটার, ম্যাডান থিয়েটার, এম্পায়ার থিয়েটার, নিউ এম্পায়ার, আশুতোষ কলেজ হল, শ্রীরঙ্গমঞ্চ, ছায়া সিনেমা ; তারপর শান্তিনিকেতনের নাট্যঘর (এটি কী কবির সেই লিটল্ থিয়েটার মঞ্চের আদলে গড়া)—এখানে যে কত অভিনয়ই হয়েছে ; এরপর পূর্ববঙ্গের

শ্রীহট্ট (সারদা মেমোরিয়াল হল), চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা ; পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ; বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বোম্বাই (একসেলসিয়ার থিয়েটার), মাদ্রাজ ; ওয়ালটেয়ার, পাটনা (এনফিনস্টোন পিকচার প্যালেস), এলাহাবাদ (রিজেন্ট), লাহোর (প্লাজা), দিল্লি (রিগ্যাল থিয়েটার), মিরাট, লখনৌ (উত্তরপ্রদেশ কৃষি প্রদর্শনী), শিলং (অপেরা হল) ; এবং ভারতের বাইরে সিংহল পর্যন্ত[২৫] রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার তাঁর গীতিনাট্য, নাটক, প্রহসন ও নৃত্যনাট্যের প্রযোজনাবৈভব নিয়ে 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ' থেকে মুক্ত হয়ে 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, যে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই' সেই রঙ্গমঞ্চের সন্ধান করে গেছে দীর্ঘ ষাট বছর ধরে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও তাঁর থিয়েটার *'বাল্মীকি প্রতিভা'* (১৮৮১) থেকে *'শ্যামা'* (১৯৩৯) পর্যন্ত রচনা ও প্রযোজনাকর্মের মধ্য দিয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান করে গেছে সে অনুসন্ধান হল 'আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।'[২৬] *'রক্তকরবী'* নাটক প্রসঙ্গে কবি এই চিরকালের সত্যটিকে অভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মুখবন্ধে। 'আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তাহলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটা মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।... নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছেন যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।'[২৭]

এই সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই দেশি বিদেশি, জাতীয় আন্তর্জাতিক, লোকনাট্য ধ্রুপদী নাট্য—সব ধারার থিয়েটারের অন্তর্গত রূপটিকে তিনি আত্মস্থ করে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর থিয়েটারের রূপটিকে :

'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।'

১৩০৯ বঙ্গাব্দ (১৯০২)-এর এই *'রঙ্গমঞ্চ'* ভাবনা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শান্তিনিকেতনে প্রথম মঞ্চস্থ *'ফাল্গুনী'* নাটকের মঞ্চভাষায় রূপ না পেলেও পরবর্তীকালে কলকাতায় বাঁকুড়ার বন্যার্তদের সাহায্য রজনীতে অভিনয়কালে (৩০শে জানুয়ারি, ১৯১৬)-এর মঞ্চভাষায় ঐ রঙ্গমঞ্চ ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছিল।[২৮] এবং নাটকের সূচনা অংশ, যা কলকাতার অভিনয় উপলক্ষে লেখা হয়, তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাজা ও কবিশেখরের সংলাপের মধ্যে গেঁথে দিলেন—

'চিত্রপট—

'চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

'ঐ নাটকে গান আছে নাকি?

'হ্যাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'[২৯]

এই *'ফাল্গুনী'*র মঞ্চসজ্জাতেও অবশ্য রবীন্দ্র নাট্যভাবনাকে মঞ্চশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারেননি। 'আগেকার কালের সেই বিসদৃশ্য বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন.. তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুল এবং তার উপর একটি মাত্র ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।'[৩০] মঞ্চশিল্পী যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন, তবে তাঁর এই মঞ্চসজ্জার পেছনে জাপানি চিত্রকলার প্রত্যক্ষ প্রভাব বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংযত থাকতে পারেননি মঞ্চসজ্জাকর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন :

'নদী আপন বেগের সময় মঞ্চের একদিকে সঞ্জীব আর একদিকে নিখিল দাঁড়িয়ে একটা নীল কাপড়কে ঢেউ খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে।'[৩১]

আসলে সমাজসত্য তথা ভাবসত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্র নাট্যভাবনা একটি সুরের সন্ধান করেছে—যে সুরটিকে চক্ষু কর্ণ হৃদয় দিয়ে অনুভববেদ্য করতে গেলে তার দৃশ্যরূপের আয়োজন করতেই হয়—এবং সেই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যকাব্যের মঞ্চভাষা অভিনয়, সঙ্গীত, আলো অন্ধকার রঙ সব কিছুরই সুসমঞ্জস যোগবিয়োগে গড়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ধ্বংসের তাণ্ডবে সভ্যতার অন্তর্গত দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে মানুষের প্রতিবাদী অন্তররূপটি ধরা পড়েছিল সে যুগের সব দেশের কবি লেখক নাট্যকার প্রয়োগশিল্পীদের সৃষ্টিতে। রোমান্টিসিজ্‌ম ন্যাচারালিজ্‌ম রিয়্যালিজ্‌ম সোস্যালিজ্‌মের সমকালেই এসেছিল এক্সপ্রেসনিজ্‌ম, কিউবিজম। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারে রোমান্টিসিজমের সূত্র ধরে রিয়ালিজ্‌ম, সোস্যালিজ্‌ম ও এক্সপ্রেশনিজ্‌ম এক সঙ্গেই এসেছিল। ৬২ বছরের জয়সিংহরূপী রবীন্দ্রনাথের যে আলোকচিত্রটি আজ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, তার মঞ্চসজ্জায় সোস্যালিস্টিক ভাবনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয়েছে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব। *'রক্তকরবী'* নাট্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে গগনেন্দ্রনাথ যে মঞ্চভাবনার আভাস দেন, তাতে কিউবিস্ট চিত্রকলার প্রত্যক্ষ প্রেরণা অনুভূত হয়। এবং ১৯৫৪-য় শম্ভু মিত্রের সৃজনশীল শিল্পসৃষ্টিতে যে *'রক্তকরবী'* বাংলার অন্যধারার থিয়েটারের প্রতীক হয়ে ওঠে, তাতে মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী স্তরবিন্যস্ত যে বহুমাত্রিক মঞ্চসজ্জা রচনা করেন, তাতে *'বিসর্জন'*-এর ঐ অবিস্মরণীয় ছবি ও *'রক্তকরবী'* মলাটের প্রেরণাকে অস্বীকার করা যায় না, যদিচ নাট্যগ্রন্থনার মধ্যেই যমপুরীর সমাজের

বিভিন্ন স্তরবিন্যস্ত মানবশ্রেণীর দ্বন্দ্বকেই মঞ্চশিল্পী স্থাপত্যধর্মী বিন্যাসে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এই একটি নাটক রবীন্দ্রনাথের, যেখানে লিরিক ও ড্রামাটিকের দ্বন্দ্বে তার অন্য নাটকের মতো নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হতে বাধা পায়নি।

সামাজিক শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, নারীর মুক্তি, বিপ্লবের বার্তা ইত্যাদি প্রশ্নকে এক অসাধারণ মঞ্চভাষায় *'রক্তকরবী'*র প্রতীকে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার সৃষ্টি করে গেছে—এই একটি নাটকেই কবি আমাদের বাংলা থিয়েটারকে বিশ্বনাট্যের দরবারে উন্নীত করে গেছেন, এরপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনাট্যকে ইউরোপ বুঝতে না পারলেও বাংলা বা ভারতের থিয়েটারের কোনো ক্ষতি নেই।

এখন বাংলা থিয়েটারের দুটি ধারা। একটি সাধারণ রঙ্গালয়ের বাণিজ্যিক প্রমোদ-উপকরণের ধারা, অন্যটি ৪০-এর দশকের গণনাট্য প্রবর্তিত ও আদর্শায়িত আজকের গ্রুপ থিয়েটারের ধারা। ৪০-এর দশক থেকেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিবাদী বাংলা নাট্যের মূলস্রোত সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে প্যারালাল থিয়েটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ১৯৪৭ থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটক আর বাংলা নাট্যের মূলস্রোতরূপে বিবেচিত হতে পারেনি, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণেই গণনাট্য প্রবর্তিত ধারাই আজ বাংলা নাট্যসৃষ্টির মূলধারা এবং সেই ধারায় রবীন্দ্র নাট্যভাবনা একটি বিশিষ্টতম প্রেরণা ও প্রবাহ। তাঁর *'বিসর্জন'*, *'মালিনী'*, *'অচলায়তন'*, *'মুক্তধারা'*, *'রক্তকরবী'*, *'কালের যাত্রা'*, *'মুক্তির উপায়'*, *'তপতী'*, *'চণ্ডালিকা'*, *'তাসের দেশ'* প্রভৃতি নাটক ও *'শাস্তি'*, *'দেনাপাওনা'*, *'বদনাম'*, *'তোতাকাহিনী'* প্রভৃতি গল্পের নাট্যরূপ পাঁচের দশক থেকে প্রায়শ অভিনীত হয়ে চলেছে। সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করেছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা নির্দেশকরা কতখানি আত্মস্থ করতে পেরেছে তার উপর। রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার বহু সমস্যা—তার মধ্যে সব চেয়ে বড় হল রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর থিয়েটারকে বুঝতে না পারার সমস্যা। তারপর হল নাটকবিশেষে তার ভাব-ভাষা, গঠনবৈশিষ্ট্য, সংলাপ, সংলাপের ছন্দবিভাজন, উচ্চারণ, স্বরপ্রক্ষেপণ, চরিত্র বিশ্লেষণ, অভিনয়-বাচিক ও কায়িক, অঙ্গসঞ্চালন, কম্পোজিশান, কোরিয়োগ্রাফ, মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা, আবহ-সংগীত, গীত, আলোকসম্পাত—সব মিলিয়ে আজকের থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতায় সেই নাট্য নির্বাচন দলের সার্বিক সামর্থ্যের অন্তর্গত কিনা—এ সবই সমস্যা। এ ক্ষেত্রে নিয়ত অনুশীলন ও সমকক্ষতা অর্জনের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সৃজনশীল কল্পনা দ্বারাই আজকের গ্রুপ থিয়েটার রবীন্দ্র নাট্যভাবনাকে মঞ্চস্থ করতে পারবে, কারণ রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারই তো আজকের অন্যধারার থিয়েটারের পথপ্রদর্শক।

পাদটীকা :

১। *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার,* বিষ্ণু বসু, এপ্রিল ১৯৮৭, প্রতিভাস।

২। ১৮৭৭-এ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে *'এমন কর্ম আর করব না'*য় অলীকবাবুর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চাবতরণ এবং তখন থেকে তেষট্টি বছরের মাথায় ১৯৪০-এ *'শ্যামা'* মঞ্চস্থ হওয়ার কালেও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁকে মঞ্চে আসীন দেখতে পাওয়া যায়।

৩। Edward Thompson, Rabindranath Tagore - Poet and Dramatist.

৪। ১৯৪০-এর ২৮শে জানুয়ারি শান্তিনিকেতন বাসকালে *'রাজা ও রাণী'*র নতুন সংস্করণ প্রকাশের সূচনায় কবির মন্তব্য। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খণ্ড) পৃঃ ৮৭, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৪ সংস্করণ।

৫। ১৯৫৪-য় বহুরূপী প্রযোজিত *'রক্তকরবী'* রবীন্দ্রনাথকে সমকালীন অন্যধারার থিয়েটারের বৈপ্লবিক প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৬। *রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ*, প্রমথনাথ বিশী।

৭। *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ*, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, পৃঃ ৩০।

৮। ঐ।

৯। *রবিজীবনী*, প্রশান্তকুমার পাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

১০। *রবীন্দ্রকথা*, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১১। *মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়*, ভারতী পরিষদ বার্ষিকী, পৃঃ ৯৫।

১২। *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ*, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, পৃঃ ৩০।

১৩। *নাট্যশালা প্রসঙ্গে*, ঐ, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, পৃঃ ৫০।

১৪। ঐ।

১৫। *রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬। ঐ, *লিটল থিয়েটারের ভাবনা, নাচঘর*, ৩রা জুন, ১৯২৭।

১৭। ঐ, *অন্তর বাহির, পথের সঞ্চয়*।

১৮। *পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের নাটক*, মণি বাগচি, *গন্ধর্ব*, রবীন্দ্র নাট্য সংখ্যা, ১৯৬১, পৃঃ ৮২।

১৯। আশ্রমিক সংঘ নয়, টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ নাট্যনিকেতন মঞ্চে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে *'রক্তকরবী'* মঞ্চস্থ করেছিলেন ৬ এপ্রিল, ১৯৩৪। দ্রষ্টব্য *মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ*, রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় সারণি।

২০। *লিটল থিয়েটারের ভাবনা*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (*নাচঘর*, ৩রা জুন, ১৯২৭), *গন্ধর্ব* রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা ১৯৬১।

২১। *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*, বিষ্ণু বসু, পৃঃ ২৬।

২২। *রবীন্দ্রস্মৃতি*, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

২৩। *কবির কথা*, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪। *নিজের হারায়ে খুঁজি*, অহীন্দ্র চৌধুরী।

২৫। *মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ*, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ অভিনীত প্রযোজিত নাটকের সারণি।

২৬। *রক্তকরবী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা।

২৭। ঐ।

২৮। *অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ, মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ*, পবিত্র সরকার, পৃঃ ১৯।

২৯। *ফাল্গুনী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সূচনা।

৩০। *রবীন্দ্রস্মৃতি*, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ৩৭।

৩১। ঐ, পৃঃ ৩৮।

[*পশ্চিমবঙ্গ*, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪২ ও ৪৩, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৭, ১৯৯০, পৃঃ ১০৫৩-১০৫৯]

পর্বত-প্রমাণ ব্যর্থতার পাশে 'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার'-এর ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা

এক শতাব্দী বয়স হয়ে গেছে আমাদের রবীন্দ্র ঐতিহ্যের, অন্তত যখন থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টি আমাদের প্রাপ্তবুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। তখন থেকে বাংলার পাবলিক থিয়েটারের সমান্তরাল রবীন্দ্রনাথের লিটল থিয়েটারের ঐতিহ্যের বয়সও প্রায় সমান সমান। পাবলিক থিয়েটারের ১৮৭২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সময়ের সমান্তরাল হল রবীন্দ্রনাথের লিট্‌ল থিয়েটারের সময়কাল ১৮৮১ থেকে ১৯৪০। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সেই রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে স্বয়ং নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতার কৃতিত্ব (প্রসঙ্গত মিলিয়ে নিতে পারি শঙ্খ ঘোষের[১] সমীক্ষার্জিত উপলব্ধির সঙ্গে : 'বয়স্কদের অভিজ্ঞতা জেনে মনে হয় যেন দর্শকদের কাছে সমগ্র প্রযোজনা থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠতেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, আলগা হয়ে দাঁড়াত তাঁর ব্যক্তিত্ব') বাদে আমাদের ব্যর্থতা প্রায় পর্বত-প্রমাণ, এমত একটি প্রবাদ চালু আছে। যদিচ ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে এবং সেই অভিজ্ঞতাই প্রকৃত রবীন্দ্র থিয়েটার। রবীন্দ্র প্রবর্তিত লিটল থিয়েটারের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা চল্লিশের দশকে যখন গণনাট্যের ভাবাদর্শে গড়ে উঠল লিটল থিয়েটারের এক অপ্রতিহত সৃজনশীলতা, তখনই কিন্তু প্রকৃত রবীন্দ্র থিয়েটার নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যা পারেননি, তাঁর সেই সব বিশিষ্ট নাট্যরচনা যেমন *'রক্তকরবী'*, *'মালিনী'* এবং *'মালঞ্চ'*-র সার্থকতম মঞ্চপ্রয়োগ এই শতাব্দীর এই শেষ চার দশকেই সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে তাঁর বিশিষ্ট দুটি কাহিনী *'চার অধ্যায়'* উপন্যাস ও *'বদনাম'* ছোটগল্পের সফলতম নাট্যনির্মাণ এবং তাঁর পরিচালিত জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের থিয়েটারে পরিবেশিত *'রাজা'* ও *'ডাকঘর'* যা মাত্র তিন রজনী করে অভিনীত হয়েছে, সেই দুটি নাটকের শ্রেষ্ঠতম প্রযোজনা এই আমলের থিয়েটারে বিপুল জনসমাদর পেয়েছে। শান্তিনিকেতন থিয়েটার *'কালের যাত্রা'*-র অভিনয় করেছিল মাত্র একবার। এই *'কালের যাত্রা'* রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তির মাথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিম বাংলার বুকে যথার্থ মঞ্চভাষায় জনজাগরণে প্রভূত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তাঁর প্রথম যৌবনের শেকসপিয়রীয় ও গৈরিশ নাট্য প্রভাবিত *'বিসর্জন'* নাটকের সর্বমোট আটবার প্রয়োগ করেছিলেন সাতবার রূপান্তর করে, সেই *'বিসর্জন'* এই গণনাট্যের কাল থেকে একাল পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি নাট্যদল কর্তৃক অভিনীত হয়ে বরাবরই কাঙ্ক্ষিত জনসমাদর থেকে বঞ্চিত থেকেছে[২] কেবল দুটি প্রযোজনা ছাড়া যে দুটি প্রযোজনার একটি নেমেছিল শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়, অপরটি এই সেদিন '৯০ সালে ধর্মীয় রাজনীতিতে হিংস্র ভারতবর্ষের যূথ রাজনীতির দিকে তর্জনী সংকেত করে।

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারের এই ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার যে দৃষ্টান্ত ওপরে উল্লেখ করা গেল তার তথ্য প্রমাণ নীচের সারণিতে দেখানো রয়েছে :

১৯৫১	বিসর্জন	গণনাট্য সংঘ	উৎপল দত্ত
১৯৫১	চার অধ্যায়	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৭৮	চার অধ্যায় (পুনঃনির্মাণ)	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৫৩	অচলায়তন	লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ	উৎপল দত্ত
১৯৫৪	রক্তকরবী	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৭৫	রক্তকরবী (পুনঃনির্মাণ)	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৫৭	তপতী	লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ	উৎপল দত্ত
১৯৫৭	ডাকঘর	বহুরূপী	তৃপ্তি মিত্র
১৯৫৭	গোরা	শৌভনিক	বীরেশ মুখোপাধ্যায়
১৯৫৮	শাস্তি	গণনাট্য সংঘ	জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
১৯৬১	বিসর্জন	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৬২	কালের যাত্রা	রূপকার	সবিতাব্রত দত্ত
১৯৬৪	রাজা	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৭৬	বদনাম	গন্ধর্ব	দেবকুমার ভট্টাচার্য
১৯৭৮	রাজা (শেষ অভিনয়)	বহুরূপী	শম্ভু মিত্র
১৯৮৬	মালিনী	বহুরূপী	কুমার রায়
১৯৯০	বিসর্জন	থিয়েট্রন	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৯১	মালঞ্চ	অন্য থিয়েটার	বিভাস চক্রবর্তী

এই সারণির বাইরে আর একটি বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ সারণি রয়েছে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত '*মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ*' শীর্ষক সংকলনে। সেখানে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চাবতরণ (১৮৭৭) থেকে রবীন্দ্রকাল ও রবীন্দ্রোত্তর কাল (১৯৮৭) পর্যন্ত শতবর্ষের নাট্য প্রয়াসের বিভিন্ন অবস্থান। এই বিচিত্র প্রয়োগের নির্যাস আমাদের উপর্যুক্ত সারণি, ব্যতিক্রমী সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে। সঙ্গে কিছু সাহায্য নেওয়া হয়েছে সারণি বিশেষজ্ঞ প্রভাতকুমার দাসের কাজ ও স্বপন মজুমদার লিখিত '*বহুরূপী ১৯৪৮-১৯৮৮*' শীর্ষক তথা বিশ্লেষক গ্রন্থের। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার নির্মাণে আমাদের উক্ত ব্যতিক্রমী সাফল্যের দৃষ্টান্ত চয়নে, ১৯৪৩-১৯৯৩ এই পঞ্চাশ বছরের রবীন্দ্রনাট্য চর্চার বিভিন্ন অংশীদার ও অছি সম্প্রদায় ক্ষুণ্ণ হবেন যথেষ্ট। কিন্তু আমরা নাচার। বিভিন্ন স্মৃতিজড়িত আবেগ থেকে অনেক অংশীদারই দাবি করবেন 'আমরা যে '*বিসর্জন*' করেছিলাম তার উল্লেখ নেই, আমাদের '*বিসর্জনের*' কোনও তুলনা নেই।' কেউ বলবেন, 'দেখেছেন আমাদের '*মুক্তধারা*', বহুরূপীর '*মুক্তধারা*' তার ধারে কাছে আসে না।' কেউ বলবেন, বহুরূপীর প্রহসনের অনুল্লেখ থাকা অমার্জনীয় অপরাধ'। এইরকম উৎপল দত্ত নির্দেশিত '*বিসর্জন*'-এ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়সিংহের কথা, এল টি জি-র '*অচলায়তন*', '*তপতী*'র প্রসঙ্গ শৌভনিকের '*গোরা*'র কথা, ঋত্বিক ঘটক নাট্যরূপায়িত '*স্ত্রীর পত্র*', শেখর চট্টোপাধ্যায়ের '*নৌকাডুবি*', বনানী চৌধুরীর '*চোখের বালি*', জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত থিয়েটার সেন্টারের '*ক্ষুধিত

পাষাণ', বরুণ দাশগুপ্তর '*সে*', বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবনের '*দালিয়া*', '*দৃষ্টিদান*' ও '*ল্যাবরেটরি*'র প্রসঙ্গ কিংবা '*মালিনী*'তে মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের কথা তুলে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবকে উপেক্ষা করতেই পারেন। তাতে আমাদের সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তের আলো থেকে সরে যাওয়ার কিছু ঘটে না।

রবীন্দ্রনাট্যের পাঠবস্তু ও থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভাবনা-চিন্তা এবং প্রয়োগগত তাঁর সময়ের ভাবনা-চিন্তা এবং প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৃত্তান্ত অনুধাবন করে উপর্যুক্ত ব্যতিক্রমী সাফল্যের প্রযোজক ও পরিচালকবৃন্দ রবীন্দ্রনাট্যের যথার্থ প্রয়োগগত রূপটি কী হবে বা হতে পারে তার সার্থকতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩] আমাদের সংকলিত এই দৃষ্টান্তমালার এক প্রান্তে নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র, অপর প্রান্তে প্রয়োগশিল্পী বিভাস চক্রবর্তী।

১৯৫১-৫২-৫৩ সালে যখন শম্ভু মিত্রের নির্দেশিত বহুরূপীর '*চার অধ্যায়*' অভিনীত হত, শোনা যায় রাজনৈতিক বাতাবরণের তর্কবিতর্কের কারণে অনেক প্রদর্শনই তখন শূন্য প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়েছে[৪]। তেমনই এ আমলেও অন্য থিয়েটারের '*মালঞ্চ*' রবীন্দ্র থিয়েটারের যথার্থ মঞ্চরূপ লাভ করেও ২৫টির বেশি রজনী পার হতে পারেনি যথেষ্ট সংখ্যক দর্শক না পাওয়ার কারণে। অবশ্য এবারে দর্শক না হওয়ার কারণ কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, দর্শক মানসিকতার বদল ঘটে যাওয়াই বড় কারণ। এমত অবস্থায় ব্যতিক্রমী সাফল্যের জ্বলজ্যান্ত নজির হাতের মুঠোয় পেয়েও আমরা রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগকে আমাদের আজকের এই সমান্তরাল ধারার থিয়েটারে একটি মহার্ঘ পরম্পরারূপে বিবেচনা করতে পারলাম না।

শম্ভু মিত্রের তন্নিষ্ঠ সাধনায় যে রবীন্দ্রনাট্য, রবীন্দ্র সংলাপ এক জনবোধ্য মঞ্চভাষা পেল, তাঁর নির্দেশনায় যে বহুরূপী রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগের একটি ধারা তৈরি করল, সেই নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র এখনও আয়ুষ্মান, সেই বহুরূপী যখন এখনও সজীব, তবে, এখনই কেন সেই সব রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগ কিংবদন্তির স্তরে বিলীন হল ? এ প্রশ্নের পাশাপাশি শম্ভু মিত্র প্রদর্শিত পথে কিংবা তাঁর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে আরও যাঁরা সেই পঞ্চাশ ষাটের দশকে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল সবিতাব্রত দত্তের 'কালের যাত্রা' অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে কেন ? বহুরূপীর শিক্ষায় শিক্ষিত প্রয়োগবিদ্ কুমার রায়ও কেবল '*মালিনী*'র পরই রবীন্দ্রনাথ থেকে মুখ ফেরালেন কেন ? পরবর্তী প্রজন্মে দেবকুমার ভট্টাচার্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে গন্ধর্বর '*বদনাম*' গল্পটির যে মঞ্চরূপ দিয়েছিলেন তাতে যথাযথ রাবীন্দ্রিক হওয়ার কোনো প্রয়াস ছিল না বলেই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র শ্লেষ-টি অক্ষত অবস্থায় একালের দর্শক দ্বারা নন্দিত হয়েছিল। আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই '*বিসর্জন*'এর একটি সময়োপযোগী যথার্থ মঞ্চভাষা রচনা করতে পারেন। আর বিভাস চক্রবর্তীর প্রয়োগ দক্ষতা নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে ছোটে বলে '*বিসর্জন*'-এ ব্যর্থ হলেও '*মালঞ্চ*' নাট্য প্রয়োগে মানবমনের অন্তর-বাহির দুইকেই বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতা দিতে পেরেছিলেন। প্রশ্ন, এই

শেষোক্ত দুইজন পরিচালক যখন প্রতিভার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল তখন আবার কেন রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে তাঁরা এগিয়ে আসছেন না ?

আসলে এই জাতীয় প্রশ্ন ওঠার অবকাশ থেকে যায় বলেই, বোধ হয় আমাদের সবার ধারণা যে, 'রবীন্দ্রনাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না' তা সে দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচির যতই উন্নতি হোক'[৪]।

সাধারণ রঙ্গালয়ে না হোক গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রনাট্য-প্রয়োগ যে অপরিহার্য, এ কথা রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার বিবিধ সমস্যা জেনেও প্রয়োগশিল্পীরা অনুভব করেন। অথচ প্রয়োগের জন্য তৎপর হন না। এবং প্রযোজনা নির্মাণে যদি রসের সিদ্ধিলাভ ঘটে, তবে তাতে তৃপ্তি নেই যতক্ষণ না প্রভূত সংখ্যক রসিকের আগমন ঘটছে। বহুরূপীর *'রক্তকরবী'*, *'চার অধ্যায়'*, *'ডাকঘর'* ও *'রাজা'* উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধিদাতা গণেশের আশীর্বাদ পেয়েছিল, সে তুলনায় *'বিসর্জন'*, *'মুক্তধারা'*, *'ঘরে বাইরে'*র সাফল্য কম। *'স্বর্গীয় প্রহসন'* তো সে তুলনায় বেশি অভিনীতই হয়নি। শৌভনিকের *'গোরা'*র বহু অভিনয় হয়েছে, কিন্তু রূপকারের *'কালের যাত্রা'* প্রযোজনার গুণগত মাত্রা ও জনপ্রিয়তা কোনোটাকেই স্পর্শ করতে পারেনি। গন্ধর্ব-র *'বদনাম'*-এর প্রচুর অভিনয় হয়েছে, হয়েছে বহুরূপী-র *'মালিনী'*। সে তুলনায় থিয়েট্রনের *'বিসর্জন'* ও অন্য থিয়েটারের *'মালঞ্চ'*র অভিনয় হল কম। থিয়েট্রনের *'বিসর্জন'*-এর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সময়ে মঞ্চ না পেয়ে নিয়মিত প্রদর্শন সম্ভব হয় না। আর *'মালঞ্চ'*-র প্রযোজনা অত্যন্ত উন্নত মানের হওয়া সত্ত্বেও মুক্তাঙ্গনে যথেষ্ট সংখ্যক দর্শক না হওয়ার অজুহাতে অন্য থিয়েটার ২৫টি প্রদর্শনের পর তা বন্ধ করে দেয়। তাহলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্ত টানতে হবে রাবীন্দ্রিক অ্যাকাডেমিশিয়ান প্রমথনাথ বিশীই সঠিক, নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী-র রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগের মডেলটা নিতান্তই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তার কোনোই উত্তরাধিকার থাকবে না আজকের সমান্তরাল ধারার থিয়েটারে ? বা হবে না কোনোই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাট্যের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ? নতুন প্রজন্মের পরিচালক রমাপ্রসাদ বণিক, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, শ্যামল ভট্টাচার্য, সুমন মুখোপাধ্যায়, কিংবা সোহাগ সেনের কাছে কি আমাদের রবীন্দ্র থিয়েটারের কিছু প্রত্যাশার নেই ?

পাদটীকা :

১। *কালের মাত্রা*, শঙ্খ ঘোষ।

২। *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও রবীন্দ্রনাথ*, নির্মল ঘোষ, *'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ'*, পৃ: ৫৮

৩। শম্ভু মিত্র রচিত *'নাটক রক্তকরবী'* গ্রন্থটি পড়ে নেওয়ার অনুরোধ করি।

৪। *গণনাট্য ও রবীন্দ্রনাথ : বন্ধনহীন গ্রন্থি*, স্বপন মজুমদার, *'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ'*, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ: ৫৭৩, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, প্রমথনাথ বিশী, ২য় খণ্ড।

[*শুধু থিয়েটার*, রবীন্দ্র সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ: ১২]

ভারতীয় নাট্যশৈলীর সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার

রবীন্দ্রনাথ এখনও পর্যন্ত ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলেই দেশে ও বিদেশে নন্দিত হন। তাঁর কাব্য ভাবনার মধ্যেই ভারতাত্মার স্বরূপ প্রস্ফুটিত। সেই রবীন্দ্রনাথ আবার দেশের বিশিষ্টতম নাটককার ও নাট্যকার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল রকম নাট্যভাষার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতেই তিনি আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব এক নাট্যভাষা। যে নাট্যভাষায় দেশের মানুষের অন্তর স্বরূপের সঙ্গে তার বাহিঃস্বরূপের দ্বন্দ্বের এক চিরকালীন ঘাত-প্রতিঘাতময় উত্তরণ প্রদর্শনই ছিল কবির অভিপ্রায়। এবং এই অভিপ্রায় থেকেই পাশ্চাত্য থিয়েটারের নকলে গড়া দেশের পাবলিক থিয়েটারে কোনো স্বস্তি পাননি বলেই নিজের আবিষ্কৃত নাট্যভাষা প্রয়োগের জন্য এক খুদে থিয়েটার গড়ে নিয়েছিলেন জোড়াসাঁকো শান্তিনিকেতনে। পেশাদার পাবলিক থিয়েটারের সমান্তরাল সেই লিটল থিয়েটারই বলা যায় আজকের গ্রুপ থিয়েটারের পূর্বসূরি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সেই থিয়েটারে রবীন্দ্রভাবানুগ একদল শৌখিন অভিনেতৃগোষ্ঠীই তাঁর নাট্যভাবনাকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রযোজক ও নির্দেশক রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের সামগ্রিক কল্পনাকে মঞ্চে সত্য করে তুলতেন। এ সব অভিনয়ের সফল প্রয়োগের বিস্তৃত বিবরণ আমরা এখন বিভিন্ন নথি-পুঁথি পত্রপত্রিকা গ্রন্থাদিতে পাই। পাই কিছু সাদাকালো আলোকচিত্রে। সব মিলিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার এ ছিল এক সফল কিংবদন্তী।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই কিংবদন্তীতুল্য সাফল্য যে নাটককার রবীন্দ্রনাথের রচনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল সেই নাটককারের অসাধারণ সব টেক্সটের গভীর সাহিত্যমূল্যে আমরা উদ্বেলিত হয়েছি রবীন্দ্রোত্তর কালে। কিন্তু মঞ্চায়নে ? সফল মঞ্চায়নের জন্য প্রায় এক দশক প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে আমাদের।

১৯৪২ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলা মঞ্চে যে প্রগতি অভিমুখী এক অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে যায় সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গঠন এবং সংঘের মতাদর্শের অনুসরণে গড়ে ওঠা লিটল থিয়েটারের এক নতুন নাট্য আন্দোলন তার বহুখ্যাত কর্মসূচির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাটক স্বভাবতই অপরিহার্য ছিল। কিন্তু এই নতুন যুগের নাট্যপ্রয়োগ রীতি ও রবীন্দ্র সংলাপের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে অক্ষুণ্ন রেখে জীবন্ত সুরেলা অভিনয় বা শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক

সংঘের রাবীন্দ্রিক রীতির ললিত বাচন বিন্যাসের বাইরে বেরোতে পারেনি। অথচ ইতোমধ্যেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা-শিক্ষাদির 'সাময়িক স্কুলে' সংঘের বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তির সর্বজনবোধ্য এক প্রয়োগরূপ আবিষ্কার করে নিবারণ পণ্ডিতের মতো গ্রাম্যকবি কিংবা মাহেশের মজুরদের বোধের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই শম্ভু মিত্রই যখন ৪৬ সালে কলকাতার বীভৎস দাঙ্গার মাস দু'য়েক আগে গণনাট্য সংঘের হয়ে *'মুক্তধারা'* পরিচালনা করলেন এবং ব্যর্থ হলেন, তখন তাঁর মনেও প্রশ্ন জাগল। শম্ভু মিত্র লিখছেন, '১৯৪৬ থেকে হুড়মুড় করে অনেক ঘটনা ঘটতে থাকলো আমাদের জীবনে। ধরতি-কে-লাল ছবির কাজ শেষ যখন বোম্বে থেকে ফিরছি তখন যতোদূর মনে পড়ে, ভিটি স্টেশন থেকে তোপের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম। ভারতীয় নাবিকদের বিদ্রোহের লড়াই চলছিল। সারা শহর যেন উত্তাল।' বোম্বের প্রভাব কলকাতাতেও পৌঁছেছিল। সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমী সংগ্রামের সঙ্গে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীও একাত্মতা বোধ করে শ্রেণী সংগ্রামকে উত্তাল করে তুলল। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাস্তবের সাধারণ জনগণের লড়াইয়ের প্রায় কাছাকাছি প্রতিরূপ গণনাট্য সংঘ খুঁজে পেল কবির *'মুক্তধারা'* নাটকে। সেখানেই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইয়ের শ্রেণীচ্যুত যুবরাজ অভিজিতের সংগ্রামী ভূমিকা তদানীন্তন সমকালের কূট প্রশ্নেরই তো সার্থক উত্তর। তাও শম্ভু মিত্রের বিশ্লেষণী প্রয়োগ ক্ষমতার কাছে এক জটিল প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে থাকল। শম্ভু মিত্র লিখছেন, 'ফিরে এলে মুক্তধারার ভার পড়ে। ব্যর্থ হই। সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ জানা সত্ত্বেও। নাৎসীদের কাহিনী জানা সত্ত্বেও মনে হলো এ নাটক যেন কোনো পুরাকাহিনীর মতো, আমাদের জীবনের সঙ্গে যেন কোনো সংলগ্নতা নেই।' মানুষের তৃষ্ণার জল বন্ধ করে অবাধ্য প্রজাকে দমন করার বৃত্তান্তর পাশে সমান টান টান উত্তেজনা রয়েছে যন্ত্ররাজ বিভূতি বনাম যুবরাজ অভিজিৎ উত্তরকূট বনাম শিবতরাইয়ের অধিবাসীবৃন্দের লড়াই, ধনঞ্জয়ের নেতৃত্ব বনাম যুবরাজের শ্রেণীচ্যুতির লড়াই—তা সত্ত্বেও তরুণ শম্ভু মিত্র পারেননি পুরাকাহিনীর ভেতর থেকে সমকালীন সংগ্রামের সংলগ্নতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। পরবর্তীকালে বহুরূপীর প্রযোজনাতেও *'মুক্তধারা'*-য় শম্ভু মিত্র অসফল। ততদিনে স্বাধীন দেশের মানুষ দামোদর বাঁধ বা ভাকড়া নাঙালের উপকারিতা ও অপকারিতা দুয়েরই স্বাদ পেয়ে গেছে ১৯৫৯-৬০ সালে। সহজ ব্যাখ্যায় যন্ত্রশক্তির প্রতি বিরূপতার নাটক *'মুক্তধারা'* যন্ত্রযুগের মানুষের কাছে আদৃত না হতেই পারে। কিন্তু সেই *'মুক্তধারা'*ই যখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কৌশলের যুগে বহুরূপী কর্তৃক আবার কুমার রায়ের পরিচালনায় ১৯৯৫-এ প্রযোজিত হয়, তখন কিন্তু প্রযোজনা জমে যায়, অন্তত ১৯৫৯-এর প্রযোজনার চেয়ে অনেক বেশি টানটান, সংলাপও মৌখিক বাগ্‌বিন্যাসের ধর্মে স্বভাবপ্রতিম হয়ে ওঠে; তাছাড়া তেহরাই বাঁধের রাজনীতি বা নদী জল বন্টনের রাজনীতিতে দেশের একাংশ যখন দীর্ঘদিন ধরে উত্তাল তখন ১৯২২-এর *'মুক্তধারা'* ১৯৯৫-এর সমকালীন সংলগ্নতা ছুঁয়ে ফেলে। 'ভালো

করে ভালো নাটক করা'র চ্যালেঞ্জ বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী আজও গ্রহণ করে, কিন্তু দর্শক, শিষ্টরুচির দর্শক আজ এই চ্যালেঞ্জে তেমন সাড়া দেন না, তাঁরা চান সিরিয়ালধর্মী হালকা উপভোগ্যতা। যাইহোক, নাটককার রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বাংলাভাষীদের জন্য নাটক লেখেননি, তাঁর সব নাটকের কেন্দ্রে যে এক অবিনাশী ভারতীয়তা, সনাতনী ও প্রগতিমুখী ভারতাত্মার চিরন্তন দ্বন্দ্বের উন্মোচন—এই সত্য চল্লিশের দশকের গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বাস্তবায়িত করতে না পারলেও *'নবান্ন'*র অন্যতম স্রষ্টা ঐ শম্ভু মিত্রই বাস্তবায়িত করলেন পঞ্চাশের দশকে তাঁর নিজের দল বহুরূপী-র প্রযোজনায়।

রবীন্দ্রনাথের মর্মকেন্দ্রে যে নাটক, নাটকীয়তা, চরিত্রের জটিল দ্বান্দ্বিকতা, সাংকেতিকতার মধ্যেও যে বাস্তবে প্রতিমা বিরাজমান, তাকে জীবন্ত করে তোলার চ্যালেঞ্জ শম্ভু মিত্র *'মুক্তধারা'*-উত্তরকালে গ্রহণ করেছিলেন বলেই, নাটক নয়, উপন্যাসের নাট্যরূপ *'চার অধ্যায়'* প্রযোজনাতেই সেই সাফল্যকে আয়ত্ত করেন ১৯৫১ সালে বহুরূপী শিল্পীগোষ্ঠীর নিরলস অনুশীলনের বিনিময়ে।

যে শম্ভু মিত্র ১৯৪৬-এর *'মুক্তধারা'*র ব্যর্থতার পর ভেবেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়েই আমরা গভীর নাট্যের সৃষ্টিতে পৌঁছে যাবো। যে নাট্য আমাদের আধুনিককালকে জীবন্ত করে প্রকাশ করবে আমাদের ভারতীয় নাট্যরীতিতে।' সেই শম্ভু মিত্রই ১৯৭৬-৭৮ সালে বহুরূপী ত্যাগের পর *'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছোনো গেল'* বক্তৃতাভিত্তিক নিবন্ধে লিখছেন, 'একটা নাটক অভিনয় করতে গেলে, আমি দেখেছি, যে প্রথম পড়ার পর যতোটা বুঝেছিলুম অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝি। এবং যেহেতু *'চার অধ্যায়'*-এর লেখক একজন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাই মহলা দিতে দিতে ও অভিনয় করতে করতে এর অনেক নিগূঢ় অর্থ আমাদের কাছে যেন স্পষ্ট হয়েছে।... মহলা. শুরু করবার কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে এর সংলাপ বলতে ততো অসুবিধে হচ্ছে না। সহজ কথা বলার মতোই বলে নেওয়া যাচ্ছে।'... রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগের প্রকৃত সমস্যা হল তার সংলাপের অবাস্তবতা উপমা রূপকের অর্থ ভেদ করে কথোপকথন-ধর্মিতা আনার ক্ষেত্রে কাব্যিকতার স্রোতে ভেসে যাওয়া। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে আরও অনেক বাধাই দূর করেছিলেন কিন্তু তার মধ্যে প্রধানতম অভিজ্ঞতা হল 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা সম্পর্কে কুসংস্কার এড়িয়ে বুঝতে শিখেছি যে প্রত্যেক বড়ো লেখা পড়তে গেলে মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বাক্‌ছন্দটা ধরবার চেষ্টা করতে হয়।'... 'যে শিল্পী যতো মহৎ, যতো অরিজিন্যাল, ততোই তাঁর ছন্দ বোঝাবার জন্য বেশি করে চেষ্টা করতে হয়।'

নাটককার রবীন্দ্রনাথকে বাংলা তথা ভারতের আধুনিক থিয়েটারের ভাষায় মঞ্চসফল নাটককাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পালনের কাজটা পরিচালক শম্ভু মিত্রের পক্ষে প্রায় আবিষ্কারকের মর্যাদা এনে দেয়। বহুরূপী ও রবীন্দ্রনাটক প্রায় পাঁচ দশকের সমার্থবোধক বাক্‌বন্ধন। *'চার অধ্যায়'* দিয়ে যা শুরু *'রক্তকরবী'*র মঞ্চায়নে তার উত্তুঙ্গ

সীমায় উপনীত হওয়া, আর *'মুক্তধারা'* (১৯৫৯), *'বিসর্জন'* (১৯৬১)-এর ব্যর্থতা সত্ত্বেও *'রাজা'* (১৯৬৪)-এ অন্ধকারের মধ্যে সত্যস্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করা নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্রের শ্রেষ্ঠকর্ম। শম্ভু মিত্রের ভাবধারাতেই পরিশীলিত পরিচালিকা তৃপ্তি মিত্রের *'ডাকঘর'* ১৯৫৭) তাঁর পরম পাওনা, পেয়ে যান, কিন্তু পরাজয় বরণ করেন *'ঘরে বাইরে'*-এর মঞ্চায়নে (১৯৭৪)। এই ধারাতেই উত্তরকালের বহুরূপী কর্ণধার কুমার রায় *'মালিনী'* (১৯৮৬) প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথকে বাংলা মঞ্চে আবার সজীব করে তোলেন, চেষ্টা করেন *'মুক্তধারা'*য় বহুরূপীর পূর্বতন ব্যর্থতার বোঝা কাটানোর, বর্তমান সমালোচকের দৃষ্টিতে কুমার রায়ের এ প্রয়াস অতীতের তুলনায় সফল প্রযোজনা হলেও দর্শক জনতার বিচারে *'মুক্তধারা'* ফ্লপ করে।

বহুরূপীর থেকেই গণনাট্যর প্রেক্ষাপটে আধুনিক প্রগতি থিয়েটার বা লিটল থিয়েটারের পদযাত্রার সূচনা। বহুরূপীর পঞ্চাশবর্ষ পূর্তিতে বলা যায় এই আধুনিক নাট্যভাষার অর্ধশতাব্দী অতিক্রমণ। এই আধুনিক নাট্যভাষার মধ্যে বহুরূপীর তথা শম্ভু মিত্রের অন্বেষণের মর্মকেন্দ্র হল ভারতীয় নাট্যশৈলীর আবিষ্কার। *'চার অধ্যায়'*-এর বাস্তবধর্মী নাট্য প্রয়োগের মধ্যে রবীন্দ্রনাট্য পৌঁছোনোর যে সঙ্কেতগুলি ধীরে ধীরে আমাদের চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে তাই বৈপ্লবিক সাফল্যে পৌঁছোনোর চাবিকাঠিরূপে ব্যবহৃত হল রবীন্দ্রনাথের *'রক্তকরবী'*র সফলতম মঞ্চায়নে ১৯৫৪-য়। শম্ভু মিত্র লিখছেন, 'একদা আমরা 'রক্তকববী' করলুম। এবং সেই থেকেই বলা যায় আমাদের কাল হলো। তার পূর্বে আমরা 'চার অধ্যায়' অভিনয় করেছি। কিন্তু 'রক্তকরবী' করবার সময়েই ক্রমশ মনে হতে থাকলো যে ভারতীয় নাট্য প্রকাশের একটা ধরন যেন আমরা দেখতে শিখলুম। এই যে সমস্ত ঘটনাকে একটা নাট্যক্ষেত্রে আনা, এই যে ব্যক্তি ও প্রতীক একই রূপের মধ্যে প্রকাশ করা—এই রকম নানান বৈশিষ্ট্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলুম।' 'যে বাঙলা নাট্যের ভবিষ্যতে পৌঁছতে হলে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়েই যেতে হবে। ওঁকে এড়িয়ে হবে না।' ১৯৭০-এ তাঁর এই উপলব্ধি ও অন্বিষ্টকে আরও স্পষ্টভাষায় বললেন, 'যতোদিন আমরা পশ্চিমারীতির মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করবার চেষ্টা করেছি, ততোদিন তাঁকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নবান্নকে কেন্দ্র করে যে নতুন নাট্যধারার সূচনা তার লক্ষ্য ছিল এমন এক নাট্যরূপের যা একদিকে যেমন আধুনিক, অপরদিকে, তেমনিই বিশিষ্টভাবে ভারতীয়। এবং এই বুদ্ধিদীপ্ত ভারতীয় থিয়েটার গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাই এই নাট্যকর্মীদের রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করার বিশিষ্ট নাট্যরূপে পৌঁছে দিয়েছে।

১লা মে ১৯৯৮-এ বিশ্ব শ্রমিক ঐক্য দিবসে বহুরূপীর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। আশা ছিল কুমার রায় অসুস্থ শরীরেও আবার রবীন্দ্রনাথকে, *'রক্তকরবী'*কে নতুন করে আবিষ্কার করবেন, না তার বদলে লক্ষ্যহীন শিথিল গ্রন্থিত *'ছাচ ভাঙা মূর্তি'* বহুরূপীর ক্লান্তিকে, হতাশাকে চটুল সংলাপের প্রতি বাজার চালু দুর্বলতাকেই প্রকট করে।

বরং বলব রবীন্দ্রনাট্যর পথমুখীনতার ধর্মকে মান্য করে, চিত্রপটের দুর্বলতাকে কাটিয়ে নাটককার বাদল সরকারের সহযোগিতায় কাঁচরাপাড়ার পথসেনা নাট্যগোষ্ঠী এই ১৯৯৮-এ এক অসাধারণ কাজ করেছেন। মুক্তাঙ্গন বা পথনাটিকার আয়তনেই কবি '*রক্তকরবী*'-র মঞ্চ সম্ভাবনা কল্পনা করেছিলেন, কবির সেই মুক্তাঙ্গন '*রক্তকরবী*' আজ পথসেনার নিষ্ঠায় বাস্তব প্রেরণা হয়ে উঠেছে। নাটককার রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে পথসেনার '*রক্তকরবী*' দেখে আবার নাটক লিখতে বসতেন।

[*গণশক্তি*, রবিবাবের পাতা, ৭ জুন ১৯৯৮]

স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্রিয়াশীল বাংলা নাটক ও থিয়েটার : আদিপর্ব

স্বাতন্ত্র্য অর্জনে প্রেরণা যদি স্বাধীনতার মৌলিক উপাদান হয়, তবে বাংলার নাটক ও নাট্যকলার উদ্ভব স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ের অভিব্যক্তি। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের রাজধানী কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাঙালির থিয়েটার শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ থিয়েটারের নকলে। কিন্তু সে নকলের মধ্যে ছিল অধিপতি সংস্কৃতির বিপ্রতীপে আত্ম আবিষ্কাবের প্রেরণা। বাঙালির সেদিনের আবিষ্কারের প্রেরণা, নাট্যনিরীক্ষা তাই সংস্কৃত নাট্যকলা বা দেশীয় যাত্রার সঙ্গে ইউরোপীয় থিয়েটারের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করে নিয়েছিল নিজেদের আমোদিত করার মতন বঙ্গীয় নাট্য প্রয়োগরীতি।

এই রীতিতেই বাঙালির নাটক ও নাট্যকলা যখন আঁতুড়ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে তখনই তার দাপটে বিদেশি ইংরেজ ও শাসকবর্গ ভয়ে ত্রস্ত হয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ১৮৭৬-র কালাকানুন জারি করে বসেছে।

এটা ঘটনা যে, ইংরেজ জাতি যেমন বিশ্বনাট্যের মহত্তর ভাবাদর্শের অধিকারী, তেমনই নাট্যের জনপ্রভাবিনী ক্ষমতায় তার শাসক শ্রেণী বরাবরই তরাস শঙ্কিত থাকত স্বীয় দেশে মধ্যযুগ পর্যন্ত; উপনিবেশসমূহে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এবং এটা লক্ষ করার যে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শাসকের নাট্যভীতি স্বাধীন ভারতের জাতীয় শাসকদলের আচরণেও সংক্রামিত হয়ে থেকেছিল স্বাধীনতার সিকি শতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত। বস্তুত নাট্য বা থিয়েটার সর্বদেশে সর্বকালেই শাসকশ্রেণীর চক্ষুশূল, যদি না তার শ্রেণীস্বার্থে রচিত বা প্রযোজিত হয়। নাট্যের নিজস্ব নিয়মেই নাটক প্রায়শ রাষ্ট্রীয় শাসন অস্বীকার করে পরিবর্তে সেই জনমন শাসন করে। শাসন করে বা শাসন-অনুশাসনের তর্জনী সংকেত করে শাসকশ্রেণীর প্রতি; শাসন করে তার সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আত্মিক ভ্রষ্টাচারকে। ইতিবাচকতা বনাম নেতিবাচকতার দ্বান্দ্বিক অভিমুখকে। ব্যষ্টি বনাম সমষ্টির দ্বন্দ্বকে। শাসক বনাম শাসিতের সংগ্রামকে।

নাট্যের এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালির আধুনিক নাট্যকলার হাতেখড়ি বিদেশি গুরুর তত্ত্বাবধানে শুরু হলেও, হাঁটি হাঁটি পা-পার অবস্থাতেই দু-একটি বিনোদন বা ধ্রুপদী বিন্যাসের নাটকে হাতে মকশো করেই সামাজিক প্রচার আন্দোলনের হাতিয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় দেশীয় পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে সামাজিক সংহতির আন্দোলনে যখন দেশের ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন প্রথমেই তাঁরা নজর দিয়েছিলেন নারী সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তিসাধনের দিকে। এই মুক্তির প্রেরণাতেই প্রথম বাস্তববাদী নাট্যরচনা হল রামনারায়ণের *'কুলীন কুলসর্বস্ব'*; রচনা ১৯৫৪, প্রথম অভিনয় ১৮৫৭। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের সপক্ষে সংগঠিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও লেখা হয়ে গেল বেশ কয়েকটি নাটক, অভিনয়ও হয়ে গেল উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত *'বিধবা বিবাহ নাটক'*। বাংলা থিয়েটারের জন্মকালেই সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার এমনিভাবে সমাজ জীবনে সঞ্চারিত হল। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় উত্তরণ অবশ্য এর পরবর্তী ধাপ।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের মধ্যে সাহস-দুঃসাহসের প্রশ্ন থাকে। উনিশ শতকীয় সমাজ সংস্কারমূলক নবজাগরণের নেতৃত্বে যাঁদের হাতে ছিল, তাঁরা প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি মোহমুগ্ধ ছিলেন, মোহাবিষ্ট ছিলেন বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিও। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তার আলোকে দেশীয় সামন্ত অভ্যাসের সংস্কার করার পাশাপাশি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই মুক্তচিন্তার অগ্রদূত হয়েও ইংরেজ শাসককে বলতে পারেননি রাষ্ট্রনৈতিক পরবশ্যতা থেকে দেশকে মুক্ত করার কথা। যদিচ যথার্থ স্বাধীনতাপ্রেমী ছিলেন তিনি। নাট্যকলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর অভিব্যক্তির মধ্যে যেন দেশের নাট্যকলার সংগ্রামী লক্ষ্য ছিল নির্বাক : The Struggles are not merely between reformers and anti-reformers but between liberty and tyranny throughout the world, between justice and in-justice and between right and wrong.

সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুক্তি ও নিপীড়নের যে সংগ্রাম বিদ্যমান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার মুখ্য কারণ এ সত্য উনিশ শতকীয় জাগরণের নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ অনুভব করলেও সরাসরি তা উচ্চারণ করতে পারেননি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষক সম্প্রদায় বিদেশি শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশীয় সামন্ত শাসকদের নেতৃত্বে একাধিকবার বিদ্রোহের আগুনে ফেটে পড়েছে। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলার নবাব মীরকাশিম, মহীশুরের অধিপতি টিপু সুলতান, কর্ণাটকের কিট্যুর রাজ্যের বিধবা রাণী চানাম্মার পেছনে ছিলেন দেশের সাধারণ শ্রমজীবী কৃষিজীবী ঘরের সন্তানেরা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে সন্ন্যাসী ফকিরদের যৌথ নেতৃত্বে হিন্দুমুসলমান কৃষকের বিদ্রোহ, রাঢ়বঙ্গে চুয়াড় বিদ্রোহ ওড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ জুড়ে ঘটেছে। ও সব বিদ্রোহ দমনে লর্ড হেস্টিংস, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড কর্নওয়ালিশকে যথেষ্ট হিংস্র ও অমানবিক হতে হয়েছে। উনিশ শতকে ও ১৮৫৭-র সিপাহি যুদ্ধের ব্যাপক ঘটনার আগে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে নানাপ্রান্তে। ১৮২৫-র খান্দেশের ভিল বিদ্রোহ, বুন্দেলখণ্ডের কৃষক

বিদ্রোহ, হরিয়ানার জাঠ বিদ্রোহ, ১৮৩৯-এ গুজরাটের কোলি বিদ্রোহ, ১৮২৯-৩৩-র খাসি বিদ্রোহ, ১৯৩০-৩৩-র ছোটনাগপুরের মুন্ডা ও হো বিদ্রোহ, ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৩১-এ বাংলার তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ, ১৮৪৮ ফরাজি আন্দোলনের দুদু মিঞার বিদ্রোহ; সব বিদ্রোহ যেন শেষে সম্মিলিত হয়ে ১৮৫৭-র বারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বারুদের পলতেয় আগুন দিল।

১৭৯৩-র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার জমিদার মুৎসুদ্দি ও শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোকে চিন্তার মুক্তি খুঁজেছেন, রাজনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেননি। নব জাগৃতির বিশিষ্টতম উপাদান যে দেশাত্মবোধ স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ, তার প্রথম প্রকাশ ঘটে হিন্দু কলেজের শিক্ষক মহান ডিরোজিওর চিন্তা চেতনায়। ডিরোজিওর নেতৃত্বে ১৮২৮-এ স্থাপিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্কসভায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্বদেশ ভাবনার বীজ বপন করা হয়। এই নব্যবঙ্গীয় ছাত্রদের নিয়ে একটি বিতর্ক সভার বিষয় ছিল 'The nobility of patriotism'। সভার পত্রিকা '*পার্থেনন*' সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যায় '*ভারতের ব্রিটিশের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন*', ও '*বিচার আন্দোলনকে অনাচার অবিচার*' শীর্ষক বিতর্কসভার প্রতিবেদন ছেপে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতায় তার প্রচার বন্ধ করতে হয়। ছাত্র সমাজের মধ্যে তথাপি দেশাত্মবোধের প্রেরণা ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে। ১৮৩০-এ স্থাপিত ছাত্রদের 'বঙ্গহিত' সভাও জাতীয় প্রসঙ্গে আলোচনা উত্থাপন করেছে। বঙ্গভাষা, প্রকাশিকসভা, জমিদারসভা, তথা ভূম্যধিকারী সভা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজ রাজ্যশাসনের মৃদু সমালোচনার সূত্রে দেশচেতনা গড়ে উঠেছিল। তবে ১৯৪৩-এ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যর মধ্যেই সংগুপ্ত রয়েছে 'রাজদ্রোহী' মূলক অবস্থান না নিয়ে দেশের 'মঙ্গল চেষ্টা' সম্পাদনার আপসকামী বুদ্ধিজীবীতা। '*বেঙ্গল স্পেকটেটর*' পত্রিকায় প্রকাশিত (২৫/৪/১৮৪৩) বিবরণীর মধ্যে স্পষ্টভাষায় মুদ্রিত রয়েছে 'এতৎ সভার মত এই যে পৃথক ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্ম্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চিরস্থায়ী রাজত্বে সাহায্যে করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল' ইত্যাদি। মূলত ইংরেজ শাসনে জমিদারি ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই ভূম্যধিকারী স্বার্থ সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়েছিল। ১৮৫০ সাল নাগাদ দেখা যাচ্ছে দুই সভার দ্বন্দ্ব চরমে। একদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব; অন্যদিকে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র। সোসাইটি অবশ্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে রায়তদের পক্ষ নিয়েছিল। ১৮৫৭-র পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে নতুন আর একটি সভা গড়ে ওঠে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

১৮৫১ সালে। এই সভা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ ১৮৫৩-য় শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ২১ দফা শাসন সংক্রান্ত পরিবর্তন দাবি করে আবেদন পাঠিয়ে কলঙ্কিত রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচয় দেয়।

বাংলা নাটক ও নাট্যকলায় স্বাদেশিকতার ক্রিয়াশীলতার প্রসঙ্গে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের মননে স্বাদেশিকতার ভাবনা যে আপন শ্রেণীস্বার্থে কোন্ গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল, তা নির্দেশের উদ্দেশ্যেই ধান ভানতে শিবের গীতের মতো এ সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল। স্বাধীন ভারতবর্ষের ৫০বর্ষ পূর্তিকালের তরুণ পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝবেন।

ইংরেজ পরাধীনতার একশো বছরের মাথায় ১৮৫৭-য় সামন্ত শাসক শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতীয় সিপাহিরা যখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করলেন, তখন দেশীয় মুৎসুদ্দি নেতৃত্বে বাঙালি বাবুসমাজ তার তাৎপর্য বোঝেননি, ভেবেছিলেন বা তাঁদের ভাবানো হয়েছিল যে ব্যাপারটা নেহাতই মূর্খ চাষীর ঘরের সন্তান, হিন্দু-মুসলমান সিপাহিদের অরাজকতা সৃষ্টি। সুতরাং ১৮৫৭ সালে সংস্কৃত ধ্রুপদী নাটক *'শকুন্তলা'*-র বঙ্গানুবাদ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা সেদিন বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতার স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজেছিলেন। [লেবেদেফের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১৭৯৫-র বেঙ্গলি থিয়েটারে *'কাল্পনিক সংবদল'*-এর অভিনয়কে অনেকে বলেন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ; এই ১৮৫৭-র *'শকুন্তলা'* অভিনয়ই নাকি বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের শুরু।] কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নাট্যকার বা অভিনেতা নন সমাজ সংস্কার নেতা নন *'সংবাদ প্রভাকর'* সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাবশিষ্য *'এডুকেশন গেজেট ও বার্তাবহ'*-র সহসম্পাদক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সোচ্চারে তাঁর *'পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য'*-এ ১৮৫৮-য় উচ্চারণ করলেন স্বাধীনতার বীজমন্ত্র।

> স্বাধীনতার হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
> কে বাঁচিতে চায় ?
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
> কে পরিবে পায় ?

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অবশ্য বাঙালির মোহনিদ্রা ঘোচানোর জন্য ব্যঙ্গের খোঁচা দিতে ভোলেননি :

> 'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু,
> শিখিনি শিং বাঁকানো,
> কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস।
> আমরা ভূষি পেলেই খুশি হবো
> ঘুসি খেলে বাঁচবো না।'

ঘুসি খেলে বাঁচবো না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই খোঁচা হজম হলেও রঙ্গলালের আহ্বান ব্যর্থ হল না। বাঙালির দেশপ্রেম জাগ্রত হল, কিন্তু টডের *'অ্যানালস্ অব রাজস্থান'* অবলম্বনে দেশপ্রেমের আবেগ চালিত হল হিন্দুত্ববাদের লাইন ধরে। মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির স্বাধীনতা অর্জনের উপমানরূপে ব্যবহার করতে গিয়ে মুসলমান হিন্দু অনৈক্যের ফাঁদে পা ফেলল ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এর সুযোগ নিল ইংরেজ। যাইহোক, এই দেশপ্রেমিক আবেগ থেকে সিপাহি যুদ্ধোত্তর বাংলার হিন্দু-মুসলমানের কৃষক সমাজের সম্মিলিত নীলকর বিরোধী সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ১৮৫৯-৬০ সালের অভিজ্ঞতায় কবি দীনবন্ধু মিত্র চমৎকার সাড়া দিলেন *'নীলদর্পণ'* নাটক রচনা করে। দীনবন্ধু গরিবের সন্তান, স্বরচিত মানুষ, কর্মসূত্রে গ্রামবাংলাকে চিনতেন আন্তরিক সহানুভূতিতে। তাঁর সমব্যথী মনের দর্পণে ধরা পড়ল নীলকর অত্যাচারে নিপীড়িত গ্রামবাংলার চাষীর মর্মবেদনা। ১৮৫৯-এর নীলকর বিরোধী কৃষকদের সংগ্রামে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজ অবশ্য সক্রিয় সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের *'হিন্দু পেট্রিয়ট'* নীলকর অত্যাচার নিবারণে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সদ্য অতীতের ভুল এবার আর বাঙালি করেনি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, 'হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি উদগীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনীর সময়ে ক্যানিং-এর পৃষ্ঠপোষক হইয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।' গরিব মধ্যবিত্তের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দীনবন্ধুরও ছিল। সরকারি কর্মচারী হয়ে সরকার বিরোধী ভূমিকা পালনে সাহসের কথঞ্চিৎ ন্যূনতা ঘটতেই পারে। রচয়িতার নাম গোপন করা-র মধ্যে সাহসের অভাব আছে বলে মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি নীলদর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরাজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা নীলকরের সুহৃদ্। বিশেষ পোষ্ট অফিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরাজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে। এ সকল জানিয়াও নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।' ১৮৬০ সালে ঢাকার 'বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে' ছাপা হয়ে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণ সূত্রে জানা যায় 'নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা বলিতে বলিতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।' রেভারেন্ড লঙও নাটকের অতি দ্রুত ইংরেজি অনুবাদ করালেন। কথিত

আছে, মাইকেল মধুসূদন এর অনুবাদক। অনুবাদে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব দেখে অনেকে প্রশ্ন তোলেন মাইকেল এর অনুবাদক কিনা। যাইহোক ১৮৬১ সালে রেভারেন্ড লঙ সাহেবের নাম প্রকাশক ও মুদ্রকরূপে ছেপে '*Nill Durpen, or the Indigo Planting Mirror*' প্রকাশিত হয়ে সারা বিশ্বে সাড়া ফেলেছিল; 'নীলদর্পণ বাঙ্গালীর Uncle Tom's Cabin.' টমকামার কুটীর আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।' '*ইংলিশম্যান*' পত্রিকার সম্পাদক নীলকরদের পক্ষ নিয়ে লঙের নামে ঐ বছরই মামলা করেন। মামলায় সওয়াল জবাবে লঙের বক্তব্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রকাশিত সুধী প্রধান সম্পাদিত গ্রন্থে সংকলিত আছে। বিচারে রেভারেন্ড জেমস লঙের একমাস কারাবাস ও একহাজার টাকা জরিমানা ধার্য হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দেন। '*নীলদর্পণ*' নাটক সবাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা ঘোষণা করেই রাষ্ট্রশক্তির আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। দীনবন্ধুর নাট্যরচনার সাফল্য এইখানে। স্বাধীনতা সংগ্রামে রামমোহন কথিত লিবার্টির কথা দীনবন্ধু তোলেননি। তুলেছেন টিরানি-র মর্মবিদায়ী ছবি। এই নাট্যচিত্রর বাস্তবতাই দেশবাসীর চোখ খুলে দিল। দীনবন্ধুর '*নীলদর্পণ*' কালজয়ী হয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামের উষাকালে বাংলা নাটকের ক্রিয়াশীল ভূমিকার বীজ বপন করে।

'*নীলদর্পণ*' রচনার পর এক যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলা থিয়েটারে তার অভিনয় আয়োজনের। ১৮৭২-এ বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার তথা শ্যামবাজার নাট্য সমাজের একদল তরুণ নাট্যসেবী ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি তথা ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে ৭ই ডিসেম্বর '*নীলদর্পণ*' নাটক মঞ্চস্থ করেন চিৎপুর রোডের মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে। ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তার প্রেরণা অবশ্য ১৮৬৭-এর নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা। নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল' নবগোপাল বলে তৎকালে আখ্যায়িত হতেন, কারণ জাতীয় ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সর্বক্ষেত্রেই তিনি তখন ন্যাশনাল কথা জুড়ে দিতেন। যা হোক ১৮৭২-র ন্যাশনাল থিয়েটার দিয়েই বাঙালির সাধারণ নাটকের প্রবর্তন। টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর দর্শকের জন্য থিয়েটারের দ্বার তখন থেকে উন্মুক্ত হল।

জমিদার মুৎসুদ্দিদের শৌখিন থিয়েটারের শখ মিটে গেছে, থিয়েটার এখন জনসাধারণের। জনচেতনার মানবৃদ্ধি. জাতীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার সমতার দাবিতে সাধারণ রঙ্গালয় জমে উঠবে এইটাই প্রত্যাশা ছিল উদ্যোক্তাদের।

ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তা কারা ? বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু, রাধামাধব রায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এঁরা শ্যামবাজার নাট্যসমাজ নামে প্রথমে দীনবন্ধুর

'লীলাবতী' মঞ্চস্থ করেন ১৮৭২-র ১১ই মে। পরবর্তী প্রযোজনা *'নীলদর্পণ'* ন্যাশনাল থিয়েটার নামে মঞ্চস্থ করা হবে। গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল নামে আপত্তি জানিয়ে দল ছেড়ে দেন। *'নীলদর্পণ'* প্রথম মঞ্চস্থ হয়েই যখন চারদিকে সুখ্যাত, তখন গিরিশচন্দ্র বেনামিতে কুৎসিত সমালোচনা করলেন ন্যাশনাল থিয়েটার প্রযোজিত *'নীলদর্পণ'*-এর। গিরিশচন্দ্রই এক বৎসরকালের মধ্যে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার দলে ভাঙন এলো তখন ন্যাশনাল থিয়েটার নাট্যসম্প্রদায়ের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হন এবং *'কৃষ্ণকুমারী'* নাটক অভিনয়কালে ভীমসিংহ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য 'by a distinguished amateur' বলে তাঁর নামের জায়গায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে সংগঠনকে বাধ্য করেন। অর্ধেন্দুশেখর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নামে নামাঙ্কিত হয়।

আমাদের বক্তব্য, জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় সংগঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার তার জন্মকাল থেকেই যে বঙ্গীয় দলাদলির সম্মুখীন হল, তার জের বাংলা থিয়েটারে অদ্যাপি বিদ্যমান। প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর উভয় পর্বেই বঙ্গীয় দলাদলি থেকে থিয়েটার আর মুক্ত হল না। সাধারণ রঙ্গালয়ে দ্বন্দ্বের মূল কারণ অর্থ সম্পর্কিত আর অপেশাদার নাট্যদলে মূলত গোষ্ঠীপতির প্রভুত্ব বিস্তারী ক্ষমতাই দলাদলির কারণ।

এই সাংগঠনিক সমস্যা থেকেই বাংলা থিয়েটার কতখানি কোন আদর্শ অবলম্বনে চালিত হবে, দেশকাল সমাজের বুকে উত্থিত আর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্নের অভিমুখ দেখে তা নির্ধারিত হতে লাগল। সেই সঙ্গে নাট্য প্রয়োগরীতিও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কতখানি বিদেশি কতখানি দেশীয় ভাবধারায় তা নিয়ন্ত্রিত হবে তাও স্থিরীকরণের দায় গিয়ে বর্তালো সংগঠক নাট্যদলের মূল কর্ণধার, তথা সেকালে ম্যানেজার, একালে নাট্যপরিচালকের ওপর। নাট্য বিষয়ে ও তার আঙ্গিক নির্মাণের স্বাধীনতা মূল কর্ণধারের আদর্শবাদিত্য ও শিল্পবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাই ন্যাশনাল থিয়েটার পরিবেশিত *'নীলদর্পণ'* নাটক তার বিষয়বস্তু ও নাট্য প্রয়োগের গুণে 'the event of national importance' হয়ে উঠলেও দল কিন্তু বৈষয়িক কারণেই এক নাগাড়ে *'নীলদর্পণ'* করে যেতে পারেনি। পেশার স্বার্থ ও দর্শক চাহিদার কথা বিবেচনা করে ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর *'নীলদর্পণ'*, তো ১৪ই ডিসেম্বর *'জামাইবারিক'*, ২১শে ডিসেম্বর আবার *'নীলদর্পণ'*, তারপর ২৮শে ডিসেম্বর *'সধবার একাদশী'*। *'নীলদর্পণ'*-এর নাট্যকার দীনবন্ধু তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের একমাত্র নাট্যকাররূপে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। দীনবন্ধু *'নীলদর্পণ'* রচনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ঐ জাতীয় রাজনৈতিক স্পর্শকাতর আর কোনো প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে নাট্যকার দীনবন্ধুর ক্রিয়াশীলতা *'নীলদর্পণ'*-এই সীমিত থাকল।

'নীলদর্পণ'-এর প্রথম অভিনয়ের সাফল্য থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার নামধারী আবেগে বাঙালির স্বাদেশিকতা বোধ যে সচল হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই প্রথম অভিনয়ের কলাকুশলী শিল্পীদের মধ্যে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি যখন যে দলে থেকেছেন, সেই দলই *'নীলদর্পণ'*-এর অভিনয় আয়োজন করতেন। অর্ধেন্দুশেখর একাই প্রথম অভিনয়ে উড, সাবিত্রী, গোলক বসু ও চাষী রায়ত এই চারটি ভিন্ন ধরনের ভূমিকায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও যুগস্রষ্টার সম্মান লাভ করলেও অর্ধেন্দুশেখরের প্রতিভা সে তুলনায় কোনো অংশে ন্যূন ছিল না। স্বাদেশিকতা ও নাট্য প্রচারের আবেগে অর্ধেন্দুশেখর যথার্থই 'মিশনারি অব দ্য বেঙ্গলি স্টেজ' খ্যাতির অধিকারী। তাঁর *'মুস্তাফি সাহেবকে পাকা তামাশা'* স্বাদেশিকতার আবেগেই ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে হাস্যকৌতুকে বাঙালিকে উদ্দীপিত করত শ্রেণীঘৃণা প্রকাশে। মিশনারি অর্ধেন্দুশেখরের তুলনায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন অনেক বেশি প্রফেশনাল। স্বাধীনতা সংগ্রামে গিরিশচন্দ্র আবেগ দ্বারা চালিত হননি। থিয়েটার যেহেতু তাঁর পেশা ও পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে উঠল, তাই *'নীলদর্পণ'* কেন্দ্রিক ন্যাশনাল থিয়েটার পর্ব পার হয়ে পাবলিক থিয়েটারের আবর্তে পরে গিরিশচন্দ্র স্বাদেশিক আবেগে রঙ্গালয়ের নাম না রেখে রাখলেন স্টার, মিনার্ভা ইত্যাদি। অপর দিকে ন্যাশনাল থিয়েটারের অপর অংশ শরৎচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে রঙ্গালয় গড়ে নাম রাখলেন বেঙ্গল থিয়েটার। সেই থিয়েটারই ১৮৭৬-র কালাকানুনের ধাক্কায় তার লয়ালটি প্রমাণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে খেতাব পেয়ে হল রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কবরে প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করে ১৮৮১-র ১লা জানুয়ারি। প্রথম দিককার নাট্যরচনা থিয়েটার বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে 'ধর্মপ্রাণ বাঙালি'র আবেগে নাড়া দিয়ে পৌরাণিক নাট্যরচনা ও প্রয়োগে পুরোপুরি প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন। পরে যখন ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বর্শামুখে ইংরেজ সরকার রীতিমতো বিব্রত, তখন গিরিশচন্দ্র পরপর তিনখানি দেশপ্রেমিক আবেগের নাটক রচনা করলেন *'সিরাজদ্দৌলা'* (১৯০৬), *'মীরকাশিম'* (১৯০৬) ও *'ছত্রপতি শিবাজী'* (১৯০৭) সবই পেশাদারি দক্ষতায়। ন্যাশনাল থিয়েটার পর্বের *'নীলদর্পণ'* উগ্র দেশাত্মবোধক নাটক প্রযোজনায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩-এ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *'ভারত মাতা'* শীর্ষক একটি রূপক নাটকের দৃশ্যাভিনয় দীনবন্ধুর *'জামাই বারিক'* প্রদর্শনের পর অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য 'দৃশ্যের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোর্তৃগণ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে মধ্যেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সেদিন ন্যাশনাল থিয়েটার যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন, ও এমন একটি শিক্ষালাভ

করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিনকালে বিনষ্ট হইবে না।' দেশাত্মবোধক আবেগ দেশবাসীর মনে তখন ঘনীভূত হতে শুরু করেছে বলেই উচ্চকিত হাসির প্রহসনের পরেই ভাবগম্ভীর বিষয়ে সমাবিষ্ট দর্শকমণ্ডলীকে ১৫ মিনিটের *'ভারত মাতা'*র দৃশ্যাভিনয়ে জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। ঐ মঞ্চেই পরের দিন *'নীলদর্পণ'* অভিনয়ের আগে *'ভারত রাজলক্ষ্মী'* প্রদর্শিত হয়। নাটিকার নামেই স্পষ্ট দেশপ্রেমিক আবেগকে বাংলা থিয়েটার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। 'ভারতমাতা'র রূপকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গান বিশেষ মাত্রা যোগ করে। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় যে দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন, তার নাম *'ভারতে যবন'* (১৮৭৪)। এটি অভিনীত হয়েছিল গ্রেট ন্যাশনালের উদ্যোগে ১৮৭৪-র ১০ই অক্টোবর। পৌরাণিক নাটকের আবরণে দেশাত্মবোধক নাটক লেখার দৃষ্টান্ত প্রথম স্থাপন করেন নাট্যকার মনমোহন বসু তাঁর *'হরিশচন্দ্র'* নাটকে (১৮৭৩)। মনমোহন বসুও হিন্দুমেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই মেলার জন্য তাঁর রচিত সংগীত 'দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন' গানটি এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজ সরকার উপর্যুপরি কর চাপানোর মাধ্যমে যে ভাবে দেশবাসীকে শোষণ করছিল, সে সব ব্যবস্থার সমালোচনা করে *'হরিশচন্দ্র'* নাটকের জনপ্রিয় গানটি হল :

> 'দে কর, দে কর, রব নিরন্তর, করের দায়ে অঙ্গ জবজব।
> সিন্ধুবারি যথা ঘুষে দিন কর, শোণিত শোষণ করে শতকর।'

নতুন নাট্যকার হরলাল রায় তাঁর প্রথম নাটক *'হেমলতা'*য় পরাধীন দেশের সার্বিক যন্ত্রণা ও গ্লানির উন্মোচন ঘটিয়ে তার অবসানকল্পে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন পরাধীনতা বিমুক্ত হতে। ন্যাশনাল থিয়েটারের দল ভাঙার পর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ঐ দলের যে অংশ ন্যাশনাল থিয়েটার নামে সক্রিয় ছিল তাঁরাই *'হেমলতা'*র প্রথম প্রদর্শন করেন ১৮৭৩-র ১৩ই ডিসেম্বর। *'হেমলতা'*র বেশ কয়েকটি অভিনয় ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনালে হয়েছিল। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন রচনা করেছিলেন *'বাজারের লড়াই'* নামে। কলকাতার হগ মার্কেট বনাম হীরালাল শীলের ধর্মতলার বাজার দখলের লড়াই নিয়ে এ প্রহসনে সরাসরি তৎকালীন কলকাতার পৌরসভার ইংরেজ চেয়ারম্যান স্টুয়ার্ট হগকে আক্রমণ করা হয়েছিল। বাজার দখলের লড়াইয়ে যেনতেন প্রকারে জেতাই হল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতির মূল কথা। ন্যাশনাল থিয়েটার ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার যখন অল্পদিনের জন্য একত্রিত হয়েছিল তখন এই প্রহসনটি দুরাত অভিনীত হয় ২৪শে জানুয়ারি ১৮৭৪ ও ঐ বছরেই ১১ই ফেব্রুয়ারি। প্রহসনের তৎকালীন সমকালীনতার মাত্রা স্পর্শ করেও *'বাজারের লড়াই'* এই ১৯৯৭ সালেও সমান উপভোগ্য তার বিষয় ও সংলাপ ও নাট্যরচনা কৌশলের জন্য। পশ্চিমবঙ্গ *'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা'*য় নাটিকাটি পুনর্মুদ্রিত

হয় ও বাংলা থিয়েটারের দুশো বছরের স্মরণ উৎসব উপলক্ষে তরুণ পরিচালক নাট্যরঙ্গের স্বপন সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রযোজিত হয়েছে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুরের উদ্যোগে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে নিজস্ব নাট্যশালা নির্মাণ করে ফেললেন বিডন স্ট্রিটে। ১৮৭৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বোধন হয়। এই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসুর সঙ্গে আবার গিরিশচন্দ্ররা এসে যুক্ত হন। গ্রেট ন্যাশনাল কোনো সময়েই সুস্থিরভাবে না চললেও দেশাত্মবোধক নাট্য প্রযোজনায় এঁদের বিরাট উৎসাহ ছিলই—এই মঞ্চেই *'নীলদর্পণ'*-এর পাশে *'ভারতমাতা'*, *'হেমলতা'*-র অভিনয় যেমন হয়েছে তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'পুরুবিক্রম'* (১৮৭৪), হরলাল রায়ের নতুন নাটক *'বঙ্গের সুখাবসান'*, কুঞ্জবিহারী বসুর *'ভারত অধীন'* অভিনীত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ দাসের ইংরেজ বিদ্বেষী রাজনৈতিক ভাবধারার জনপ্রিয় নাটক *'শরৎ সরোজিনী'* (১৮৭৪), *'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'* (১৮৭৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'সরোজিনী'* (১৮৭৬), অমৃতলাল বসুর *'হীরকচূর্ণ নাটক'* (১৮৭৫) এবং সেই বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রহসন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬), নাম বদলিয়ে *'গজদানন্দ'*, *'কর্নাটকুমার'*, *'হনুমান চরিত'* ও *'পুলিশ অব পিগ এন্ড শিপ'* নামক সরাসরি আক্রমণাত্মক প্রহসন।

বাংলা থিয়েটারে ন্যাশনাল-নামের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে যদি পরাধীন দেশের স্বাধীন থিয়েটার রূপে ভাবা যায়, তবে উপেন্দ্রনাথ দাসের নেতৃত্বে *'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'* থেকে *'পুলিশ অব পিগ এন্ড শিপ'* প্রহসনের অভিনয় প্রচেষ্টার পর্ব পর্যন্ত আমাদের বিবেচনা করতে হয় যে এই ১৮৭৬-র ১লা মার্চ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার স্বাধীন থিয়েটার ছিল। তারপরই ব্রিটিশ সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলা থিয়েটারের স্বাধীনতা হরণ করতে।

বাংলা থিয়েটারে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামী মেজাজ বলতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা উপেন্দ্রনাথ দাসের আবির্ভাবে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ঝলসে ওঠে। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতার বহুবাজার এলাকার সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান। পিতা শ্রীনাথ ছিলেন হাইকোর্টের নামজাদা উকিল। উচ্চশিক্ষিত পারিবারিক আবহাওয়ায় উপেন্দ্রনাথের মনে জ্ঞানান্বেষণ ও সমাজসংস্কারের বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। খানিকটা যেন বা মাইকেলের মতন উল্কাসদৃশ গতিতে। *'সোমপ্রকাশ'* সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের প্রভাবে উপেন্দ্রনাথ প্রথমেই বিধবাবিবাহ সমর্থনে এগিয়ে যান। পিতার অমতে নিজেও প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের সময় বিধবা বিবাহ করেন। এ বিবাহে শিবনাথ শাস্ত্রী সহায়তা করেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সংস্কারমুখী ক্রিয়াকলাপের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও বিশেষ স্নেহধন্য হন।

সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবে ন্যাশনাল থিয়েটার তখন কলকাতায় যে আন্দোলন তুলেছিল, সে আন্দোলনকে সংগ্রামের শীর্ষচূড়ে নিয়ে যান উপেন্দ্রনাথ। ১৮৭৪ সালে উপেন্দ্রনাথ *'শরৎ সরোজিনী'* রচনা করেন। নায়ক শরৎ জমিদার, দেশোদ্ধার ব্রতে উৎসর্গীত প্রাণ। সরোজিনী শরৎকুমারের গৃহপালিত কন্যা। সুকুমারী শরৎকুমারের ভগ্নী। নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে বনকুনন্দর সঙ্গে শরতের কথোপকথন :

নন্দ। আমাদের দেশে অভিনয় দেখতে যাওয়া না কি নূতন প্রথা আবম্ভ হয়েছে, লোকে মনে করে যে যেটায় হোক একটায় গেলেই হল। ভাল মন্দ বিবেচনা নাই। কোনটায় হয়ত দৃশ্যপট নেই বল্লেই হয়, খানকতক ছেঁড়া নেকড়া মাত্র। কোন খানে বা ঐক্যতান বাদ্যের এমনি সুমধুর ধ্বনি উঠছে, যে কানে গেলে, আমরা ত আমরা, মড়া মানুষ পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে পালায়। আবাব কোনটায় হয়ত অভিনেতা একজন এমনি মদ খেয়ে আসরে নেমেছেন, যে মুখ দিয়ে বাবুর কথা সরছে না, ঢলে পড়তে পড়তে রহে যাচ্ছেন। এপাশ ওপাশ থেকে অন্যান্য অভিনেতারা কত ধমকাচ্চে, আর গালাগালি দিচ্ছে, কেবল মারতে বাকী রেখেছে বল্লেই হয়- দর্শকেবা পর্যন্ত তা শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু বাবুটির কিছুতেই সংজ্ঞা হচ্ছে না। (শরৎবাবুর প্রতি) ছবিতে বেশি ভুল হল কি ?

শরৎ। আমার, মহাশয়, অভিনয় দেখতে বড় একটা যাওয়া আসা নেই; আমি বলতে পারিনে কোন্টা ভাল, কি কোন্টা মন্দ- কি কার কি দোষ।

বিপিন। কেন, আপনি কি একেবারে অভিনয় দেখতে যাওয়াই মন্দ বলেন নাকি ?

শরৎ। না, তা ঠিক বলিনে বটে, কিন্তু তারই কাছাকাছি। আমাদেব নাটক লেখকেরা আব অভিনেতারা এক প্রণয় নিয়েই ব্যতিব্যস্ত তাঁদের আদিতে প্রণয়, মধ্যে প্রণয়, অন্তে প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়।

বিপিন। কেন বিশুদ্ধ প্রণয়ের অভিনয় কি মন্দ ?

শরৎ। প্রণয়ের অভিনয় কেন, আমার মতে প্রণয়ই মন্দ।

নন্দ ও বিপিন। (সবিস্ময়ে) সে কি, আপনি বলেন কি! আশ্চর্য করলেন যে! জিজ্ঞাসা কবি, আপনি কি কখনও বিবাহ করবেন না ?

শরৎ। না, কখনও না, জীবন থাকতে না। আচ্ছা, সে কথা এখন যাক। আপনাদের প্রশ্ন করি, যে পচা পুরাণ প্রণালীতে অভিনয়মঞ্চে আজকাল প্রণয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, তাতে কি উপকার দর্শে ? সেই কোকিল, সেই চন্দ্র, সেই রতিপতি, সেই পঞ্চশর, সেই বসন্তকাল, সেই মলয় পবন- আর যার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে, সেই মানভঞ্জন। বন্ধুবর নবগোপাল বাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল, বলতে হাসি পায়। তিনি বলেন কি, যে আজকাল কি অভিনয় হয়, না – "বিধুমুখি তোমার মুখ চন্দ্র দেখে আমার মনপুষ্প প্রস্ফুটিত হল।" মহাশয়েরা, এ দেখে কি হয় ?

নন্দ। নাটকে প্রণয়ের মূর্ত্তি যে এত অধিক অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায়, তার নিগূঢ় কারণ আছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রণয় আমাদের সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি।

শরৎ। পশুদের হতে পারে, মানুষের নয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। আর তাই যেন হল, প্রণয় মত্ত হবার কি এই সময় ? আমাদের ঘৃণা নাই ? গরু-গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না ? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না ? শরীর উত্তপ্ত হয় না ? মনে ধিক্কার জন্মায় না ? এখন অন্য ইচ্ছা ? অন্য অভিলাষ ?

নন্দ। তবে বন্দুক ধরুন না কেন ?

শরৎ। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত) এখন সময় হয়নি।

নন্দ। শীঘ্র হবে ?

শরৎ। আমরা যে হতভাগ্য কাপুরুষের জাত, দুশো তিনশো বৎসরের মধ্যে যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না। কিন্তু যত দিন না ভারতে স্বাধীনতা সূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিত মুণ্ডু আমরা ভূতলে লুণ্ঠিত, দলিত, করতে পারি, ততদিন যে প্রণয়, কি অন্য কোন প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, সে কৃতঘ্ন-পামর-নরাধম-দেশের কুসন্তান।

এমন সরাসরি তৎকালীন বাংলা থিয়েটারের সমালোচনা তার সঙ্গে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরোধিতা উপেন্দ্রনাথের *'শরৎ সরোজিনী'*র অভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তুলল। সুকুমারীর ভূমিকায় সেকালের গোলাপ-সুন্দরীর প্রাণঢালা অভিনয়ে গোলাপসুন্দরী বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তাঁর নামই হয়ে গেল সুকুমারী। এই সুকুমারীকে তাঁর পতিতা জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য উপেন্দ্রনাথ গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অভিনেত্রী সুকুমারীর এ সৌভাগ্য তৎকালীন সমাজ মেনে নেয়নি।

উপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক *'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'* (১৮৭৫) গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভাঙা দল ধর্মদাস সুরের সংগঠিত দ্য নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটারের পতাকাতলে বেঙ্গল থিয়েটারে ঐ বছরের ১৪ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। *'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'*-র অভিনয়ে ব্রিটিশ সিংহের ঘুম ভাঙে। এ নাটকে ম্যাক্রেন্ডেল সাহেবকে বংশবাটির সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রহৃত হতে দেখা যায় তার অপকর্মের জন্য।

ইংরেজ ওত পেতে থাকে, আর উপেন্দ্রনাথও মুখোমুখি সংগ্রামের জন্য তৈরি হন। সুযোগ এসে যায়। ইংলন্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধিত করার জন্য ইংরেজভক্ত বাঙালির অভাব ছিল না। হাইকোর্টের উকিল ভবানীপুর নিবাসী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজের অভীপ্সা অনুযায়ী অন্তঃপুরের নারীদের দ্বারা তাঁর সম্বর্ধনা দেন। এ ঘটনায় সারা কলকাতায় ধিক্কার ধ্বনিত হল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *'বাজিমাত'* কবিতা লিখে পর্দানশিন অভিজাত পরিবারের নারীদের নন্দিত করলেন : আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে। বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে'। আর উপেন্দ্রনাথ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রহসন মঞ্চস্থ করলেন *'গজদানন্দ ও যুবরাজ'* এই নামে ১৮৭৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *'সরোজিনী'*র সঙ্গে। দ্বিতীয় অভিনয় হল ২৩শে ফেব্রুয়ারি *'সতী কি কলঙ্কিনী'*র সঙ্গে। ইংরেজ সরকার এর অভিনয় বন্ধ করার হুকুম দিলেন রাজশক্তির প্রতি বিদ্রূপ করার অপরাধে। উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল গেরিলা কায়দা নিলেন, নাম বদলিয়ে অভিনয় করলেন *'হনুমান চরিত'*, *'কর্ণাটকুমার'* নামক নতুন নাটকের সঙ্গে। অভিনয় তারিখ ১৮৭৬ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি। উপেন্দ্রনাথের এ কৌশল পুলিশ সুপার চার্লস ল্যাম্ব ও পুলিশ কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ [পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি] ধরে

ফেলেন। উপেন্দ্রনাথ এই পুলিশি আক্রমণকে ব্যঙ্গ করে ১লা মার্চ মঞ্চস্থ করলেন *'দি পুলিশ অব্ পিগ এন্ড শিপ'*। সঙ্গে থাকল *'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'* ও শাণিত ইংরেজিতে উপেন্দ্রনাথের রাজশক্তিতে আক্রমণ করে উদাত্ত ভাষণ। লর্ড নর্থব্রুক গৃহীত প্রজার অপমান তদীয় সান্ত্রীরক্ষকের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিরুদ্ধে ১৮৬১-র ইন্ডিয়ান কাউনসিল অ্যাক্টের ২৩ ধারা অনুসারে বাংলা থিয়েটারের ঔদ্ধত্যের প্রতি শাস্তি নির্দেশ করলেন। ১৮৭৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি অর্ডিন্যান্স কন্ট্রোল বিল এনে কাউনসিলে পেশ করে আইনে পরিণত করলেন। এই কালাকানুন বাংলার ন্যাশনাল থিয়েটার পর্বের স্বাদেশিকতার আবেগকে আপাতত স্তব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট বলে অচিরেই প্রমাণিত হল।

ন্যাশনাল থিয়েটার পর্ব শেষ হল। বাংলা থিয়েটারে এলো পাবলিক থিয়েটারের পর্ব। এ পর্বে বাংলার নাট্যকার ও প্রয়োগশিল্পীরা ভিন্ন কৌশল নিলেন, কিন্তু ততদিনে দেশের রাজনৈতিক প্রতিরোধী শক্তি নানান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করছে। এবং সেইসব সংগ্রামের বিভিন্ন মোড় ফেরা ঘটনার তুঙ্গ মুহূর্তে বাংলা থিয়েটারের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে, শাসকশ্রেণী আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে, স্বাধীনতা অর্জন, রক্ষা ও তাকে বিকশিত করার জন্য বাংলা থিয়েটার দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আলো অন্ধকারে আজও লাইমলাইটে আছে।

[*যুবশক্তি*, শারদ ১৪০৮, পৃ: ১৯ ২৪]

স্বাধীনতা–উত্তর বাংলা থিয়েটার : প্রথম দশক ১৯৪৭–১৯৫৭

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট সদ্য স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলার বুকে কলকাতা মহানগর। কলকাতার বিশিষ্ট রঙ্গালয় শ্রীরঙ্গমে সেই সন্ধ্যায় শিশিরকুমার আয়োজন করেছেন তুলসী লাহিড়ীর *'দুঃখীর ইমান'* অভিনয়ের। ঠিক একবছর আগে ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যায় কলকাতা হিন্দু-মুসলমানের রক্তে হোলি খেলায় মেতে উঠেছিল কুরাষ্ট্রের মূঢ় চক্রান্তে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই স্মৃতির দগদগে ঘা-র ওপরেই উৎসবের জোয়ারে এই ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট উল্লাসে মেতে উঠেছে কলকাতাসহ সারা দেশ।

মাততে পারেনি সদ্য স্বাধীন দেশের সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটবিবেক শিশিরকুমার। আর তাঁর স্বপ্নের শ্রীরঙ্গম। এই সন্ধ্যার এবং পরবর্তী আরও পাঁচটি স্বাধীনতা দিবসের উৎসব রজনীর নিখুঁত ছবি তুলে রেখেছেন ১৯৫২-য় প্রকাশিত অরুণ রায় ও সজল রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক *'থিয়েটার'* পত্রিকার একটি প্রতিবেদন।[১] এই প্রতিবেদন সূত্রেই জানতে পারি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গমে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার *'দুঃখীর ইমান'* অভিনয়ের প্রারম্ভে একটি ভাষণ দেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে শিশিরকুমার বললেন :

'এ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনও মাউন্টব্যাটেনের হাতে। অহিংস আন্দোলনে এই ক্ষমতা লাভ হয়নি। ইংরাজ যখন দেখল—ভারতের জনতা ব্যাপকভাবে যে কোনো উপায়ে (নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্তি আন্দোলন) ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তখন তারা পিছু হটেছে।'

এই প্রতিবেদনে এরপর লিখছে : 'এই প্রসঙ্গে তিনি ভিয়েৎনাম ও ইন্দোনেশিয়ার উল্লেখ করেন। মঞ্চ সম্পর্কে তিনি বলেন বাংলাদেশের মঞ্চ থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তার জন্যই সেন্সর প্রথা এত কঠোর। কাজেই তিনি দাবি করেন যে সমস্ত নাটকের উপর বাধানিষেধ আছে তা তুলে নেওয়া হোক এবং পুলিশ দারোগার হাত থেকে নাট্যসাহিত্য বিচারের ভার কেড়ে নেওয়া হোক।'

প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায় : 'শিশিরকুমারের এই বক্তৃতায় সেদিন দর্শক উল্লাস প্রকাশ না করলেও আপত্তি করেনি। এবং তারপর বছরের পর বছর শিশিরকুমার নিজের মঞ্চ

থেকে ১৫ই আগস্ট এইসব কথা বলে থাকেন। গত বছর তিনি বলেন যে তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বলবেন—'এ স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা'।

সময়ের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকলাবিদ্ সুকুমার কলাশিল্পীকে যখন এই রাজনীতিক প্রতিবাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সন্ধ্যায়, তখনই বোঝা যায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা থিয়েটারের মূল প্রবণতার অভিমুখ কোনদিক ধাবিত হতে চলেছে।

অতীতে আমরা দেখেছি পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলা নাটক ও থিয়েটারের একটি মৌল প্রবণতাই ছিল স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে, তার প্রস্তুতিকে কোনো না কোনো ভাবে দর্শক তথা দেশবাসীর মন-মনন-ধ্যানের বিচিত্র ভাবলোকে নিরন্তর গেঁথে যেতে। শিশিরকুমারের প্রথম দিনের ভাষণে সে কথা সোচ্চারে তাই ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা প্রায় ৯০ বছরের (১৮৫৭-১৯৪৭) রণরক্ত ব্যর্থতার পর তার করায়ত্ত হল, দেখা গেল, এই ভাঙাচোরা জীর্ণ জোড়াতালি দেওয়া কায়াহীন ছায়ার স্বাধীনতা তো তার কাঙ্ক্ষিত ছিল না। ফলে লক্ষ্যপূরণের সাফল্যের বিনিময়ে তাকে যে ত্যাগ করতে হয়েছে, সেই ত্যাগের বাধ্যবাধকতা আনন্দের পরিবর্তে নিয়ে এল হতাশার ক্রন্দন।

১৯৪৭-এর স্বাধীন ভারতের বাংলা নাটক ও থিয়েটার তাই নিরন্ন বুভুক্ষু বঞ্চিত উদ্বাস্তু বাঙালির বাস্তব জীবনের হাহাকারে দীর্ণ করে তুলল স্বাধীনতার স্বপ্নিল রঙিন ছবিটিকে।

বাংলা থিয়েটারের মৌল প্রবণতা স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগী আবেগের চটজলদি চরিত্রবদল ঘটল রাজনৈতিক স্বাধীনতার চুলচেরা বিশ্লেষণে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে স্বাধীনতা ও শ্রেণীশাসন দুষ্ট হতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ছাড়া স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা।

শুরু হল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা থিয়েটারের প্রকৃত রাজনীতিকরণ। যার সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ বৎসর আগে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট জুড়ে মার্কসীয় দর্শনে ব্যাপক গণমানুষকে সংগঠিত ও উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে ততদিনে আবির্ভাব ঘটে গেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের। গণনাট্যের ভাবাদর্শে বাংলা নাটকের রচনা ও প্রয়োগে *'নীলদর্পণ'*-এর মডেলটি *'নবান্ন'*-র মধ্যে বাস্তবপ্রতিম জীবন্ত হয়ে উঠল। এ ঘটনা ঘটেছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গণনাট্য সংঘের সংগঠিত উদ্যোগে। পেশাজীবী ও অপেশাজীবী উভয়কুলের নাট্যশিল্পীদের নিয়ে এ এক যৌথমঞ্চ। ওদিকে *'নবান্ন'*র প্রেরণায় সাধারণ রঙ্গালয়ের বলিষ্ঠ পরিচালক শিশিরকুমারও মঞ্চস্থ করালেন তুলসী লাহিড়ীর *'দুঃখীর ইমান'* ১৯৪৬ সালে।

সময়ের উত্তাপে শিল্পীর আভিজাত্য খসে পড়ছে। শিশিরকুমার কর্তৃক *'দুঃখীর ইমান'* প্রযোজনার এমন অর্থ করলে ভুল হবে, আসলে উচ্চ শিল্পাদর্শ তাড়িত শিশিরকুমারের

অন্তর্গূঢ় আবেগের কেন্দ্রে তো পরাধীন দেশের আপামর মানুষ। তা সেই মানুষই যখন কুরাষ্ট্রিক মূঢ় ষড়যন্ত্রে পথের ভিখারি, কিংবা রক্তনদী সাঁতরে পার হওয়া রাম-রহিম, তখনই তাঁকে *'সীতা'*, *'সিরাজদ্দৌলা'*, *'তখৎ-এ তাউস'*, *'ষোড়শী'*র বাইরে *'নবান্ন'*, *'দুঃখীর ইমান'*-এর জগতে সাড়া দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের ব্যবসার স্বার্থ ভুলে সংগ্রামের মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতা দিবসের উপর্যুক্ত ভাষণ থেকেই আমরা বুঝে যাই গণনাট্যের আদর্শই স্বাধীন ভারতের বাংলা থিয়েটারের মূল ধারা হয়ে উঠবে। আর সাধারণ রঙ্গালয় শিশিরকুমারের ওই ভাষণ শোনার পরেও যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, আপত্তিও করে না, সম্মতিও দেয় না, তখন বোঝা যায় সাধারণ রঙ্গালয় আর নিজের ঐতিহ্যবাহী আদর্শের পথে স্থির থাকতে পারবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা থিয়েটারের বাঁচা-মরার ব্যাপারে আদৌ চিন্তিত নন। সাধারণ রঙ্গালয়কে বাঁচতে হলে তাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার সন্দেশভোগী বাবু আধাবাবু ফড়িয়াদের মনোরঞ্জন করেই বাঁচতে হবে।

তাই ১৯৫২-য় শ্রীরঙ্গম থেকে শিশিরকুমার যখন তাঁর ওই ভাষণ দিচ্ছেন, তখন দেখা যাচ্ছে তার একবছর বাদেই স্টার থিয়েটারে ১৯৫৩ অক্টোবরে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার আকর্ষণীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রে রেখে *'শ্যামলী'* নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে আদর্শবাদী সাধারণ রঙ্গালয় ক্রমশ বাণিজ্যিক রঙ্গালয় হয়ে ওঠার পথে পা বাড়াচ্ছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে *'দুঃখীর ইমান'* মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের শেষ মধ্যমণি শিশিরকুমার যেমন ভুয়া স্বাধীনতার মুখোশ খুলে দিয়ে সাধারণ জনমানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, তেমনই সাধারণ রঙ্গালয়ের এই সময়ের শেষ জনপ্রিয় নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকেও ১৯৪৮ সালে *'কালোটাকা'*, ১৯৪৯ সালে *'এই স্বাধীনতা'* রচনা করে খণ্ড স্বাধীনতার ব্যর্থতার প্রতি ধিক্কার ঘোষণা করতে হয়। শচীন্দ্রনাথ যুগের স্পন্দন অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তার অসুবিধা হয়নি।[২] বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বাংলা নাটক সব সময়ে কেবলই যে যুগের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে এসেছে তা নয়, অনাগতের আভাসও দিয়েছে এবং সবসময়েই মানবতার জয়গানই গেয়েছে।[৩] শচীন্দ্রনাথের এ কথা যথার্থ হয়ে ওঠে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ও প্রয়োগ সম্পর্কে। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গণনাট্য আন্দোলন যে নতুন নাট্যধারা নিয়ে এল গণদাবিকে প্রাধান্য দিয়ে, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন সহযোগ এইভাবেই নতুন যুগের নাট্যলক্ষণকে তীক্ষ্ণ ও তীব্র করে তুলল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'বাস্তুভিটা'* (১৯৪৭), ঋত্বিক ঘটকের *'দলিল'* (১৯৫১), সলিল সেনের *'নতুন ইহুদি'* (১৯৫১) স্বাধীনতার ফলশ্রুতি দেশবিভাগের যন্ত্রণা ও উদ্বাস্তু জীবনের লাঞ্ছনাকে যেমন প্রকট করে তুলল, তেমনই গরিব কৃষকের সংগ্রামী আন্দোলন নিয়ে অনিল ঘোষের লেখা *'নয়ানপুর'* (১৯৪৮), সলিল চৌধুরীর *'সংকেত'* (১৯৪৯)

সংগ্রামী গণআন্দোলনে মধ্যবিত্ত কীভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত দিয়ে গণনাট্য সংঘের এইসব ব্যাপক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটি বাস্তবধর্মী প্রতিবাদী নাট্যধারা স্বাধীনতার প্রথম দশক জুড়ে বাংলার মূল নাট্যধারা হয়ে উঠল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই মূলধারার রচনা ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সময়ের থিয়েটারের স্বরূপ জেনে নিতে পারব।

৩

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সাংগঠনিক দিক থেকে প্রথম এক দশক স্পষ্টত দুই ধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য যা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ। আর ১৯৫৩ থেকে বাণিজ্যিক লক্ষ্যে চলচ্চিত্রধর্মী প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে সাধারণ দর্শকভোগ্য হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে নাটক রচনার দিকে মেলোড্রামা সৃষ্টির অতিরিক্ত কিছু হয়নি। আর ১৯৫৩ থেকে ক্রমাগত উপন্যাসের নাট্যরূপদান অনেকটাই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যরচনায় পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয় ধারা গণনাট্যের ধারা। নাটক রচনা ও প্রয়োগের দিকে বাস্তব জীবনভিত্তিক হওয়ার ফলে চেনাজানা নিত্য পরিচিত জীবনযাপনের ঘটনার মধ্যেই যে এত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকতে পারে, তা ইতিপূর্বে যেন আমাদের অজানা ছিল। বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, সলিল চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বনফুল ও তরুণ রায় এই পর্বের সফল নাট্যকার। সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের মধ্যে শচীন সেনগুপ্ত গণনাট্যর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে নাটক কয়টি লিখেছেন, সেগুলি বিষয়ে প্রগতিপন্থী হলেও রচনাকৌশলে কেতাবি সংলাপ সর্বস্ব হওয়ায় নাটক কয়টি রচনা ও প্রয়োগ উভয় দিকেই ব্যর্থ। মন্মথ রায় ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক রচনার এলাকা ছেড়ে সমকালীন হবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সাফল্য পাননি। তুলনায় বিধায়ক ভট্টাচার্য সাধারণ রঙ্গালয়ের পুরাতন ধারা, বাণিজ্যিক ধারা এবং এই দুই ধারার বাইরে গণনাট্য ধারায়ও কয়েকটি একাঙ্ক লিখে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত যে সব নাটক রচিত হয়েছে তার মূল উৎস ওই ১৯৪৩-৪৪-এর গণনাট্য *'আগুন-জবানবন্দী-নবান্ন'*।

এই ধারার নাট্যরচনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতা সৃষ্টি একটি বড় লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ হল মুখের ভাষার মতো সহজ, স্বাভাবিক সংলাপ, প্রবহমান, কখনও কাটাকাটা। তৃতীয় লক্ষণ বেশভূষা রূপসজ্জা সব বাস্তবোচিত। চতুর্থ লক্ষণ নাটকের প্রধান চরিত্র সব সাধারণ মানুষ। নায়কের বদলে প্রতিবাদী সাধারণ মানুষই সেই স্থান দখল করল। পঞ্চম লক্ষণ নাট্যদ্বন্দ্ব ব্যক্তিসমস্যা অথবা পারিবারিক সমস্যা বনাম সামাজিক বৃহত্তর সমস্যার মধ্যে আবর্তিত হয়ে সামাজিক বৃহত্তর সমাধানের ইঙ্গিতে নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

এ সব নাটকের প্রয়োগে রচনাগত বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে মিলিয়ে অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসংগীতে বাস্তবতার বিশ্বস্ত উপস্থাপনই ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অভিনয়ে মুখের ভাষা বলার স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে সংলাপ প্রক্ষেপণ করার রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল নাট্যদৃশ্যর চরিত্র সংস্থাপন, চলন-বলনের মধ্যে সর্বদা একটা ছবির পর ছবি তৈরির দিকে লক্ষ রাখা হত। বিশেষত বহু মানুষের জমায়েত কেন্দ্রিক দৃশ্য সংস্থাপনে একটা নাটকীয় উৎকণ্ঠা বা সমবেত প্রতিজ্ঞার ছবি ত্বরান্বিত বিন্যাসে সাজানো হত। সোভিয়েত চিত্র ও ভাস্কর্য এইসব ভিড়ের দৃশ্যরচনার মডেল হিসেবে কাজ করত। চতুর্থত মঞ্চসজ্জায় প্রতীকী বাস্তবতা এবং আলোক প্রক্ষেপণে নাট্যোক্ত সময় ও পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি করা হত। নাট্যদ্বন্দ্ব না চরিত্রের মানসিকতা বোঝানোর জন্য আলোর কুশলী প্রয়োগে সেই মুহূর্তগুলিকে তীক্ষ্ণ ও ব্যঞ্জনাময় করে তোলা হত। পঞ্চমত, নাটকে অযথা সংগীত প্রয়োগ বর্জন করে আবহ সৃজনের জন্য যতটুকু যে জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করলে বাস্তবতা ও নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে, তাই করা হত। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য, নাট্যপ্রয়োগে ব্যক্তিক অভিনয়ের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দানের সঙ্গে সঙ্গে গোটা নাট্যপ্রয়োগে গোষ্ঠী অভিনয় বা সংঘবদ্ধ অভিনয়ের দ্বন্দ্ব যাতে বিঘ্নিত না হয় সেইদিকে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত।

৪

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দশকে গণনাট্যর ভাবাদর্শে যে নাট্যধারা প্রচলিত হল এবং মূলধারা হিসেবে এতকালের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যধারাকে স্থানচ্যুত করল সেই সর্বভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন গণনাট্য সংঘ সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রথম ধাক্কা খেলো স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে। গণনাট্য সংঘ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন। শাসক কংগ্রেস স্বাধীনতালাভের পরের বছরই কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল। পার্টি যখন আক্রান্ত তখন তার গণসংগঠনও আক্রান্ত হবে এটাই প্রত্যাশিত। ১৯৪৮-এ ডিকসন লেনে গণনাট্য সংঘের দুই নাট্যধর্মী গুন্ডাদ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হলেন। চারদিকে ধরপাকড় দমনপীড়ন ও পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করার ঘটনা যখন নির্বিচারে ঘটতে থাকল, তখন দেখা গেল পশ্চিমবাংলার গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের কাজকর্ম প্রায় শূন্য। এমতাবস্থায় ৪৩-৪৪-এ যাঁরা গণনাট্য সংঘে যুক্ত হয়েছিলেন লেখক শিল্পী কুশলী হিসেবে, তাঁদের একটা বড় অংশই মূল সংগঠন ত্যাগ করে গণনাট্যর মূল ভাবাদর্শ মাথায় রেখেই পৃথক পৃথক নাট্যগোষ্ঠী গড়তে শুরু করলেন। প্রথমে শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে *'নবান্ন'* নাটকের একদল শিল্পী বেরিয়ে গিয়ে একবছর অপেক্ষা করে ১৯৪৯ সালে প্রথমে 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' নাম দিয়ে *'নবান্ন'* মঞ্চস্থ করলেন, পরে এই শিল্পীগোষ্ঠীই বহুরূপী নামে নিজেদের অভিহিত করলেন। এরই সঙ্গে এইভাবে বিজন

ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত হল ক্যালকাটা থিয়েটার ১৯৪৯ সালে। তুলসী লাহিড়ী, সবিতাব্রত দত্তের নেতৃত্বে নাট্যচক্র, অশনিচক্র, উৎপল দত্তের নেতৃত্বে লিটল থিয়েটার গ্রুপ ইত্যাদি। গণনাট্য সংঘের নেপথ্যে যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, তেমনই রিভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি সংক্ষেপে আর এস পি-র সাংস্কৃতিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল ক্রান্তি শিল্পীসংঘ। এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সলিল সেন, ত্রিদিব লাহিড়ী, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। ক্রান্তি শিল্পীসংঘ থেকেও পরে অন্য নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যেমন উত্তর সারথি, সাজঘর, রূপশিল্পী প্রভৃতি।

গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক শক্তি ও দুর্বলতা, কর্মসূচির মধ্যে নাট্যনির্মাণের চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতমানের শিল্পসৃষ্টির চাইতেও চটজলদি উপস্থাপনের পদ্ধতি অবলম্বন—এইসব প্রতিভাবান শিল্পীদের সংঘত্যাগে প্ররোচিত করেছে, এটা যেমন একটা মত, তেমনই আর একটা মতও প্রচারিত হয়েছিল যে শাসকশ্রেণীর দমন পীড়নের ভয়ে এবং শাসকশ্রেণী প্রদত্ত নানান সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতা প্রতিভাবান শিল্পীদের দলত্যাগে বাধ্য করেছিল। বিতর্ক এড়িয়েও এই তথ্যটুকু সত্য যে এইসব প্রতিভাবানেরা সংগঠন ত্যাগ করলেও সংগঠনের মূল আদর্শ অবলম্বন করেই স্বাধীনতার প্রথম দশক পর্যন্ত সৃষ্টির সংগ্রামে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। ফলে যে আদর্শ কেবল একটি সংগঠনের ক্রিয়াকলাপে প্রচার লাভ করত, তা একাধিক সংগঠনের মাধ্যমে সৃজনের স্বতস্ফূর্ততা নিয়ে তখন বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

গণনাট্য সংঘ ১৯৪৯ সনের এলাহাবাদ কংগ্রেসে সাংগঠনিক সংকট উপলব্ধি করে সিদ্ধান্ত নিলেন :

'গণনাট্য সংঘের বর্তমান অগ্নিপরীক্ষার সামনে পড়ে আরও অনেক পুরনো সভ্য হয়তো ছেড়ে চলে যাবেন। গণনাট্য সংঘ যখন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের মধ্যে স্থান করে নিতে বদ্ধপরিকর, তখন এইসব মুখোশধারী দরদীদের সরে পড়াই স্বাভাবিক। এইসব রক্তশোষক পরগাছা নির্মূল হলেই গণনাট্য সংঘের মঙ্গল।'

এলাহাবাদ সম্মেলনের প্রতিবেদনে ভাষার রূঢ়তা থাকলেও পরবর্তীতে দেখা গেল গণনাট্য সংঘ এইসব নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সহবত বজায় রেখেই চলেছেন। গণনাট্য সংঘের '*Unity*' পত্রিকার ১৯৫২-র জুলাই সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে শম্ভু মিত্র প্রেরিত বহুরূপীর কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে।[৫]

গণনাট্য সংঘ থেকে বিশ্লিষ্ট সংগঠন বহুরূপী-র ১৯৫৭ পর্যন্ত প্রযোজনা তালিকার দিকে লক্ষ রাখলেই দেখা যাবে সংঘের নাটক নির্বাচনের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বিতর্কের সুযোগ রেখেই গণনাট্য ভাবধারার অনুবর্তী হয়েই নাট্যপ্রয়োগ করা হয়েছে সচেতনভাবেই। ১৯৪৮-এ '*নবান্ন*' দিয়ে শুরু করে '*পথিক*' (১৯৪৯), '*উলুখাগড়া*' (১৯৫০), '*ছেঁড়াতার*' (১৯৫০), '*বিভাব*' (১৯৫১), '*চার অধ্যায়*' (১৯৫১), '*দশচক্র*'

(১৯৫২), *'স্বপ্ন'* (১৯৫৩), *'এই তো দুনিয়া'* (১৯৫৩), *'ধর্মঘট'* (১৯৫৩), *'রক্তকরবী'* (১৯৫৪), *'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাংকে'* (১৯৫৪), *'স্বর্গীয় প্রহসন'* (১৯৫৫), *'অংশীদার'* (১৯৫৫), *'চৌর্যানন্দ'* (১৯৫৬), *'নাট্যকারের বিপত্তি'* (১৯৫৬) এবং ১৯৫৭-য় *'ডাকঘর'* প্রযোজনা করার মধ্যে বহুরূপীর রাজনৈতিক বা সামাজিক দায়িত্ববোধ কী বামপন্থীদের চেয়ে খুব ভিন্ন বা নেতিবাচক ছিল ? বামপন্থীরা বহুরূপীর *'চার অধ্যায়'* বা *'দশচক্র'* প্রযোজনাকে তাদের প্রতি বহুরূপীর সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ করে যথেষ্ট সমালোচনা করেছে এই প্রযোজনা দুটির। কিন্তু বিপ্লবাত্মক ত্যাগব্রতী কর্মে বা সামাজিক কল্যাণ পালনের ক্ষেত্রে সমষ্টি বনাম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব কী অস্বীকার করা যায়? ১৯৫৩-য় সব চেয়ে বড় সত্য *'গণনাট্য'* পত্রিকায় *'দশচক্র'*-র উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল:

'বাংলা নাট্যজগতে বহুরূপী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হাল আমলের ইতিহাসে সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উৎকৃষ্ট কলানৈপুণ্যের সমাদর যে সর্বত্র, বিগত কিছুকাল ধরে যেখানেই তাঁরা অভিনয় করতে গেছেন, যে বিপুল সংবর্ধনা দর্শকসমাজ থেকে পেয়েছেন, তার থেকেই তা বোঝা যায়। যাঁরা নাট্যজগতে একঘেঁয়েমির বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো নাট্যজগতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, বিষয়বস্তু, শিল্পনৈপুণ্য এবং পরিচালনার অনবদ্য অর্থে 'বহুরূপী' সে দর্শক সাধারণের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন। অতীত অবদানের মধ্যে ছেঁড়াতারের অভূতপূর্ব সাফল্য এঁদের কৃতিত্বের যেমন পরিচায়ক, তেমনই তাঁদের সাম্প্রতিক নাটক 'দশচক্র' ও আংশিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অভিনয় এবং রুচিগত উৎকর্ষে সমুত্তীর্ণ। অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে অতি সামান্য মঞ্চসজ্জা ও আলোকব্যবস্থার সাহায্যে এত সার্থক নাট্যরূপ বহুদিন বাংলার তৃষিত জনসমাজের চোখে পড়েনি।'[৬]

'দশচক্র'-র বিষয়বস্তু বা বক্তব্য প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্নই এখানে তোলা হয়নি, বরং বহুরূপী সংস্থার আবির্ভাবকাল থেকে ১৯৫৩-য় প্রযোজিত *'দশচক্র'* প্রযোজনা পর্যন্ত একঘেঁয়েমি মুক্ত পরপর নতুন নতুন প্রযোজনায় দর্শক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করারই অতীব প্রশংসা করা হয়েছে। *'গণনাট্য'* নামক এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সলিল চৌধুরী। প্রকাশক ছিলেন সুরপতি নন্দী ও সমীরণ দত্ত যুগ্মভাবে। গণনাট্যর ভাবাদর্শের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব তখন অপ্রকট ছিল না। একদল ছিলেন পি সি যোশী-র অনুবর্তী উদারপন্থী, অপর দল বি টি আর অনুবর্তী উগ্র রাজনৈতিক ও রক্ষণশীল। মূল সংগঠনের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব ছিল বলেই সংগঠনের বাইরেও সদ্যোজাত বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর কাজকর্মের মধ্যেও শিল্পসৃষ্টি এবং সংগ্রামী লাইনের কূটতর্ক স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ দশক ধরেই বিদ্যমান রয়েছে।

যাই হোক, বহুরূপীর মতো অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীগুলিও সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী নাট্যরচনা ও প্রযোজনা করে গেছেন যাদের

সার্বিক যোগফল গণনাট্যের বিভিন্ন শাখা প্রযোজিত নাটকের আবেদনের সঙ্গে মিশে গিয়ে গণনাট্যের ভাবাদর্শকেই স্পষ্টগোচর করে গেছে। গণনাট্য সংঘ যে কেবল সমকালীন জ্বলন্ত সমস্যাকেন্দ্রিক বাস্তববাদী প্রযোজনা করে গেছেন তা নয়, তাঁরাও ধ্রুপদী রীতির নাটক নির্বাচন ও প্রযোজনা করেছেন; যেমন শেকস্‌পিয়রের *'মার্চেন্ট অব ভেনিস'* সুনীল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে গণনাট্যের গোয়াবাগান শাখা কর্তৃক; রবীন্দ্রনাথের *'বিসর্জন'* ও গোগোলের *'গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর'* অভিনীত হয়েছে গণনাট্যের অনুশীলন শাখার উদ্যোগে।

সাম্প্রতিক বাস্তববাদী নাটকের পাশাপাশি ধ্রুপদী বিন্যাসের নাটক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘের কয়েকটি শাখা যেমন সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা, নারীমুক্তির প্রশ্ন তার বিবেচনার মধ্যে আনতে পারল, তেমনই প্রয়োগের রীতিতেও বাস্তববাদী একঘেঁয়েমি থেকে নাট্যকলাকে অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যে উজ্জীবিত করতে পারল।

বিষয় ও আঙ্গিকের প্রশ্নে গণনাট্যের মধ্যে থেকে থেকেই যখন তর্ক ওঠে, তখন দেখা যায় ধ্রুপদী আঙ্গিকে রচিত ধনতন্ত্রের আগ্রাসী সভ্যতা বনাম কৃষিজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের ধ্বংস সাধনের নাটক *'রক্তকরবী'* বহুরূপী কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়ে সারা দেশে বিপুল আলোড়ন তুলল। নাট্যপ্রয়োগের এক কঠিন ধাঁধার আশ্চর্য সমাধান দেখা গেল শম্ভু মিত্রের প্রয়োগ কল্পনায়। নাট্যপ্রয়োগের ভাষায় *'রক্তকরবী'*-র মধ্য ফুটে উঠল পুঁজিবাদ ও আমলাতন্ত্র বিরোধী এক অভ্যুত্থানের ধ্রুপদী সংকেত। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের ভাষায় 'কম্যুনিস্ট নাটক'। এ প্রযোজনার পক্ষে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পীরা কলম ধরলেন। লিখলেন গোপাল হালদার, অরুণা হালদার, হিরণকুমার সান্যাল, শচীন সেনগুপ্ত, উৎপল দত্ত সহ আরও অনেকে।

১৯৪৪-এর *'নবান্ন'* আর ১৯৫৪-র *'রক্তকরবী'* এক দশকের মধ্যে এই দুইটি প্রযোজনার নিরিখেই গণনাট্য ভাবনার মঞ্চরূপের যেমন সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায়, তেমনই এই দুটি প্রযোজনার অভিনব মানবিক ও বুদ্ধিজৈবিক আবেদনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে নবনাট্য আন্দোলনের শ্লোগান। গণনাট্যের *'নবান্ন'* প্রযোজনার অভিনব বাস্তবতাকেই সমালোচক ও সাংবাদিকতার কলমে অতি উৎসাহে 'নূতন ধরনের নাটক', 'নব সাংস্কৃতিক আন্দোলন', 'জবানবন্দী বাংলার নাট্যধারাকে নূতন পথে চালনা করার ইঙ্গিত শুধু দিয়াছিল; নবান্নে সেই ধারা আরও অগ্রসর হইয়াছে'—এইভাবে বাংলায় গণনাট্য আন্দোলন বলতে 'নূতন নাট্য আন্দোলন' কথাটি প্রচলিত হয়ে যায়।

আর গণনাট্য সংঘের থেকে সংশ্লিষ্ট হয়ে শম্ভু মিত্র তাঁর ১৯৪৮ থেকে প্রায় সব লেখালেখিতেই গণনাট্য আন্দোলনকে 'নবনাট্য আন্দোলন' বলে অভিহিত করতে থাকায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা থিয়েটারের প্রথম দশকেই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে নবনাট্য আন্দোলন বিকল্প অবস্থান নিয়ে এক শ্লোগান হয়ে উঠেছিল। তবে এ কথা

ঐতিহাসিকভাবে সঠিক যে ১৯৫৭-র বহুরূপী-র *'ডাকঘর'* প্রযোজনা, এবং এই বছরেই লিটল থিয়েটার গ্রুপের *'নীচের মহল'*, প্রযোজনা, রূপকারের *'চলচ্চিত্তচঞ্চরী'* বা *'শান্তি'* মঞ্চায়ন, গন্ধর্ব-র *'সূর্যলগ্ন'* বা *'দলিল'*, শৌভনিকের *'মা'*, নটনাট্যম-এর *'মহেশ'* প্রযোজনায় গণনাট্য ভাবধারা আদৌ ক্ষুন্ন হয়নি।

আবার এই ১৯৫৭ সালেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় শেষ সম্মেলন হয় দিল্লিতে। এর পর থেকে গণনাট্য সংঘের কার্যকলাপে মোটামুটি শান্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। পশ্চিমবাংলার শাখা অবশ্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক কর্মীদের নেতৃত্বে গ্রামে-গঞ্জে কলে-কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে গণসংগীত আর নাটক ও পথনাটকের উপচার নিয়ে। শহরের মঞ্চে কদাচিৎ দেখা যেত গণনাট্যর প্রান্তিক শাখার *'নীলদর্পণ'*, *'মা'* প্রভৃতি প্রযোজনা। ইতিমধ্যে গণনাট্য সংঘ গণনাট্যর মঞ্চের বাইরে যাত্রা মঞ্চে গিয়ে নাট্যের মাধ্যমে গণনাট্যর চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বীরু মুখোপাধ্যায়ের *'রাহুমুক্ত'* যাত্রাপালা অভিনয় করতে থাকেন। *'রাহুমুক্ত'* পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি (১৯৫৪-র ২০শে আগস্ট প্রথম মঞ্চস্থ) সারা বাংলায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। পৌরাণিক রূপকের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই পালার জনপ্রিয়তার একসময় মনে হয়েছিল গণনাট্য সংঘ তার লক্ষ্য পুরণের জন্য সঠিক মাধ্যম পেয়ে গেছে। যাত্রার মাধ্যমেই প্রকৃত জনজাগরণ সম্ভব। গ্রামে যেখানে যাত্রা শহরে সেখানে শিক্ষিত মধ্যবর্গীয় সমাজে নাটক বা থিয়েটার হল চেতনা বিস্তারের প্রকৃত মাধ্যম। এইভাবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা থিয়েটারের প্রথম দশক অতিবাহিত হয়ে গণনাট্য বনাম নবনাট্যর কূটতর্কের দশকে প্রবেশ করবে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ কাল পর্বে। আর এই পর্বের বাংলা থিয়েটারে দেখা যাবে গণনাট্য বনাম নবনাট্যের এক তীব্র লড়াই।

পাদটীকা :

১। *নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর*, সুনীল দত্ত সম্পাদিত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৭।

২। *যুগন্ধর নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত*, ড অজিত মণ্ডল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫।

৩। *বাংলার নাটক ও নাট্যশালা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৪।

৪। *লোকনাট্য*, সম্পাদক বীরেন রায়, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৪৯।

৫। *Marxist Cultural Movement in India*, Vol II, ed by Sudhi Pradhan, Navana, Calcutta, 1982

৬। *গণনাট্য*, জানুয়ারি ১৯৫৩।

৭। *বহুরূপী*, সংখ্যা ৬৯, সম্পাদক কুমার রায়, সহযোগী প্রভাতকুমার দাস, ১৯৮৮।

[*পশ্চিমবঙ্গ*, স্বাধীনতা ৫০বর্ষ পূর্তি সংখ্যা ১৯৯৭]

মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চা
পঞ্চাশের দশক

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চায় প্রথম পরিবর্তনের ছোঁয়া আনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। সংঘের ১৯৫২-৫৪ সালের সাংগঠনিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে এই সময়কালের মধ্যে কলকাতা ছাড়া ২৮টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলায় ১০৩টি শাখা সংগঠন গণনাট্য প্রচারের সক্রিয় হয়ে উঠেছে।[১] গণনাট্য প্রচারের এই ভৌগোলিক ব্যাপ্তির পাশাপাশি তার সৃজনকর্মের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশের আগে আর একটি তথ্য আমরা উল্লেখ করতে চাই। স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৪৮-'৪৯ সালে সংঘের থেকে শিল্পী কলাকুশলীদের একটা বড় অংশের দলত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শগত অবস্থান ও সাংগঠনিক ব্যাপারে কট্টর লাইন গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের এলাহাবাদ সম্মেলনে।[২] কিন্তু দুবছর বাদেই গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারিতে রিপোর্টে উল্লেখ করে : 'Instead of putting the organisation on the right path, the Allahabad Conference held in 1949 adopted an extreme sectarian policy which led to further disaster.'[৩] এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 'The movement should be as broad based as possible. Those joining it should agree to the aims of furthering the cause of peace and the people's struggles for democratic rights and for a better future, through their work.' সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 'Since numerous progressive theatre groups are bringing up. IPTA must establish contact with them and strengthen them. Wherever the situation arises, these groups should be affiliated, ensuring their full right of existence and participation in the building of the people's theatre movement.'[৪] গণনাট্য সংঘের উত্থান ঘটেছিল প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে এবং সেই ৪৩-৪৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে সময়সূচির গণমুখী নাট্য তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় কলকাতা রাজধানীর মতো মফস্বল বাংলার এলাকা বিশেষে নাট্যচর্চার অন্তর্বস্তুতে পরিবর্তনের আভাস নজরে আসছিল। সংঘের বাংলা সাবকমিটি ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীতে যে সব জেলার সভ্যদের নিয়ে সপ্তাহব্যাপী স্কুল চালানোর বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মালদহ, রংপুর, চট্টগ্রাম,

যশোর, হুগলি, খুলনা, ঢাকা, ২৪-পরগনা, নদীয়া ও বরিশাল এই ১০টি জেলার সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।[৫] ১৯৪৪ সালে *'নবান্ন'* নাটক কলকাতা ছাড়া জেলায় অভিনীত হয়েছিল বহরমপুর, যশোর, চন্দননগর ও বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুর প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলনে। নাটক ছাড়া গণনাট্য সংঘের শিল্পকলা সাবকমিটির ১৯৪৪-এর প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যাচ্ছে ময়মনসিংহ জেলার দশটি কেন্দ্র ছাড়া ঢাকা জেলার বিভিন্ন গ্রামে সংঘের শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা হয়। প্রদর্শনী করা ২৪ পরগনার নৈহাটি, জগদ্দল; হাওড়া; হুগলির চন্দননগর; বরিশাল; দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি, বর্ধমানের সাতটি জায়গায়।[৬] লক্ষ করার বিষয়, স্বাধীনতা লাভের আগেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ, দেশীয় সামন্তশোষণ, পুঁজিবাদী শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়েছিল গণআন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করল প্রাক-স্বাধীনতা কালের ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, বাস্তুহারার স্রোত, খণ্ডিত দেশের ৪৭-এর রাজনৈতিক স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও বামপন্থী কার্যকলাপের ওপর কংগ্রেসি শাসক শ্রেণীর দমনপীড়ন ধরপাকড় হত্যার মতো অমানবিক বর্বর ঘটনাস্রোত। ৪৮ সালে গণনাট্য সংঘের ওপর সরাসরি আক্রমণ নামিয়ে আনা হলে সংঘের সংশ্লিষ্ট অনেক সদস্যই তখন সংঘ এড়িয়ে থেকেছেন এবং একটা বড় অংশ শিল্পসৃজনের সমস্যার ওপর সংগঠন নেতৃত্বের অবোধ্য হস্তক্ষেপে অস্থির হয়ে দলত্যাগ করেছেন। এমতাবস্থায় এলাহাবাদ সম্মেলন এইসব দলত্যাগীদের পরগাছা বলে চিহ্নিত করলেও সংঘকে সৃজনশীল কর্মী দ্বারা সমৃদ্ধ করতে না পারার ব্যর্থতায় ১৯৫২-য় এসে সাংগঠনিক নীতি বদলিয়ে সংঘকে ব্যাপক গণভিত্তিক ও উদার করে তুলতে হল।[৭]

গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পরিসরবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চার প্রগতিশীল গণমুখী অভিমুখকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। এ কথা সবারই জানা, পাশ্চাত্য ধরনের থিয়েটার কলকাতাতেই সূচিত বর্ধিত লালিত হলেও কলকাতার পাশাপাশি জেলা শহর ঢাকা, রংপুর বা হুগলি হাওড়া ২৪-পরগনা প্রভৃতি জেলায় তা ছড়িয়ে যায়। উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার বা নদীয়া এ সব জেলা শহরেও কলকাতার সমকালেই নাট্যচর্চা সূচিত হয়েছিল এবং কলকাতার মঞ্চে পাশ্চাত্য ঢংয়ে নাটক লেখা ও প্রযোজনার বেশ কিছু নিউক্লিয়াস জেলা শহর থেকেই উঠে এসেছিলেন। যেমন রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশাররফ হোসেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, পরবর্তীকালে তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি। সুতরাং প্রশ্নটা শহর মফস্বলের নয়। প্রশ্নটা বাংলা নাট্যচর্চার, ভৌগোলিক আয়তন বিস্তৃতির, প্রশ্নটা চেতনার আধুনিকীকরণের। এই দিক থেকে দেখতে গেলে কলকাতায় যেখানে নাট্যচর্চাকে পেশাদারি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, মফস্বলে সেখানে নাটক করা কখনই পেশা হতে পারেনি, মফস্বলে পেশা বা উপজীবিকার মাধ্যম হয়েছিল যাত্রা। নগর সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় উত্তরকালে যাত্রাশিল্পের বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কলকাতা।

মফস্বলের শৌখিন নাট্যচর্চা উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায়শ কলকাতার হাত ধরে চলেছে।[৮] গণনাট্য সংগঠিতভাবে যখন রাজ্যকেন্দ্রর পাশাপাশি জেলান্তরেও তার নাট্যদর্শন ছাড়িয়ে দিতে শুরু করল তখন থেকেই বলা যায় জেলার নাট্যচর্চা শৌখিন উদ্যোগের স্তর থেকে একটা দায়বদ্ধ নাট্যচর্চার ভাবনায় উন্নীত হয়। নাটক করা কেবল বাৎসরিক বিনোদন নয়, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্যে নিবদ্ধ এক সুসংবদ্ধ দায়বদ্ধতা।

১৯৪৩-৪৪ থেকে ৪৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে মফস্বল বাংলায় গণনাট্য সংঘের নিজস্ব উদ্যোগে বা প্রভাবে জেলান্তরে যে সাংগঠনিক নাট্যচর্চা শুরু হয় তার সঠিক বিবরণ কোথাওই তেমন মেলে না। তবু *'গ্রুপ থিয়েটার'* পত্রিকার উদ্যোগে সংকলিত *'ইতিহাস অন্বেষণ'* বিভাগে দু-একটি জেলার সামান্য তথ্য যা পাওয়া যায় তা এ রকম : ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বছরে গোপেন রায়, রেবা রায়, সজল রায়চৌধুরী প্রমুখরা জলপাইগুড়িতে আসেন *'ম্যয় ভুখা হুঁ'* নাটকটি মঞ্চস্থ করতে। তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের শান্তি নিয়োগী, অনিল মুখার্জির সহযোগিতায় বামপন্থী সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন ছেলেমেয়েদের সংগ্রহ করেন এবং *'ম্যয় ভুখা হুঁ'* নাটকটি প্রথম এই শহরে বান্ধব নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। এ ভাবেই এই শহরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং বামপন্থী নাট্য আন্দোলনের সূচনা।[৯] গণনাট্য সংঘ এই পর্বে এখানে সংগঠিত হয়ে নিজস্ব উদ্যোগে অভিনয় করে *'নবান্ন'*, *'দুঃখীর ইমান'*, *'ছেঁড়াতার'* ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস অন্বেষণ করে দুলাল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, 'গণনাট্য ১৯৪৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও অতীন্দ্র মজুমদারের 'জাগরণ' নাটকটির অভিনয়ের মধ্য দিয়েই গণনাট্য ভাবনার প্রতিষ্ঠা হয় মুর্শিদাবাদে।[১০] গণনাট্য সংঘের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আর এস পি-র উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে ১৯৪৬ সালের ২২শে শ্রাবণে জন্ম নেয় ক্রান্তি শিল্পীসংঘ। অরুণ দাশগুপ্তের বাইশে শ্রাবণ গীতিআলেখ্য এদের প্রথম নিবেদন। তারপর অতীন্দ্র মজুমদারের *'জাগরণ'* নাট্যগীতি, সলিল সেনের নাটক *'জাতিস্মর'* পরবর্তী কার্যক্রম।[১১] ১৯৪৮ সালে ২৪-পরগনা জেলায় দমদম ও নৈহাটিতে গণনাট্য সংঘের নাট্যশাখা প্রবর্তিত হলেও ৪৩-৪৪ থেকে এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাখার প্রযোজনাটি অভিনীত হয়ে সাধারণ মানুষের চাহিদার সঙ্গে নিজেদের মেলানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। অহীন্দ্র ভৌমিক প্রদত্ত বিবরণ থেকে নৈহাটি শাখার উদ্যোগে অনিল ঘোষের *'নয়ানপুর'* অভিনয়ের খবর ছাড়া এ সময়ের আর কোনো তথ্য মেলে না।[১২] স্বাধীনতা লাভের পূর্বে চল্লিশের দশকের অন্তিম পর্যন্ত মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চার মোড় নেবার পর্ব ছিল এইরকম।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘের ভাঙন আসে এবং স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত একাধিক নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই সময় ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের জেলাওয়ারি সাংগঠনিক অবস্থার কথা আগেই

বলেছি। এই সময়ে ১০৩টি শাখার নাটকাদি হয়েছে এই রকম : কলকাতায় ৩১টি নাটক ও ৬টি পোস্টার নাটক; হুগলিতে ১৩টি নাটক; হাওড়ায় ১২টি; ২৪-পরগনায় নাটকের সংখ্যা সর্বাধিক ৪৩টি। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় ৩টি করে নাটক; বর্ধমান জেলায় ২টি নাটক এবং বাঁকুড়ায় ৫টি নাটক।

একই নাটক পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই একাধিক জেলায় অভিনীত হয়েছে, কখনো ছাপার পর বিভিন্ন জেলা শাখা সেগুলি অভিনয় করেছে। আবার জেলার নিজস্ব উদ্যোগে রচিত বা নির্বাচিত নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রেই এইসব নাটক কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হত।

নাটকগুলি হল : রবীন্দ্রনাথের *'মুক্তির উপায়'*, *'মুক্তধারা'*, *'বিসর্জন'* ও *'শারদোৎসব'*। শরৎচন্দ্রের *'বিন্দুর ছেলে'*, *'মহেশ'*, মধুসূদনের *'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'* রমা রঁল্যার *'১৪ই জুলাই'*, মণি মজুমদারের *'নাগপাশ'*, বিজন ভট্টাচার্যের *'জবানবন্দী'*, *'নবান্ন'*, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'বাস্তুভিটা'*, *'মশাল'*, *'মোকাবিলা'*, তুলসী লাহিড়ীর *'ছেঁড়াতার'*, ঋত্বিক ঘটকের *'দলিল'*, বীরু মুখোপাধ্যায়ের *'নাটক নয়'*, *'ঢেউ'*, *'২০শে জুন'*, *'রাহুমুক্ত'*, ভানু চট্টোপাধ্যায়ের *'আজকাল'*, সলিল চৌধুরীর *'অরুণোদয়ের পথে'*, পানু পালের *'বিচার'*, মনোজ বসুর *'নূতন প্রভাত'* প্রভৃতি।

নাটক নির্বাচন থেকেই স্পষ্ট যে বিত্তহীন ছিন্নমূল মানুষের জীবনজয়ের সাধনাই ছিল এই নাট্য আন্দোলনের লক্ষ্য। সুতরাং ঐতিহাসিক, সাংকেতিক নাটক বাদ দিলে বাস্তববাদী নাট্যচর্চার ছিল প্রশস্ত অবসর। মফস্বল বাংলায় সাধারণভাবে এই পঞ্চাশের দশকেও যে নাটক নির্বাচন ও প্রয়োগ-ভাবনা কাজ করত তার বেশির ভাগটাই আসত পাবলিক থিয়েটার কিংবা গণনাট্য ভাবনার বাইরে লঘুস্তরের সমস্যাকেন্দ্রিক নাটক থেকে। গণনাট্য সংঘ সেখানে যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য তুলে ধরল তার প্রভাব জেলার এই সময়কার নতুন গঠিত দলগুলিতে যেমন অল্পমাত্রায় পড়তে লাগল, তেমনই এই সময়েই গণনাট্য আন্দোলনের পাল্টা একটা নামকরণ করা হতে লাগল একদা গণনাট্য নায়ক শম্ভু মিত্র বা কারো কারো লেখালেখিতে এবং সেই সূত্রেই এই ৫৪-৫৫ সময়কালেই গড়ে উঠল নতুন এক আন্দোলন—নবনাট্য আন্দোলন।

সুধী প্রধান তাঁর ১৯৬৪-তে লেখা *'নাটকের লাইনে'* নিবন্ধের এক জায়গায় স্পষ্টত স্বীকারই করলেন 'আজ গণনাট্যের বাইরে অনেক দল তৈরী হলেও এইভাবে ১৯৫০ সালে গণনাট্যই নিজেকে স্বেচ্ছায় শত টুকরো করে তথাকথিত নবনাট্য আন্দোলনের সাংগঠনিক বনিয়াদ তৈরী করে দেয়[১৩]।' আমরা জানি সুধী প্রধান জোশী যুগের গণসংস্কৃতি বনাম রণদিভে যুগের অতিবাম সংকীর্ণ গণ্ডির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বন্দ্বের পরিণামের কথা বলছেন। যাইহোক মফস্বল বাংলা এই যুগসন্ধিক্ষণের রাজনৈতিক সংকট বুঝে না বুঝে একই সঙ্গে সনাতনী থিয়েটার, গণনাট্যের নাটক এবং নবনাট্যের আঙ্গিক ও বিষয়গত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুকেই অনুসরণ করতে থাকে।

এবং সবই প্রায় কলকাতা অনুপ্রাণিত। দেশ স্বাধীন হলেও মফস্বল বাংলার থিয়েটার স্বাধীনভাবে পঞ্চাশের দশকে কোথাও পদক্ষেপ করতে পারেনি। আঞ্চলিক আর্থ-রাজনীতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানী কোনো নতুন উদ্ভাবনী নাট্যভাষার সন্ধান দিতে পারেনি এই দশকের থিয়েটার। তবে কলকাতার অনুসরণেই একাঙ্ক বা ছোট নাটকের অভিনয় ও তার প্রতিযোগিতা স্থাপনার সাংগঠনিক স্বাধীন পদক্ষেপ অবশ্য এই পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকেই শুরু হয় এবং এই একটি সূত্রেই মফস্বলে নাটক ষাট-সত্তর দশক থেকে পূর্ণ স্বাধীন হয়ে ওঠে, পায়ের তলায় মাটি পায়, কলকাতার মুখাপেক্ষিতা মুক্ত হয়। এ সব প্রসঙ্গ ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সীমা পঞ্চাশের দশকের মফস্বল বাংলার থিয়েটার।

২

স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের দশকে কলকাতার নিকটবর্তী জেলা হাওড়ার বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী নটনাট্যমের সংক্ষিপ্ত প্রযোজনা তালিকা বিচার করলেই বোঝা যায় এ দলের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জগমোহন মজুমদারের নাট্যভাবনায় গণনাট্য–নবনাট্য উভয় আন্দোলনের নাট্যদর্শনই প্রভাব ফেলেছিল। প্রথম প্রযোজনা *'উদয়ের পথে'* ১৯৫২। ১৯৫৩-য় মঞ্চস্থ করলেন *'ডাকঘর'*। ১৯৫৪-য় নটনাট্যমের নির্বাচন হল সাধারণ রঙ্গালয় মিনার্ভার নাটক ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'কেরানীর জীবন'*। তারপর ১৯৪৭-এ নামছে *'পোস্টমাস্টার'*-এর নাট্যরূপ। ১৯৫৮-য় *'ওরা কাজ করে'* শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শন তাড়িত প্রযোজনা। ১৯৫৯-এ কিছু নেই, '৬০-এ মঞ্চস্থ হল *'করুণা কোরো না'*, নাটক নির্দেশনা জগমোহন মজুমদারের। এঁরাই এক অর্থে ব্রেখটের *'মাদার কারেজে'*র বাংলা রূপান্তর *'ভীতু ভীমের ভাবনা'* মঞ্চস্থ করেন ১৯৭৫-এ প্রথম। রমেন লাহিড়ী এই সময়ের এ জেলার বিশিষ্ট নাট্য প্রতিভা। এ জেলার আরও তথ্য আছে। প্রবণতা বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট।[১৪]

উত্তর ২৪-পরগনায় পঞ্চাশের দশকের নাট্যদলের সংখ্যা হাওড়া থেকে বেশি। ১৯৫০-এ কাঁচরাপাড়ায় আর্ট থিয়েটার তুলসী লাহিড়ীর অনুপ্রেরণায় পূর্ণাঙ্গ নাটক চর্চায় দৃষ্টান্তযোগ্য হয়ে ওঠে। *'ছেঁড়াতার'* এদের বিশিষ্ট প্রযোজনা ছিল। ১৯৫১-তে বরানগরে আবির্ভূত হয় অভ্যুদয়। কিরণ মৈত্রের উদ্যোগে ও প্রযত্নে অভ্যুদয়ের নাট্য নির্বাচনের মধ্যে বামপন্থী গণচেতনার তাগিদই প্রধান। প্রথম একাঙ্ক *'নাটক নয়'* প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে প্রভূত জনপ্রিয় হয়। এই নাটকটির একাধিক প্রদর্শন হয় সে সময়। তারপর ১৯৫৫-তে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত প্রথম নাটক প্রতিযোগিতায় কিরণ মৈত্রের *'আয়না'* তৃতীয় স্থান দখল করে। এই *'আয়না'* বিশদাকারে *'বারো ঘণ্টা'* যা ১৯৫৭-তে বিশ্বরূপা আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বাস্তববাদী অভিনয় ধারায় কিরণ মৈত্র ও অভ্যুদয় এই পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী রূপে খ্যাতি

অর্জন করে। কিরণ মৈত্র পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। অভ্যুদয় উত্তর ২৪-পরগনার দল হলেও বৃহত্তর কলকাতার দলের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে অন্বিত হয়ে গিয়েছিল।[১৫]

অভ্যুদয়কে বাদ দিলে এ জেলায় আর ৩টি প্রথম সারির নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব এই পঞ্চাশের দশকে ঘটে এবং তাদের নাট্যচর্চাদি মফস্বল বাংলা স্বাধীন থিয়েটার রূপে তাদের পথিকৃতের মর্যাদা দিতে বাধ্য। জেলা শহরের নাট্যগোষ্ঠীর বড় নাটক করার সব চেয়ে বড় বাধা ছিল নিয়মিত দর্শকের অভাব, প্রয়োজনীয় মঞ্চের অভাব ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার সুবিধা অনেক। নিজস্ব এলাকার বাইরেও সহজে সদলবলে তল্পিতল্পাসহ নাটক করে আসা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে কলকাতার থিয়েটার সেন্টারের নাট্য প্রতিযোগিতার সাফল্য দেখে বেলঘরিয়ার সংগঠনী নাট্যসংস্থায় (১৯৫৪) নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ নাটক করার পাশাপাশি প্রবর্তন করে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার। ১৯৫৭ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতা এখনও চালু আছে। সংগঠনীর আবির্ভাবের আগের বছর ১৯৫৩-য় সৃষ্টি হয় শ্যামনগর আটপুরের জাগৃতি নাট্যগোষ্ঠীর। গণনাট্য নবনাট্য সব ধরনের নাটকেই এঁদের পারঙ্গমতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। যাত্রিক আবির্ভূত হয় নৈহাটির বুকে ১৯৫৮-য়। কলকাতার বাইরে গণমুখী স্বাধীন নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলায় এঁদের বিপুল খ্যাতি ছিল। এঁদের নিজস্ব নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতার কাছে থেকেও কলকাতাকে এড়িয়ে সারা বাংলায় প্রগতিশীল নাটক রচনা, নিজস্ব প্রযোজনা ও প্রতিযোগিতা মঞ্চের আয়োজন করে মফস্বল বাংলার নাট্য ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে এসে যাত্রিক এখন ক্লান্ত, প্রতিযোগিতাটি বন্ধ হয়ে গেছে, নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য এখন নাটক রচনার অপেক্ষা নগরপিতার দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান জনসেবকের ভূমিকা পালন করেছেন।[১৬]

এই দশকে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায়ও গণমুখী নাট্যচর্চার ছোঁয়া লাগে। কোচবিহার শহরের সাংস্কৃতিক সংঘ (১৯৪৮-এ নথিভুক্ত) ১৯৫১ সালে শহরের ল্যান্সডাউন হলে *'ছেঁড়াতার'* প্রযোজনায় প্রথম মহিলা শিল্পীদের অংশগ্রহণ করায়। এই পঞ্চাশের দশকেই এ শহরের প্রথম নাট্যগোষ্ঠী খাগড়াবাড়ি ড্রামাটিক ক্লাব নিজস্ব মঞ্চ গড়ে তোলার সুযোগ পায়। মহিলারা এখানে পৃথকভাবে নিজেরা অভিনয় করতেন, দীপায়ন ভট্টাচার্য পরিবেশিত তথ্যে জানা যায় ষাটের দশকে পৌঁছে এঁরা এ বেড়া ভাঙেন। এঁদের নাট্য নির্বাচনে বামপন্থী ছোঁয়া লেগেছে সত্তর দশকে পৌঁছে। ১৯৫৩ বা ৫৪-য় নাট্যশ্রী আবির্ভূত হয়, এঁদের নাটক ছিল *'রাণী দুর্গাবতী'*, *'উল্কা'*, *'ক্ষুধা'* ইত্যাদি। ১৯৫৪-তে জন্ম নেয় খাগড়াবাড়ি নাট্যসংঘ। পঞ্চাশের দশকে এঁদের নাটক হল পানু পালের *'বিচার'*, শচীন সেনগুপ্তের *'গৈরিক পতাকা'*, শরৎচন্দ্রের *'রামের সুমতি'* ইত্যাদি। উত্তরকালে বামপন্থী নাট্যচর্চায় এঁরা কোচবিহারের মধ্যে অগ্রণী স্থান নেয়। ১৯৫৫ সালে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের রিক্রিয়েশন ক্লাব *'নতুন ইহুদি'* নিয়ে নামলেও

সবরকম নাটকই এঁরা করতেন। নাট্য প্রয়োগে নিষ্ঠার প্রমাণ রাখতেন বলে স্থানীয় নাট্যচর্চায় রিক্রিয়েশান ক্লাব হলেও এঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হয়।

কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ শহরের ইউনাইটেড ক্লাব (১৯৫৬) *'হিউয়ারস অব কোল'*-এর স্থানীয় রূপান্তর মলয় গঙ্গোপাধ্যায়ের *'কয়লা কাটে যারা'* দিয়ে নাটকাভিনয়ে এগিয়ে যায়, পরে পাঁচমিশেলি নাট্যচর্চায় বিনোদনমুখী হয়ে ওঠে।

এ জেলায় দিনহাটা শহরের জুয়েলস ক্লাবও (১৯৫৫) পাঁচমিশেলি নাটক করতেন। দিনহাটার তুলনায় এই পাঁচের দশকে বরং মাথাভাঙ্গা শহরের মাথাভাঙ্গা ক্লাব ও ঐ একই নাট্যচর্চায় অনেক বেশি স্থিত ছিল। *'দুই মহল'* দিয়ে শুরু। পরে *'উল্কা'*, *'জনরব'*, *'সংক্রান্তি'*, *'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'*, *'রুপোলি চাঁদ'* ইত্যাদির মধ্যে প্রয়োগ-ভাবনায় কলকাতার মতোন বৈভব প্রদর্শনে যত্ন নিতেন। নাট্য নির্বাচনে গণনাট্য নবনাট্য সব মিলেমিশে একাকার। মাথাভাঙ্গার নাট্যচর্চায় উত্তরকালে বামপন্থী প্রভাব নান্দনিকী, গিলোটিন প্রভৃতির মধ্যে জায়মান হয়।

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট পঞ্চাশের দশকে ১৯৫৪-য় নারী চরিত্রে অভিনেত্রীদের অবতীর্ণ হওয়ার রীতি প্রবর্তন করে। এঁদের নাটক মূলত বিনোদনমুখী হলেও প্রযোজনায় যত্ন ছিল। নাটকগুলি যথারীতি কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের জনপ্রিয় নাটক : *'প্রতাপাদিত্য'*, *'উষাহরণ'*, *'কারাগার'*, *'পার্থসারথি'*, *'রীতিমত নাটক'*, *'পি ডবলু ডি'*, *'রত্নদীপ'*,- *'টিপু সুলতান'*, *'মীরকাশিম'*—ঐতিহাসিক পৌরাণিকই বেশি। ১৯৫৮ সালে এখানে এখন নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল রায়গঞ্জ কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন। পঞ্চাশের দশকে উত্তর দিনাজপুরের নাট্যচর্চার পরিধি এর মধ্যেই সীমিত ছিল। ষাট সত্তর দশকে এ জেলার নাট্যচর্চায় আধুনিকতার পাশাপাশি বামপন্থী চিন্তাধারার মাত্রা গতিবেগ পায় সুধাংশু দে-র নেতৃত্বে ছন্দমের প্রতিষ্ঠায়। ১৯৬৩-তে *'কাবুলিওয়ালা'*, তারপর *'ছেঁড়াতার'*, *'অগ্নিগর্ভ লেনা'*, *'পদ্য গদ্য প্রবন্ধ'* ইত্যাদি অভিনীত হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাণকেন্দ্র বালুরঘাট। এ শহরকে পশ্চিমবাংলার নাট্য মানচিত্রে প্রথম সম্মানিত স্থান এনে দেন নাট্যকার মন্মথ রায়ের নেতৃত্ব। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বালুরঘাট নাট্যমন্দির (১৯০৯) এ জেলার গর্ব। পঞ্চাশের দশকেও বালুরঘাটে নাট্যচর্চা বলতে এই নাট্যমন্দিরের কাজকর্মকেই বোঝায়। এঁদের প্রযোজনা ছিল *'পাণ্ডব কৌরব'*, *'বলিদান'* ইত্যাদি। পঞ্চাশের দশকে *'ছেঁড়াতার'* মঞ্চস্থ হয়েছে এ তথ্যটুকু মিলছে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আজ এ এলাকার খ্যাতিমান পরিচালক, নাট্যকার। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে কাজ শুরু করে ১৯৬৯ সালে নিজস্ব নাট্যদল ত্রিতীর্থ গড়ে তোলেন ত্রিশূল ও মিলনতীর্থ জুড়ে দিয়ে।

জলপাইগুড়ি শ্রীসংঘ ক্লাব (১৯৫৩)-তে নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়। নটশ্রী নিকেতন (১৯৪৮) পঞ্চাশের দশকে *'বাস্তুভিটা'* প্রভৃতি নাটক করে। ময়নাগুড়ির এম সি সি (১৯৫৭)-র

নাটক হল রতনকুমার ঘোষের *'পিতামহদের উদ্দেশ্যে'*, রাধারমণ ঘোষের *'হারাধনের দশটি ছেলে'*, *'হইতে সাবধান'* প্রভৃতি। জলপাইগুড়ি শহরে এ দশকে মূলত গণনাট্য সংঘ ও ক্রান্তি শিল্পীসংঘই সক্রিয় থাকে। প্রগতিশীল নাট্যচর্চার সূত্র ধরে পঞ্চাশের দশকের শেষে, ১৯৬০-৬১-তে অগ্রণী সংস্থার উদ্যোগে নবনাট্য আন্দোলনের আঙ্গিক ও বিষয়ের যে পরীক্ষাধর্মী নাটক শুরু হয় কলকাতায় তাই এখানকার মঞ্চে উপস্থিত করে সাড়া ফেলে। *'পোস্টমাস্টারের বউ'*, উৎপল দত্তের *'নীলকণ্ঠ'*, অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের *'জীবনযাপন'* অভিনীত হতে থাকে সম্পূর্ণ আধুনিক নাট্য আঙ্গিকে। বাবুপাড়া পাঠাগারের নাট্যবিভাগ আর একধাপ এগিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের *'নীল রঙের ঘোড়া'*র মতো কিমিতিবাদী নাটকও সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নাট্যচর্চার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সত্তর দশকের শেষ থেকে। কিন্তু তার আগে পঞ্চাশের দশকে শিলিগুড়ি শহরের গণনাট্য ও নবনাট্যের যুগল প্রভাবে প্রগতিশীল নাট্যচর্চার স্থাপনা ঘটে ১৯৫৭-য় কথা ও কলম সংস্থার প্রতিষ্ঠা থেকে। এঁদের প্রথম নাটক ছিল *'ভাগশেষ'*। পরবর্তী প্রযোজনা *'স্পুটনিক'*। ১৯৫১-তে *'রক্তকরবী'* মঞ্চস্থ করে এঁরা বিশেষ সাড়া ফেলেন। *'গন্ধর্ব'* নাট্য ত্রিমাসিকের ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা শারদীয় ১৩৬৮ সংখ্যায় কথা ও কলম-এর এই *'রক্তকরবী'* সম্পর্কে লেখা হয়েছিল 'নন্দিনী ও রাজার ভূমিকায় সেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিহির দাশগুপ্তের অভিনয় গুণে সমস্ত প্রযোজনাটি শিল্পরম্যতা লাভ করেছিলো'। ১৯৬২ সালেই এই সংস্থার অবলুপ্তি ঘটে।[১১] আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে শিলিগুড়ি শহরে যে দীনবন্ধু মঞ্চ স্থাপিত হতে পেরেছে, তার মূল প্রেরণা ষাট সত্তর দশকে এই জেলা শহর ও তার সন্নিহিত এলাকার বিভিন্ন সমর্থ নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যচর্চার তীব্রতার দাবি।

মালদহ জেলা শহরে ও পঞ্চাশের দশকে যে সাড়া জাগে উত্তরকালে জেলার নাট্যচর্চায় মালদহে তা বিকশিত হয়েছিল ষাটের দশকে। ১৯৫০-এ প্রতিষ্ঠিত জাগরণ নাট্যবীথির নাট্যচর্চায় কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় পরিবেশিত জনপ্রিয় নাটকগুলিই নির্বাচিত হতে দেখা গেছে। নিশিকান্ত বসুর *'পথের শেষে'*, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের *'মানময়ী গার্লস স্কুল'*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'দ্বীপান্তর'* তার দৃষ্টান্ত। এ সংস্থার মুখ্য স্থপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১৯৫১-তে গড়ে ওঠে অনামী শিল্পীচক্র। এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। ১৯৫২-তে স্থাপিত হয় আলোকতীর্থ। এঁদের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *'লাল সড়ক'*। নির্দেশনা ছিল অহিভূষণ রায়ের। আলোকসম্পাত ও আবহ প্রয়োগে মালদহে যিনি আধুনিক কলাকৌশলের প্রবর্তনের পথিকৃৎ সেই পুরুষোত্তম সোমানি এখানে কাজ করেছেন এ নাটকসহ একাধিক নাটকে। আলোকতীর্থের পরবর্তী প্রযোজনাগুলি এইরকম : *'কালিন্দী'* (১৯৬৫), *'দুই পুরুষ'*, *'ক্ষুধা'*, *'পোস্টকার্ড'*, *'মিশরকুমারী'*, *'ফেরারী ফৌজ'* (১৯৬৫) ইত্যাদি। ১৯৫৫-য় নতুন নাট্যগোষ্ঠী রূপে

জন্ম নেয় সন্ধানী। টেকেনি, পরবর্তীতে দেখা দেয় শিল্পী পরিষদ। এঁদের নাট্যভাবনায় আধুনিক চিন্তা-ভাবনার ছাপ স্পষ্ট ছিল। এ জেলার নাট্যচর্চা সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিবেদকের মন্তব্য : 'মালদহ জেলায় নাট্য আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই। ষাট-সত্তর দশকে এই আন্দোলন আরও অনেক সংগঠিত রূপ পায়। আশির দশক থেকে গতি মন্থরতায় ভুগতে থাকে এই আন্দোলন। আর বর্তমান দশকের নাট্যচর্চার গতিকে 'খুঁড়িয়ে চলা' বলাই ভালো।'[২০]

মুর্শিদাবাদ জেলা আজ চার দশক হল পশ্চিমবাংলার নাট্য আন্দোলনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৫০ সালের গোড়ায় গণনাট্য সংঘ ও ক্রান্তি শিল্পীসংঘের দুটি সমান্তরাল উদ্যোগে এ জেলার নাট্যচর্চায় প্রগতিমুখী অভিমুখ স্থিরীকৃত হয়ে যায়। ১৯৫০-এ ক্রান্তি শিল্পীসংঘ *'মুক্তধারা'* প্রযোজনা করে সাড়া ফেলে। *'মহেশ'*-এর নাট্যরূপও প্রশংসা পায়। ক্রান্তি শিল্পীসংঘ থেকে অনিল দত্ত প্রমুখ বেরিয়ে এসে ১৯৫৯ সালে এ জেলার প্রথম নামকরা নাট্যদল হিসেবে রূপশিল্পী-কে পরিচিত করান। এঁদের প্রথম প্রযোজনা ছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর *'রুপোলি চাঁদ'*। সম্প্রতি এঁদের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল এই ১৯৯৯-এর আগস্ট মাসে।

১৯৫১ সাল গণনাট্য সংঘ বহরমপুর শহরে সুধীন সেনের নেতৃত্বে আন্দোলনমুখী নাট্যচর্চায় গতি আনে। কলকাতার কেন্দ্রীয় সংস্থার *'নবান্ন'* বহরমপুরে অভিনীত হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটক এ শহরের মানুষ। তাঁর লেখা *'দলিল'*, পানু পালের *'বিচার'*, তুলসী লাহিড়ীর *'ছেঁড়াতার'*, রবীন্দ্রনাথের *'রক্তকরবী'*, *'মুক্তির উপায়'* উৎপল দত্তের *'ঘুম নেই'* এই পাঁচের দশকেই এখানে অভিনীত হয়। পোস্টার নাটক রচনা প্রযোজনায় কমল সমাজদার এখানে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চাশের দশকে এই জেলার অন্যান্য এলাকাতেও নাট্যচর্চায় প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাঁধতে থাকে, যার পরিণামে ষাট সত্তর আশি নব্বই দশক জুড়ে বাংলা থিয়েটারের বুকে মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুরের এত প্রতাপ।

নদীয়া জেলার নাট্য ইতিহাস যা লিখিত আকারে পাওয়া যায় কালানুক্রমিতার বিচারে তা একান্তই আগোছালো, তার মধ্যে দশক হিসেবে জেলা শহর কৃষ্ণনগর বা জেলার অন্যান্য এলাকার তথ্য বিন্যাস করা দুরূহ।

কৃষ্ণনগরে নাটকের চর্চা কলকাতার অনুবর্তী হয়েই থেকেছে বরাবর। পঞ্চাশের দশকে এখানে গণনাট্যের হাওয়া লেগে নাট্যচর্চায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। এ দশকে সংস্কৃতি সংসদ ছিল গণনাট্যের শাখা। ১৯৫৫ থেকে প্রায় এক দশক সংস্কৃতি সংসদ জেলা কেন্দ্রে প্রগতিশীল নাট্যচর্চার বাতাবরণ তৈরি করে। চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, দেবীভূষণ ভট্টাচার্য, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রমুখের যৌথ নেতৃত্বে চলত সংগঠন। এঁদের অভিনীত নাটকগুলি হল *'আজকাল'*, *'নীলদর্পণ'*, *'শাস্তি'*, *'মাটি ও মানুষ'* প্রভৃতি। নবদ্বীপ এলাকায় গণনাট্যচর্চার কেন্দ্ররূপে গঠিত হয় প্রগতি পরিষদ, গুরুদাস রায়

ছিলেন এর কর্ণধার। শান্তিপুর শাখা এই দশকে অভিনয় করেছে রবীন্দ্রনাথের *'রথের রশি'*, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'ওরা কারা'*, অজয় ভট্টাচার্য রূপান্তরিত *'রাইজিং অব দি মুন'* অবলম্বনে *'অরুণোদয়'*, তুলসী লাহিড়ীর *'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'* প্রভৃতি। পোস্টার নাটক *'মালাবদল'* অভিনয় হয় বঙ্গবিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে ১৯৫৬-য়। এই দশকে নদীয়া জেলায় ১৯টি শাখা সংগঠন ছিল বলে ১৯৫৯-৬০-এর সম্পাদক চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ও মণীন্দ্র বাগ জানিয়েছেন, তবে সব শাখা সমান সক্রিয় ছিল না।

গণনাট্যর বাইরে এই দশকে চাকদহ অঞ্চলে গণদর্পণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সাহেব নগরে ১৯৫০-এ। এঁদের অভিনীত নাটক *'মুকুট'*, *'ডাকঘর'*, *'রোগের চিকিৎসা'* ইত্যাদি। ছোট আন্দুলিয়ার অগ্রদূত নাট্যসংস্থা ১৯৫৭-তে গঠিত হয়ে নাটক করেছে *'রক্তে রোয়া ধান'*, *'পথের দাবি'*, *'রাইফেল'* ইত্যাদি। নাট্যভারতী (১৯৫৬) প্রযোজনা করেছে *'কর্ণার্জুন'*, *'বারোঘণ্টা'*, *'সম্রাটের মৃত্যু'* প্রভৃতি। কল্যাণীর বুকে এই দশকে নাটকের কাজ বলতে যা সামান্য কিছু হত সবই কল্যাণী ক্লাবকে কেন্দ্র করে কলকাতার বহুচর্চিত বিনোদনধর্মী নাটক। পলাশী শিল্পীচক্র ১৩৫৩-য় গড়ে ওঠে। এঁদের অভিনীত নাটকের মধ্যে প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। অভিনীত নাটক *'শেষ রক্ষা'*, *'রক্তকরবী'*, *'ঝিন্দের বন্দী'* ইত্যাদি।

১৯৫৩-৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠী রানাঘাট এলাকায় নিজন দে চৌধুরীর পরিচালনায় স্থানীয় নাট্যচর্চায় আধুনিকতার প্রবর্তন করেন। অভিনীত নাটকগুলি হল *'নতুন ইহুদি'*, *'পথিক'*, *'এক পেয়ালা কফি'*, *'ধৃতরাষ্ট্র'* ইত্যাদি। রানাঘাটের রূপম গোষ্ঠী গোপাল মল্লিকের পরিচালনায় ১৯৫৮-য় প্রতিষ্ঠিত হলেও পঞ্চাশের দশক জুড়ে উন্নতমানের প্রযোজনায় অনেককে বিস্মিত করতে পেরেছিল। এঁদের সলিল সেনের *'মৌ চোর'*, *'মা'*, *'রক্তকরবী'*, *'পথের দাবি'*, *'চাষি কেমন করে মজুর হয়'* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২১]

বর্ধমান জেলার নাট্যচর্চার ইতিহাস পুরানো হলেও লিখিত ইতিহাস তেমন নেই। *'গ্রুপ থিয়েটার'* পত্রিকার ইতিহাস অনুসন্ধানেও এ জেলার বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কালানুক্রমিকতার অনুসরণ না থাকায় পঞ্চাশের দশকের বর্ধমানের নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা দুরূহ। ৫২-৫৪-য় গণনাট্য সংঘের রিপোর্টে উল্লেখ আছে এ জেলায় মাত্র দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল—সুবোধ রায়ের *'জন্মদিন'* ও রবীন্দ্রনাথের *'বিসর্জন'*। কোন শাখার উদ্যোগে হয়েছিল তা জানার উপায় নেই। আসানসোল এলাকায় ১৯৪৭ সালে এ জেলার প্রথম গণনাট্য সংঘের শাখা গঠিত হয়, রামশংকর চৌধুরীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঐ সময়েই ওঁর লেখা একটি নাটক *'ষড়যন্ত্র'* অভিনীত হয় একবারই। ১৯৪৮-এ অভিনীত হয় *'বাস্তুভিটা'* দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাতে। এই নাটকে মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পীরাই এলাকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৪৮-পার্টি বেআইনি হলে আসানসোলে গণনাট্যর কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকে এই গণনাট্য সংঘের শিল্পীরাই পৃথক পৃথক নাট্যদল গঠন করেন এ এলাকায়। সে সব নাট্যগোষ্ঠীগুলির পরিচয় এ মুহূর্তে জানার সুযোগ নেই। ভবিষ্যতের অনুসন্ধানী গবেষকরা খুঁজে বের করবেন। তবে পঞ্চাশের দশকে আসানসোলে সেন র‍্যালের কর্মীরা সংগঠিত হয়ে নাট্যচর্চায় মন দেন। দুর্গাপুর, বর্ধমান শহর, রাণীগঞ্জ, অন্ডাল এ সব এলাকায় নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে ষাটের দশক থেকে।[২২]

বীরভূম জেলার নাট্যচর্চার বয়স যথেষ্ট পুরানো। খোদ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার শ্রেষ্ঠ উৎসার ঘটে গেছে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে আর নতুন কিছু নেই, বরং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবৎকালে যা দেখে যেতে পারেননি, তাঁর সেই 'রক্তকরবী'-র মহত্তম প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়েছে কলকাতার মঞ্চে এই পঞ্চাশের দশকে, শান্তিনিকেতনবাসী কোনো রবীন্দ্রসাধক যা কোনোদিন কল্পনাতেও আনতে পারেননি। সেই বীরভূমে শান্তিনিকেতনসহ নানা জায়গায় পঞ্চাশের দশকে গণনাট্যধর্মী নবনাট্যের নাটক অভিনয়ের খবর মেলে, খবর মেলে নারী পুরুষের একত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিষেধ ভাঙার।

সিউড়ি শহরে জাগরণী সংঘ ১৯৫২-৫৩ সালে *'পথিক'* নাটক মঞ্চস্থ করে নারী চরিত্রে মহিলা শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে। ১৯৫৬-তে এ শহরেই গড়ে ওঠে মঞ্চকেন্দ্রম। এঁদের প্রযোজিত নাটকগুলি নির্বাচনের মধ্যে খুব বেশি দার্শনিক তাগিদ ছিল এমন নয়, তবে প্রতিটি নাটকের প্রযোজনাতেই আধুনিক প্রয়োগ ভাবনা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হত। এঁদের অভিনীত নাটকগুলি হল, *'বিসর্জন'*, *'কালিন্দী'*, *'দুই পুরুষ'*, *'ফেরারী ফৌজ'* প্রভৃতি। এর মধ্যে *'ফেরারী ফৌজ'* অবশ্য মঞ্চস্থ হয়েছে ষাটের দশকে ১৯৬৫-তে।[২৩] পঞ্চাশের দশক পার হয়ে ষাটের দশকেই বীরভূম নাট্যচর্চা প্রগতিশীলতার হাত ধরে।

পশ্চিমবাংলার সব চেয়ে বড় জেলা মেদিনীপুর। শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাধীনতা সংগ্রাম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতৃত্ব দেয় এই জেলা। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো এখানেও একদা কলকাতামুখীনতা ছিল, নিজস্ব উদ্যোগে মঞ্চ নির্মাণ ইত্যাদি হয়েছে; তবে লোকনাট্য যাত্রার চর্চাই এখানে বেশি হত। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যাত্রার যে আধুনিকীকরণ ও ব্যাপকতা ঘটে, তার প্রধান রসদ এই জেলাই সব চেয়ে বেশি সরবরাহ করে আসছে। তবু আধুনিক নাট্যচর্চার প্রতি এ জেলার আগ্রহ প্রমাণিত। পঞ্চাশের দশকে এখানে আধুনিক প্রগতিশীল নাট্যচর্চার দিশা দেখায় কৃষ্টি-সংসদ। ১৯৫৬ সালে গঠিত এই সংস্থা অরুণ মাইতির নেতৃত্বে ধনঞ্জয় বৈরাগীর *'রুপোলি চাঁদ'* মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলে দেন। মঞ্চচর্চা সংগীত প্রয়োগ ও অভিনয়ে *'রুপোলি চাঁদ'* সফল প্রযোজনার স্বীকৃতি পায়। এরপর অরুণ মাইতির পরিচালনায় *'নীচের মহল'*, *'রক্তকরবী'*, *'পথিক'*, *'মৌ চোর'* ও *'শেষ সংবাদ'*। মেদিনীপুর জেলায় কেন, মনে হয় সারা রাজ্যের কলকাতা ছাড়া সব জেলার মধ্যে এই প্রথম একটি সংস্থার এই পঞ্চাশের দশকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি নাটক নির্বাচনের

মধ্যে গণনাট্যের দার্শনিক ভিত্তি স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে, কৃষ্টি সংসদ তখনও গণনাট্যের স্বীকৃত শাখা নয়। ১৯৬২-তে ভারত চীন সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট মতাদর্শের মধ্যে অবস্থানগত যে সংগ্রাম শুরু হয়, তার প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্টি সংসদেরও ভাঙন আসে। সেই ভাঙনের জের টেনে অরুণ মাইতিরা খড়্গপুরে গিয়ে মশাল সংস্থা গড়েন। এই মশালের প্রযোজনাতেই অনল গুপ্তের নাট্যকাররূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে *'ন্যাশনাল পার্ক'* ও *'ওরা দুজন'*-এর মাধ্যমে। নাটক দুটি জনপ্রিয় হয় কিন্তু এ সব ষাটের দশকের কথা। এই ষাটের দশকেই কৃষ্টি সংসদের সংগীত পরিচালক বাসুদেব দাশগুপ্ত *'সমুদ্রের কান্না'* নাটক রচনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব নেন শ্রীজীব গোস্বামী নামে।

পঞ্চাশের দশকে এই সময়ে মেদিনীপুর শহরে পুরাতনপন্থী দলগুলি যেমন নাট্যশ্রী, শিল্পীসংঘ প্রভৃতি যথারীতি কলকাতার বোর্ডের জনপ্রিয় নাটকই মঞ্চস্থ করে যেত, কৃষ্টি সংসদের কার্যকলাপেও তাঁদের চেতনার পরিবর্তন হয়নি।

মহিষাদলে এই দশকে গণনাট্য নবনাট্যের ছোঁয়ায় ভাই-ভাই ক্লাব ১৯৫৬-য় মঞ্চস্থ করে *'ঘূর্ণী'*। এরপর এঁরা মঞ্চস্থ করেন *'সত্য মারা গেছে'*, *'দ্বান্দ্বিক'* ইত্যাদি। এই দশকে জেলার আর কোথাও তেমন সাড়া জগানো আধুনিকতা ছোঁয়া লাগেনি—যা কিছু হয়েছে সবই ষাটের দশক বা তারপর থেকে।

বাঁকুড়া জেলাতেও পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতা ও প্রগতির ছোঁয়া লেগেছিল সলিল ঘোষের উৎসাহে, অনাদি বসুর পরিশ্রমে। সে সব তথ্য সংগ্রহ ছিল। কিন্তু এই লেখার সময়ে সেগুলি মিলল না বলে বাঁকুড়ার কথা অসমাপ্ত রাখতে হল। এ জন্য দুঃখিত।

৩

শেষ কথা বাংলার থিয়েটারে স্বাধীনতা-উত্তর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ব্যর্থতা বিক্ষোভের ভাষায় বাংলা নাটক ও মঞ্চ যেভাবে অভিব্যক্ত হতে চেয়েছিল, রাজ্য রাজধানী কলকাতা কেন্দ্র থেকে গণনাট্য আন্দোলনের সংগঠিত উদ্যোগে বাংলা থিয়েটারের সেই অভিব্যক্তি মফস্বল বাংলার সর্বত্র পৌঁছতে এক দশকের কিছু বেশি সময় নিয়েছিল। একেবারে তাৎক্ষণিকভাবে ১৯৪৭-র সঙ্গে সঙ্গেই মফস্বল বাংলা সেভাবে ফেটে পড়েনি, থিয়েটার বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেরি হলেও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বঞ্চনার ক্ষেত্রে কিন্তু তেভাগার সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সম্প্রীতি রক্ষার সংগ্রাম তাৎক্ষণিকভাবে দানা বেঁধেছে। লক্ষ করার বিষয় এটা সব সময়েই ঘটে, সাধারণ মানুষ যখন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ঘৃণায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা যেন কিঞ্চিৎ দেরিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে; প্রতিভাবানদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম; যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল। মফস্বল বাংলার থিয়েটারের পঞ্চাশের দশকের এই হল বাস্তব চিত্র।

পাদটীকা :

১। *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ. সাংগঠনিক প্রতিবেদন.* পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫২ ৫৪।

২। *লোকনাট্য,* বীরেন রায় সম্পাদিত, ১৯৪৯। *দ্র নাট্য আন্দোলনে ৩০ বছর,* সুনীল দত্ত সম্পাদিত, ২য় সং. ১৯৮৭, পৃ: ৩১ ৪০।

৩। *Unity*, July 1952, দ্র. *Marxist Cultural Movement in India* Vol II, ed Sudhi Pradhan, 1982. 85-87.

৪। তদেব।

৫। তদেব, Vol I।

৬। তদেব, Vol I।

৭। তদেব, Vol II।

৮। *'অভিনয়ে অনেক সময় কোলকাতার মঞ্চসফল নাটককে সরাসরি অনুকরণ করতে বলা হত। দৃষ্টান্ত আছে কোলকাতায় বেড়াতে যাওয়া গোপালকিশোর রায়কে চিঠি পাঠিয়ে তৎকালীন পরিচালক ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় 'মাটির ঘর' নাটকটি দেখে আসতে বলেন। গোপালবাবু নাটকটি দেখে যান ও পরবর্তীকালে তন্দ্রার চরিত্রটি করেন।' কোচবিহারের নাট্যচর্চা একটি অনুসন্ধান.* দীপায়ন ভট্টাচার্য, *অভিনিবেশ* কোচবিহার, ১৯৯৭, পৃ. ১৬। কলকাতার নাট্যপ্রয়োগ দেখে সরাসরি নকল করার প্রবণতা তৎকালীন মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ এক সাম্প্রতিক স্বীকৃতি, এ রকম স্বীকৃতি আরো অনেক আছে।

৯। *ইতিহাস অন্বেষণ : জলপাইগুড়ি.* অপূর্ব মুখোটি দুলাল বিশ্বাস, *গ্রুপ থিয়েটার.* ১৮বর্ষ, ১ সংখ্যা ১৯৯৫।

১০। *ইতিহাস অন্বেষণ : মুর্শিদাবাদ.* দুলাল চক্রবর্তী, *গ্রুপ থিয়েটার.* ১৮বর্ষ ১ সংখ্যা, ১৯৯৫।

১১। *নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর* সুনীল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ২৬ ২৭।

১২। *ইতিহাস অন্বেষণ : উ: ২৪ পরগণা.* অহীন্দ্র ভৌমিক, *গ্রুপ থিয়েটার,* ১৮বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ:৫৫৭।

১৩। *গণ নব সৎগোষ্ঠী নাট্যকথা,* সুধী প্রধান, পুস্তক বিপনি, কলকাতা ১৯৯২, পৃ:২৪।

১৪। *কিছু কথা.* কিরণ মৈত্র, *সায়ক নাট্যপত্র.* বর্ষ ৫, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ:৪১।

১৫। *ইতিহাস অন্বেষণ : হাওড়া.* সৌমোন্দু ঘোষ, *গ্রুপ থিয়েটার,* ১৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আগস্ট অক্টোবর'৯৫, পৃ: ৫০৯ *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক* (২য় খণ্ড) পুলিন দাস, এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ১৯৯১, পৃ:২৭৪ ২৫৯।

১৬। *ইতিহাস অনুসন্ধান : উত্তর ২৪ পরগণা,* অহীন্দ্র ভৌমিক, *গ্রুপ থিয়েটার.* ১৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা ১৯৯৫, পৃ: ৫৬১।

১৭। *কোচবিহার নাট্যচর্চা : একটি অনুসন্ধান,* দীপায়ন ভট্টাচার্য, *অভিনিবেশ.* কোচবিহার, ১৯৯৭।

১৮। *উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা,* রামসিংহাসন মাহাতো, *বসুমতী শারদীয়া ১৪০১.* পৃ:১২৫। কুমারেশ দেবের সংযোজন, *ইতিহাস অন্বেষণ : জলপাইগুড়ি. গ্রুপ থিয়েটার* ১৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৬, পৃ:১৭৩।

১৯। *নবনাট্য আন্দোলন : মফস্বলে.* মানব চন্দ, *গন্ধর্ব* ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, শারদীয়া ১৩৬৮। *উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা,* রামসিংহাসন মাহাতো, *বসুমতী শারদীয়া ১৪০১.* পৃ:১২৮।

২০। *জেলা মালদহের নাট্যচর্চার চালচিত্র,* সিদ্ধার্থশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাট্যমঞ্চ,* ৩য় সংখ্যা, জানু '৯৯।

২১। *গণনাট্য আন্দোলন : নদীয়া অতীত ও বর্তমান,* মোহিত রায়, *গণনাট্য পঞ্চাশ বছর,* গণনাট্য সংঘ রাজ্য কমিটি, কলকাতা ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ:১৫৮। *নদীয়ার থিয়েটার,* সম্পাদনা অরুণ ভট্টাচার্য, হিনাস, চাকদহ, ১৯৮৯।

২২। *ইতিহাস অন্বেষণ : বর্ধমান,* দেবেশ ঠাকুর, *গ্রুপ থিয়েটার,* ১৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, আগষ্ট-অক্টোবর '৯৫ পৃ:৫১৮। গণনাট্য সংঘ : আসানসোল, রামশংকর চৌধুরী, *গণনাট্য পঞ্চাশ বছর,* গণনাট্য সংঘ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, ডিসেম্বর '৯৩, পৃ:১৫২।

২৩। *ইতিহাস অনুসন্ধান* : বীরভূম, বিজয়কুমার দাস, *গ্রুপ থিয়েটার,* ১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট অক্টোবর '৯৫, পৃ:৪৮৯।

২৪। *ইতিহাস অনুসন্ধান : মেদিনীপুর,* শ্রীজীব গোস্বামী, সুখেন্দু বেরা, দীপক মজুমদার *গ্রুপ থিয়েটার,* ১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট অক্টোবর '৯৫, পৃ:৫৩৫।

[*অসময়ের নাট্যভাবনা*, শারদ সংখ্যা ১৯৯৯]

বাংলা থিয়েটারে নবনাট্যের কাল

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করা যাক। আমরা যখন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি থিয়েটার বা নাট্যজগতের প্রতি আকৃষ্ট হই তখনই নবনাট্য আন্দোলন কথাটা একরকম চালুই হয়ে গিয়েছিল। সাল-তারিখের বিচারে কথাটা কবে কীভাবে চালু হয়েছে তা বিবেচনা করা আমাদের তারুণ্যের তখনকার দায় ছিল না। আমাদের তাগিদ ছিল এর মর্মমূলে প্রবেশ করে একে আরও গতিশীল ও তাৎপর্যময় করে তোলা। কিন্তু আন্দোলনের মর্মে প্রবেশ করে.যখন এর লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্কের সূচনা হল, তখন এর পবিত্র লক্ষণ বজায় রাখার জন্যই উৎসের গোমুখ অন্বেষণ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তা সে কথা বলার আগে তখনকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে নেওয়া যাক।

এটা বেশ মনে আছে, কলেজে ঢুকে ছাত্র-রাজনীতির সংস্পর্শ বাঁচিয়ে কেবল পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করা বা বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্যচর্চার অভিমান করাকে কেরিয়ারিস্ট বা প্রতিক্রিয়াশীল বলেই তখন চিহ্নিত করা হত। বিপরীতক্রমে ছাত্র-রাজনীতির প্রবল প্রবাহে সংলগ্ন থেকে ছাত্র ফেডারেশন করার মধ্যেই যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বা প্রগতিশীলতা, আর সেই অভিমানেই তখন শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থী আমরা আন্দোলিত হতাম।

নবনাট্যে যুক্ত হওয়ার পর জানতে পারলাম নবনাট্য হল গণনাট্যের একটা পাল্টা স্রোত। গণনাট্য আন্দোলন বা গণনাট্য সংঘ হল কমিউনিস্টদের সংগঠন। নবনাট্যের যাঁরা মাথা তাঁরা প্রায় সবাই গণনাট্যর প্রবর্তক বা সংগঠক। ছাত্র ফেডারেশনের পতাকাতলে সংগঠিত ছাত্র-যুবরাও তখন বামপন্থী শক্তিরূপে চিহ্নিত। কিন্তু কমিউনিস্ট নয়, কারণ ছাত্র রাজনীতির প্রবাহে শাসকশ্রেণী বিরোধী অবস্থান বেছে নিতে অসুবিধা হয়নি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের, কিন্তু রাজনীতির পাঠও নেওয়া হয়নি অনেকের। এই অনেকের মধ্যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষার্থীরা তখন হেমন্ত, দেবব্রত, দ্বিজেন, ধনঞ্জয়ের গান শোনা; জীবনানন্দ, সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাশ, মঙ্গলাচরণের কবিতায় আন্দোলিত হওয়া; নিউ এম্পায়ারে শম্ভু মিত্রের বহুরূপীর নাটক দেখা আর সময় সুযোগে উৎপল দত্তের লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত প্রান্তিক গোষ্ঠীর নাটক, শৌভনিকের গণরঙমহলের নাট্যোৎসবের নাটক দেখার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেতনায় ভেসে বেড়াতেন। পাশাপাশি ক্যালকাটা ফিলম সোসাইটির সদস্য হয়ে দেশ-বিদেশের প্রগতিশীল চলচ্চিত্র

দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়াও ছিল তখনকার প্রগতিশীল হাওয়ার দ্যোতনা। আর যাঁরা লেখালেখিতে আগ্রহী, তাঁরা *'পরিচয়'* ও *'নতুন সাহিত্য'* পত্রিকার জন্য মুখিয়ে থাকতেন, কিন্তু অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল *'দেশ'* পত্রিকায় স্থান করে নেওয়া। এই অবস্থার মাঝখানেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন প্রকাশিত *'একতা'* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আনন্দ ছিল প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত হওয়ার এক পৃথক অভিমান।

ছাত্র রাজনীতির বামপন্থী ধারায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আর একটা বড় ক্ষেত্র ছিল যুব উৎসবে শামিল হওয়া। তা গণনাট্য সংঘের নাম আমরা জানতাম, নাটক দেখার কথা তো আগেই বললাম— কিন্তু সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি নাট্যচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠার সময় গণনাট্য সংঘ থেকে কোনো ডাক পেলাম না, ডাক এলো সদ্যগঠিত নাট্যগোষ্ঠী গন্ধর্ব থেকে। যৌবনের প্রথমে সংবেদনশীল চিত্তে যে ডাকে আন্তরিকতা আছে, বিশ্বাস আছে, সেই ডাকে সাড়া দেওয়াটাই আগ্রহী যৌবনের ধর্ম।

বহুরূপী, এল টি জি-কে মডেল করে সেই সময় বেশ কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী সংগঠিত হয়। ক্যালকাটা থিয়েটার, রূপকার, অনুশীলন সম্প্রদায়, গন্ধর্ব, শৌভনিক. সুন্দরম, নান্দীকার প্রভৃতি সেই রকমের সুশৃঙ্খল নাট্যদল। এখানে তাস পাশা ফুটবল ব্যান্ডপার্টি বাৎসরিক সরস্বতী অর্চনা এ সব হয় না— নাটক ও তার প্রয়োগচর্চাই এই সব নাট্যগোষ্ঠীর লক্ষ্য ও কর্মসূচি। বহুরূপী গোষ্ঠীর নিজস্ব পত্রিকা ছিল। ঐ প্রেরণাতেই গন্ধর্ব-র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্যামল ঘোষ *'গন্ধর্ব'* নামে এক নাট্য পত্রিকা প্রকাশ করা ও সম্পাদনার জন্য ডেকে নিয়েছিলেন আমাকে। তখন সাহিত্য ত্রৈমাসিক *'যাত্রী'* সম্পাদনা ও *'ছোটগল্প'* নামে পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্য সংগঠক হওয়ার সুবাদে কিছু অভিজ্ঞ ভাবা হয়েছিল আমাকে। এই অবস্থায় *'গন্ধর্ব'* র প্রথম দুটি সংখ্যা মূলত স্মারক পুস্তিকাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পুরোপুরি পত্রিকা আকারে যখন দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে বেরোতে শুরু করল তখন পত্রিকা সম্পাদনায় পূর্ণ স্বাধীনতা পরিচালক শ্যামল ঘোষ-সহ সকল সদস্য আমায় দিয়েছিলেন এবং শেষদিন পর্যন্ত সে চুক্তি কখনও ভাঙেননি। আমার দিক থেকেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অটুট ছিল বলেই সব সময়েই আমরা পরস্পর মত বিনিময় করে নিতাম। এইভাবে সেই পঞ্চাশের দশকে বাম ছাত্র আন্দোলনের ভাসমান স্রোত থেকে বহু ছাত্রছাত্রীই তখন বিভিন্ন নাট্যদলে যুক্ত হয়ে গেলাম। কেউ অভিনয়ে, পরিচালনায়. কেউ নেপথ্যের কাজে; কেউ নাটক লেখায়, কেউ নাটক থিয়েটার বিষয়ে লেখালেখিতে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও তখন নাট্যাভিনয়ের ছোঁয়া লাগে। পঞ্চাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের একত্রে অভিনয়ের বাধা ছিল, শেষের দিকে কিংবা ষাটের গোড়ায় সে বাধা ঘুচে যায় নাট্যচর্চার জোয়ারে।

এই অবস্থার মধ্যে বাংলা থিয়েটার নিয়ে চর্চাটা ছিল সাধারণ মেধা থেকে উন্নত মেধার তরুণ-তরুণীর একত্র আত্মপ্রকাশের একটা বড় ক্ষেত্র। আর এইসব নাট্যগোষ্ঠীর সব

সংগঠক বা প্রধানরাই ছিলেন কোনো না কোনোভাবে ৪৩-৪৪-এ গড়ে ওঠা গণনাট্য সংঘের মূল স্রোতের প্রধান কর্ণধার বা অংশগ্রহণকারী শিল্পী, চিন্তক. সংগঠক। ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে এক দশকের সময়কালে শৌখিন নাট্যচর্চার বাইরে যে সব নাট্যদল সংগঠিত হয়ে অপেশাদার সিরিয়াস নাট্যচর্চায় অগ্রণী স্থান গ্রহণ করল, তাদের প্রযোজিত প্রথম দিককার অধিকাংশ নাটকই ছিল গণনাট্য ভাবনায় সমাজসত্যের দর্শন।

সুতরাং গণনাট্য ভাবনার বীজকে কেন্দ্রে রেখে এইসব নতুন ধারার নাট্যচর্চায় বাম মনোভাবাপন্ন ছাত্রযুবারা আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক শক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অতি বিস্তৃতির আশঙ্কা থেকে নতুন সদস্য বা কর্মী গ্রহণের অনিচ্ছাই প্রকট হয়ে পড়ে, পাশাপাশি এমন একটা ধারণা পঞ্চাশের শেষের দিকে প্রচারলাভ করেছিল যে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বাররাই গণনাট্য সংঘের সদস্য হতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি ১৯৫৭ সালই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় শেষ সম্মেলন। দ্রষ্টব্য সুধী প্রধান রচিত *Marxist Cultural Movement in India* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা। 'The two documents—peace cultural movement and living conditions of cultural workers are important for an understanding of the changed cultural line of the 1950's; these also indicate why the last All India Conference of the IPTA in 1957-58 was followed by the dissolution of the all India character of the movement. These documents reveal clearly the development of reformism which ultimately led to the liquidation of the marxist cultural fronts. শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধানের কাছ থেকে এ সব তথ্য অবশ্য অনেক পরে পাওয়া, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও যে গণনাট্য সংঘের উৎসবে বা সম্মেলনে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বা ব্যক্তিত্বরা আহূত হন, সে তথ্য তখন আমাদের জানা হয়ে গেছে।

কিন্তু যেহেতু আমরা গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নই, অথচ গণনাট্যের সঙ্গে একদা যুক্ত নাট্যব্যক্তিত্বরাই এই সব নাট্যগোষ্ঠীর সংগঠক পরিচালক বা নিউক্লিয়াস, তাই দলপতিদের নির্ধারিত লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির সঙ্গে গণনাট্যের প্রচারিত লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য না থাকায় আমাদের মনে হত আমরা সমাজ প্রগতির পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি। তবে গণনাট্য সংঘ বড় বেশি রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত, আমরা সেখানে রাজনীতির চাইতেও শিল্পসৃষ্টির রহস্যের মর্মকেন্দ্রে পৌঁছাতে আগ্রহী, যার দ্বারা 'নাটকের বিভিন্ন সমস্যা ও আধুনিক কালের নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাকে সংগ্রহ করার দিকে দৃষ্টি রাখা গেছে। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় এবং বাংলাদেশে নাটক বিষয়ে ব্যাপক চিন্তা ও চেষ্টার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস জীবনের যে সার্বিক সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, নাটক রচনার পক্ষে তাই প্রকৃষ্ট কাল।' কিংবা

'আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে ক্রমেই গড়ে উঠছে নাটক সৃষ্টির উপযুক্ত পটভূমি, গন্ধর্ব-র লক্ষ্য তাকে স্পষ্টতর করা। পরন্তু নাটকের মঞ্চগত আর্ট-এর প্রতিও 'গন্ধর্ব' বিশেষ উৎসাহী। এই দুইয়ের সমীকরণের চেষ্টাই গন্ধর্বর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলছে।' ১৩৬৫-র বসন্ত সংকলনে '*গন্ধর্ব*' পত্রিকা ও সংস্থার এই ছিল ঘোষণা। এর দুবছর আগে ১৩৬৩-র শ্রাবণ মাসে উৎপল দত্ত সম্পাদিত '*পাদপ্রদীপ*' পত্রিকার নান্দীতে লেখা হল : 'নবনাট্য আন্দোলনের মুখপত্রের পদ দাবি করাটা নিতান্তই স্পর্ধা বলে মনে হবে। নবনাট্য আন্দোলনের আদর্শ বিরাট; বাস্তব ক্ষমতা—আর্থিক ও সাংগঠনিক, অতি সামান্য। ...তত্ত্বগত আদর্শ যখন প্রেক্ষাগৃহের কাঠগড়ায় ওঠে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত জেরার চাপে এলোমেলো বকে; আন্তরিকতাকে তখন মনে হয় অলীক কল্পনা বিলাস; মঞ্চ প্রয়োগ কৌশল দেখা দেয় কতকগুলো অস্পষ্ট, অপরিণত ধারণারূপে। তবু এটাই আমাদের গৌরব। আজ দেশ জুড়ে চলেছে নানা ধরণের নানা আদর্শের নাট্যপরীক্ষা। একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিলই নেই—না বিষয়বস্তুতে, না আঙ্গিক পদ্ধতিতে। এই বহুমুখী পরীক্ষাই নাট্য আন্দোলনের অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।' বস্তুত ১৯৫৬-৫৮-র মধ্যে প্রকাশিত দুটি পত্রিকার যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা গেল, তার মধ্যেই এই আন্দোলনের লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু আজ বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রথম লক্ষ্য সমকালীন সামাজিক (আর্থ-রাজনৈতিক সহ) সংকটের মধ্য থেকেই নাটক রচনা ও প্রযোজনার মান উন্নত করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য নবনাট্য আন্দোলনের নাট্যরচনা ও প্রযোজনার মধ্যে যে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিদ্যমান, তাকে নাট্য আন্দোলনের ব্যাপকতায় গণতান্ত্রিক উপায়ে বিকশিত করা। উপরিউক্ত দুটি পত্রিকাই গণনাট্য সংঘ সহ বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী, এমনকী সাধারণ পেশাদার রঙ্গালয়ের নাট্যপ্রয়োগের প্রতিও তন্নিষ্ঠ দৃষ্টি রাখত।

২

নবনাট্য আন্দোলন গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই জন্ম নিয়েছিল গণনাট্য সংঘ পরিচালনার সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে। গণনাট্য সংঘের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তাকে দেশকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে উন্নততর সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে যথাবিধি প্রয়োগের সাংগঠনিক ব্যর্থতাই সংঘের নিউক্লিয়াসকে দুর্বল করে দেয়। এই প্রসঙ্গে সুধী প্রধানের ১৯৬৪-র মূল্যায়নের দিকে এক নজর তাকানো যেতে পারে :

'এই ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অবশ্য আলোচ্য। কারণ নবনাট্যেও পূর্বসূরী গণনাট্য আন্দোলন প্রধানত তারাই সংগঠিত করেছিল। প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, ক্রান্তি শিল্পীসংঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আদর্শভিত্তিক সংস্কৃতি দল গড়ে ওঠে, যারা নাট্য আন্দোলন বিস্তারে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'কমিউনিস্টরা পি সি যোশীর নেতৃত্বের প্রথম দিকে গণনাট্য দ্বারা সত্যই সাধারণ লোকের কাছে এবং সাধারণ লোকশিল্পী দিয়ে ক্ষেতে, খামারে, কারখানা ও জনসমাবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে।

তারপর কমিউনিস্টরা যেমন গান্ধী-জিন্না মিলনের নামে বুর্জোয়া নেতৃত্বে ভরসা শুরু করে দিল— তেমনি গণনাট্যও রবিশঙ্কর প্রভৃতি নামজাদা পেশাদার শিল্পী নিয়ে একাধিক বোম্বাই কেন্দ্রীয় দল (যার ভারতের মর্মবাণী ও অমর ভারত নৃত্যনাট্য বিখ্যাত) এবং কলকাতার দল গঠন করে আন্দোলনকে প্রায় গুটিয়ে ফেলে আদর্শবাদী তরুণ শিল্পীদের পেশাদারীর কবলে নিক্ষেপ করলো। এর ফলে অনুষ্ঠানের মান উঁচু হল—কিন্তু প্রদর্শনের ক্ষেত্র মাঠ ময়দান থেকে প্রধান প্রধান শহরের নাম করা মঞ্চে হতে লাগলো। শ্রমিক কৃষক শ্রোতা অপেক্ষা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর ফ্যাশনেবল সোশালিজমবিলাসী দর্শকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। প্রমোদ ব্যবসায়ী ও পেশাদার মঞ্চ মালিকরা যে পরিবর্তন আনতে সাহস পাচ্ছিল না লোকসানের ভয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির তৈরী সংস্কৃতি আন্দোলন সেই পরিবর্তন আনলো বটে কিন্তু তাদের অনভিজ্ঞতার দরুণ তা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।'

গণনাট্য সংঘের অন্যতম সংগঠক সুধী প্রধানের এই মূল্যায়নের উপরেই আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত টিকে যায়। শ্রীপ্রধান এর পরেও তদানীন্তন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যা লিখেছেন তাতে গণনাট্য সংঘ তার সংগঠন শক্তি নিয়ে কেন সেই যুগে এগোতে পারেনি তার প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়। শ্রীপ্রধান লিখেছেন :

'পি সি যোশীর আমলে যে ফসল অরাজনৈতিক ও পেশাদারী মনোভাবাপন্ন শিল্পী এসেছিলেন তাঁরা যোশী আমলের শেষ ভাগেই গণনাট্য ছেড়ে নিজ দল গড়ার চেষ্টা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসেছেন, বৃটিশ আমলের শেষ নির্বাচনে কংগ্রেস কমিউনিস্ট সংঘর্ষ হয়েছে, গণনাট্য সংঘের অফিস ও আবাসস্থল আক্রান্ত হয়েছে, অধ্যাপক নীরেন রায়ের মত শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতিবান লোক গুরুতর আহত হয়েছেন, গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সম্পাদক অধুনা বিখ্যাত অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়ীতে, গণনাট্য কর্মী সমাবেশের উপর স্টেনগান চালিয়ে দুটি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। গণসংস্কৃতির ময়দানে যাঁরা সৌখিন মজদুরী করতে এসেছিলেন—তাঁরা এই সকল ঘটনার পর গণনাট্যে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। অবশ্য অজুহাত দেখানো হল—পার্টি সংগঠকদের অযথা হস্তক্ষেপের নামে।

'এরপরই অবশ্য কমিউনিস্ট রাজনীতিতে রণদিভে যুগের অতিবাম বিচ্যুতির দিন এল। ইতিমধ্যেই যাঁরা চলে গিয়েছিলেন তাঁদের যুক্তির পিছনে এই রাজনীতি গুঞ্জন বাড়িয়ে দিল—ফিরে যাওযার আর কোন প্রশ্নই দেখা দিল না। কিন্তু ফল একেবারে বৃথা হ'ল না। যোশী-যুগে যেমন গণসংস্কৃতির রূপরেখা দেখতে পাওয়া গেল, কিছু নতুন দর্শকও সৃষ্টি হল তেমনি রণদিভে যুগে গণনাট্য আন্দোলন 'বিশেষজ্ঞ' দ্বারা শিল্পশিক্ষা ও মান উন্নয়নের পরিবর্তে তরুণ ও আদর্শপ্রাণ শিল্পীদের চেষ্টার উপর আবার নির্ভর করতে শুরু করল এবং পুলিশ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত নাম নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। আজ গণনাট্যের বাইরে অনেক দল তৈরী হলেও এইভাবে ১৯৫০ সালে গণনাট্যই নিজেকে স্বেচ্ছায় শত টুকরো করে তথাকথিত নবনাট্য আন্দোলনের সাংগঠনিক বনিয়াদ তৈরী করে দেয়।'

আজ এ কথা স্পষ্ট যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গণনাট্য আন্দোলন চল্লিশের দশকে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে বেশিদিন ধরে রাখতে না পারলেও দেশের অভ্যন্তরে যে সাংস্কৃতিক চাহিদা ও রুচি নির্মাণ করে দেয়, তার কেন্দ্রে ছিল শ্রেণীশাসন ও শোষণে নির্যাতিত সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষের দিনযাপনের গ্লানিবোধ ও হতাশাকে দূর করে তার মধ্যে জীবনটা যে কেবল বেঁচে থাকা নয়, একটা

সংগ্রাম, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শোষক-শোষিতের সংগ্রাম—এই সংগ্রামী মানসিকতাকে প্রবল করে তোলে গণনাট্য আন্দোলন। সেই সঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকারবোধ, তাকে অর্জন করা, বিকশিত করা, জাতপাত ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে মানবিকতার দাবি যে আরও বড়—সেই মূল্যবোধকে বিকশিত করে স্বশ্রেণীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ছিল গণনাট্যের বড় অবদান।

নবনাট্য আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সেই সময়কার নাট্যদলগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছে এমন তথ্য মিলবে না। নবনাট্য আন্দোলন মূলত জোর দিয়েছিল দেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাতাবরণে ক্লিষ্ট মানুষের জীবনের মঞ্চায়নের শিল্পগত বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণের উপর। সে ক্ষেত্রে নাটকের সাহিত্যগত মূল্য ও প্রযোজনাগত শিল্পসৌকর্য নিয়ে একটা ব্যাপক সাড়া জাগে নবনাট্য আন্দোলনের কালে। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির জগতে নিত্য নতুন প্রকাশ মাধ্যম অন্বেষণার ধাক্কাও এক একটা আন্দোলনের সূচনা করে। গণনাট্য আন্দোলন যদি গণমুখী শিল্পের আবেদনে ব্যাপক জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তবে নবনাট্য আন্দোলন, তার সংজ্ঞা নিয়ে যত তর্কই থাক, গণসংযোগের একটা শক্তিশালী মাধ্যম নাটক ও নাট্য নিয়ে সমাজমানসের শিল্পরসবোধের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে গিয়ে পৌঁছাতে চাইল। ১৯৫৬-য় *'পাদপ্রদীপ'* নবনাট্য আন্দোলনের কথা বললেও তার মুখপত্র হওয়ার দাবি যেমন করেনি, তেমনই ১৯৫৮-য় প্রকাশিত *'গন্ধর্ব'* ১৯৬০ এ পৌঁছেই তার তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যায় আত্মপরিচয়নামায় ঘোষণা করল 'নবনাট্য আন্দোলনেব একমাত্র ত্রিমাসিক মুখপত্র'। ঐ পত্রিকারই দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যায় আগস্ট-অক্টোবর ১৯৫৯-এ *'গন্ধর্ব'*-র পত্রিকা সম্পাদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল—'নবনাট্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটক সম্পর্কেও প্রগতিশীল পত্রিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে *'থিয়েটার'*, *'বহুরূপী'*, *'পাদপ্রদীপ'* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও *'বহুরূপী'* ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলি অধুনালুপ্ত। *'গন্ধর্ব'* এই নাট্য আন্দোলনের নতুন মুখপত্র।' দ্বিতীয় বর্ষের বর্ষশেষ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল 'নাটক যেমন গণতান্ত্রিক শিল্প, নাট্য পত্রিকা হিসেবে গন্ধর্ব সেই মর্যাদা রাখবে এই আমাদের ধারণা।' *'গন্ধর্ব'* যে সেই সময় নবনাট্য আন্দোলনের মুখপত্রের দাবিদার হয়ে উঠেছিল, তাতে কেউ আপত্তি করেননি এটা যেমন ঘটনা, তেমনই এটা যে সার্বিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঘটেছে তাও না। নাট্যগবেষক প্রভাতকুমার দাস এই প্রসঙ্গে সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে 'নাট্য আন্দোলনের নামে 'গন্ধর্ব' যে বিষয় ও লক্ষ্যে সমকালীন নাট্যকর্মীদের অবহিত করতে চান তাতে পারস্পরিক ঐক্যমতের পরিবর্তে, প্রকৃত বিচারবুদ্ধিসম্মত বিতর্ক উপস্থিত হয়।' *'গন্ধর্ব'* পত্রিকা এই বিতর্ক চেয়েছিল বলে ঐ বর্ষের সংখ্যাতেই শ্রীশম্ভু মিত্রের *'পর্যালোচনার ভূমিকা'* নামে একটি ছোট লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে শ্রীমিত্র লেখেন : 'আজ থেকে পনেরো বৎসর আগে বাংলায় নবনাট্য আন্দোলন দর্শককে বিস্মিত করে শুরু হয়। তারপর কতলোকের ক্রোধ ঈর্ষা অবজ্ঞা নিন্দাবাদ সত্ত্বেও এই নাট্যান্দোলন রয়ে গেল। খানি রয়ে গেল না, বেড়ে

গেল। এবং এই বেড়ে যাওয়া জোয়ারের জল এতোদূর গিয়ে পৌঁছে গেছে যে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আর একবার স্থির মাথায় ভাববার দরকার হয়েছে যে এখনও যদি নবনাট্যের প্রয়োজন থাকে তো সে নবনাট্যের চেহারাটা কী ?'

শ্রীমিত্র ঐ লেখায় নবনাট্যের চেহারাটা কেমন তার ব্যাখ্যা করেননি কিন্তু তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 'আজ নবনাট্য আন্দোলনের জয়-জয়কার। কিন্তু যখনই কোনও জিনিষের প্রচুর জয়ধ্বনি ওঠে তখনই তার ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায় এবং সে ভাঙ্গন থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো নতুনতর বোধে উত্তীর্ণ হওয়া। সেই বোধটাই আজ ভীষণ প্রয়োজন আমাদের।'

'বহুরূপী' পত্রিকাকেও *'ঘরোয়া'* বিভাগে নভেম্বর ১৯৬০-এর সংখ্যায় গঙ্গাপদ বসুকে লিখতে হল : 'বস্তুত নাট্য আন্দোলন কথাটা সম্বন্ধেই অনেকের ধারণা অনেক সময় স্পষ্ট নয় বলে দেখা যাচ্ছে। অনেক বিদগ্ধ সমালোচক এর এমন ব্যাখ্যা করছেন যাতে ব্যাপারটা আরো অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। কাকে বলবো নবনাট্য আন্দোলন ? কী রকম নাটককে বলবো নবনাট্যের নাটক ? যিনি যা করছেন তাই কি আন্দোলন, কেবল নতুন বলেই ? যিনি যা লিখছেন তাই কি নবনাট্যের নাটক, শুধুমাত্র আধুনিক বিষয়বস্তু বলেই ? মনে হয় এটা নিয়েই যথেষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত, তাতে ধারণা স্পষ্টতর হবে সম্পর্কিত সকলের।'

এই সময় থেকেই *'গন্ধর্ব'* ও *'বহুরূপী'* উভয় পত্রিকাতেই নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে একাধিক বিতর্কমূলক লেখালেখি শুরু হয়। ১৯৬১-র আগস্ট-অক্টোবর সংখ্যার *'গন্ধর্ব'*-র সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হল : 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের মরাগাঙে ভরা জোয়ার এনেছিলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। তারপর সে জোয়ার ভাঁটার মুখে পড়ে জল যথারীতি ঘোলা হয়ে ওঠার আগেই পুনরায় বান ডাকলো : তার নাম নবনাট্য আন্দোলন। যে সংগঠন শক্তি বিশিষ্ট ভাবাদর্শের নৈতিক বন্ধনে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে সর্বভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সজাগ প্রহরী করে তুলেছিলো, সময়, স্থান কর্মপদ্ধতির আভ্যন্তরীণ গোলোযোগে তা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত হলো।' নবনাট্য আন্দোলনের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা হল : 'নবনাট্য আন্দোলন প্রণাগত নাট্যভাবনার শিথিল অবিন্যস্ত রূপকে সংহত করে নতুন করে সঞ্জীবিত করেছে। বিগত দশক গেছে সম্পূর্ণ নাট্য অনুশীলনে, চলতি দশক থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নাট্যরচনায় যেমন তেমনি নাট্যপ্রযোজনায়। এখন নবনাট্যের প্রগতিপথে মূলত সংঘর্ষমান জীবনদ্বন্দ্বকেই মঞ্চ আলোয় সুস্পষ্ট করে তোলা যেখানে লক্ষ্য, সেখানে পুরানো দিনের ক্লাসিক নাটক যেমন নাটকের পুনরুজ্জীবন, তেমনি নতুন দিনের নতুন রীতির নাটক করতে বাংলা নাট্য প্রবাহে নতুন সংযোজন। ...নাট্য প্রযোজনাগত এমন শিল্পমুখীনতা বাংলা নাটকে পূর্বে ছিলো না, সেটা গণনাট্যের দান, এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।'

বস্তুত গণনাট্যের বাস্তববাদী নাট্যধারার কাছে ঋণস্বীকার করেই নবনাট্য চেয়েছিল শিল্পের অপরাপর প্রকাশ মাধ্যমগুলির পূর্ণ স্ফূর্তি। *'গন্ধর্ব'*-র এই সংখ্যাতেই প্রথম বেরোলো অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের *'পোস্টমাস্টারের বৌ'*, বিমল করের প্রথম পূর্ণাঙ্গ *'কর্ণকুন্তি সংলাপ'*, অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের *'চেনামুখ : অচেনা মানুষ'*, মনোজ মিত্রের *'নীলকণ্ঠের বিষ'*। প্রবন্ধ ছিল তুলসী লাহিড়ীর *'নাট্যকারের ধর্ম'*, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'নাট্যশালার ইতিবৃত্ত'*, উৎপল দত্তের *'খুন জখম'*, অমরনাথ পাঠকের *'যাত্রার ইতিবৃত্ত'*। পবিত্র সরকার সমালোচনা করেছিলেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সদ্য প্রকাশিত *'মহাকাব্য'* শীর্ষক এক সামাজিক প্রতীক নাটকের। সমালোচনাকালে পবিত্র সেই সময় যে প্রেক্ষিত উপস্থাপন করেছিলেন, সেই প্রেক্ষিতে উপনীত হওয়াও নবনাট্যের লক্ষ্য ছিল। পবিত্র লিখেছিলেন, 'যথার্থ সামাজিক নাটক বলতে যা বোঝায়, বাঙলা নাট্যসাহিত্য তার ঐতিহ্যকাল এবং পরিমাণের দিক দিয়ে খুব সমৃদ্ধ নয়। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ পর্যন্ত কবিরা ছাড়া এখানে কেউ প্রতীক নাট্যরচনায় সাহসী হননি। প্রতীক নাট্যের একটি বিশেষ অনুরাগময় আকর্ষণ আছে এই কল্পনাচারী কবিত্বের প্রতি, কিন্তু সাধারণ বাঙালী নাট্যকার সম্প্রদায় বোধ হয় বাস্তবচ্যুতির ভয়েই ওই কল্পনা এবং কবিত্বকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। ক্ষমতা-অক্ষমতার অস্বস্তিকর প্রশ্নটা না তোলাই ভালো। কবিরা জীবনের গভীরতর প্রকোষ্ঠগুলির সন্ধান রাখেন বলেই প্রতীকে তাদের অনায়াসসিদ্ধি—এরকম হঠকারী উক্তিও আমার মতো তটস্থের পক্ষে করা মুশকিল। কিন্তু ভেবে দুঃখ হয় এই যে, এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির হাতে যার জাতকর্ম সম্পাদিত হয়েছিল, সেই শিশুর ক্রমবর্ধমান পঙ্গুত্ব বাঙালী নাট্যকারদের একটি অবহেলাত্মক করুণার উদ্রেক করছে মাত্র, তার বেশি নয়। ...রবীন্দ্রনাথের পরেও অঙ্গুলিমেয় সংখ্যায় কয়েকজন কবি অত্যন্ত দ্বিধাভরে প্রতীক নাট্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন, তাঁদের সমস্ত আন্তরিকতা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে বাঙালীর সার্থকতা অকিঞ্চিৎকর। জাতির নাট্যরুচি, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্বার্থবুদ্ধিও এ জন্য নিশ্চয়ই দায়ী, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আধুনিক পৃথিবীর একটি বিচিত্র সম্ভাবনাময় গভীর অভিজ্ঞতাকে আমরা আমাদের রঙ্গ-চেতনায় উপযুক্তভাবে অভ্যর্থনা জানতে কুণ্ঠিত হয়েছি।'

নবনাট্য আন্দোলন সামগ্রিকভাবে জীবনের বহু বিচিত্রমুখীন অভিজ্ঞতাকেই আত্মস্থ করার চেষ্টায় নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করল। কাব্যনাট্যচর্চা ছিল তার অন্যতম দিক। ১৯৬২-র *'গন্ধর্ব'* আগস্ট-অক্টোবর সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'নবনাট্য আন্দোলনের পরিণতি : নবনাট্যের সূচনায়।' তাতে এই নাট্য আন্দোলনের কালসীমা নির্ণয় করা হল এইভাবে : 'উনিশ শ' ষাট বা একষট্টি সাল পর্যন্ত নবনাট্য আন্দোলনের ব্যাপকতার গতিপথে যদি সময়সীমা টেনে তার সূত্রপাতের দিকে পশ্চাৎমুখী হওয়া যায়—তাহলে সময়ের বিচারের নবনাট্য আন্দোলনের বয়স মোটামুটি বছর দশেক—এই জাতীয় একটা হিসেবই পাওয়া যায়। (আমাদের ধারণায় অবশ্য

১৯৫৪ সালেই নবনাট্য আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষণ চিহ্নিত হয় বহুরূপীর 'রক্তকরবী'-র প্রযোজনাসূত্রে, তবু আরো বছর দুয়েক প্রস্তুতির জন্যও অন্তত হিসেবে রাখা দরকার।)'

১৯৫৪-য় বহুরূপীর *'রক্তকরবী'* প্রযোজনা বিষয়ে আঙ্গিকে যে নতুন নাট্য উপলব্ধির জন্ম দিল তার গভীরতা ও ব্যঞ্জনা ছিল বহুমাত্রিক। গণনাট্য সংঘ গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল বাংলা থিয়েটারকে বাস্তববাদী প্রয়োগরীতির অভিমুখে সঞ্চালিত করে। সেই প্রয়োগরীতিরই উপর্যুপরি প্রয়োগে বহুরূপী ততদিনে *'নবান্ন'* (১৯৪৮) *'পথিক'* (১৯৪৯, *'উলুখাগড়া'* (১৯৫০), *'ছেঁড়াতার'* (১৯৫০), *'বিভাব'* (১৯৫১), *'চার অধ্যায়'* (১৯৫১), *'দশচক্র'* (১৯৫২), *'ধর্মঘট'* (১৯৫৩) পর্যন্ত নাট্য বাস্তবতার একটা মাত্রা ছুঁয়েছেন, দর্শকের একটা প্রত্যাশা জন্মেছে— সেই প্রত্যাশাকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক বলে খ্যাত *'রক্তকরবী'*র বৈপ্লবিক বাস্তবতার মর্মবস্তুকে প্রকৃত দৃশ্যগুণের চমৎকারিত্বে মঞ্চভাষা দিল বহুরূপী।

*'রক্তকরবী'*র বিষয় ও তার রূপারোপের বহুমাত্রিকতা নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই একাধিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতাদের ধাঁধায় ফেলেছেন, তারপর তাদের রূপক সাংকেতিক প্রতীক নাটকের জটিল ব্যাখ্যায় *'রক্তকরবী'*র নাট্যগুণ ও মর্মবস্তু যখন গ্রন্থবন্দী হয়ে আছে, তখন বহুরূপীর শ্রীশম্ভু মিত্র সেই *'রক্তকরবী'*র সহজগ্রাহ্য মর্মরূপটি অনায়াসে মুক্ত করলেন অভিব্যক্তিধর্মী মঞ্চমায়ায়। কৃষিজীবী সভ্যতার বুকে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে যন্ত্রসভ্যতার শিল্পসমৃদ্ধি কীভাবে মানুষকে শোষণ করে ছিবড়ায় রূপান্তরিত করে এবং সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রক্তকরবীর মঞ্জরী-পরা নন্দিনী শ্রমিকদের সংগঠিত করে বিপ্লবের ডাক দেয়—'রঞ্জন' আসবে বলে। 'রঞ্জন' হল বিপ্লবী শক্তি। সেই বিপ্লবেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে রাজা, যে আজ বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের আমলাতন্ত্রের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নাট্য পরিণতিতে রাজার হাতে রঞ্জনের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু রাজার আত্মোপলব্ধিতে তারই হাতে যক্ষপুরীর সকল বাঁধন ভেঙে পড়েছে।

এই *'রক্তকরবী'*র যে ব্যাখ্যা সেদিন বহুরূপী দিয়েছিল তা কী রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে কোনো ব্যাখ্যা; নাকি গণনাট্য প্রবর্তিত নতুন গণমুখী নাট্যসংস্কৃতিরই এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্য উপলব্ধি সেদিন নবনাট্যের সংকল্প বাক্য হয়ে উঠেছিল। তবে এ কথা ঠিক নবনাট্য ও গণনাট্যের মধ্যেকার পার্থক্যটা সেদিনের নাট্যপ্রেমী দর্শকের কাছে খুব তীব্র কিছু ছিল না। মতাদর্শের লড়াইটা শিল্প ও শিল্পীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

গণনাট্যকেই *'নবান্ন'* প্রযোজনার সমালোচনা সূত্রে সেদিনের অনেক সমালোচক নবনাট্য ধারার প্রবর্তন বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আবার গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসার পর শ্রীশম্ভু মিত্র ঐ গণনাট্যের যুগকেই নবনাট্যের যুগ বলে চিহ্নিত করতেন। বিপরীতে *'নবান্ন'*র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর ক্যালকাটা থিয়েটার পর্বের সব কাজকেই গণনাট্য আন্দোলনের কাজ বলে দাবি করলেন। উৎপল দত্ত একদা নবনাট্য কথা

ব্যবহার করলেও উত্তরকালে গণনাট্য আন্দোলন এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরেছেন বরাবর, এমন কী আজকের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ধারণাকেও তিনি নস্যাৎ করেছেন একাধিকবার।

গণনাট্য আন্দোলন থেকে নবনাট্য আন্দোলন প্রকৃতই এক পৃথক নাট্যপ্রবাহরূপে সূচিত হয়েছিল, যার অস্তিত্ব ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৬৪ থেকে পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য সংঘ জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে সংগঠিত হয় আশু সেন, চিররঞ্জন দাস প্রভৃতির উদ্যোগে। গণনাট্য সংঘর এই নতুন শক্তির উত্থানের নেপথ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন যেমন একটা ভূমিকা পালন করে, তেমনই দেশের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান ছিল দিকনির্ধারক প্রেরণা। এ ছাড়া তদানীন্তন কংগ্রেসি অপশাসন ও অর্থহীন কমিউনিস্ট জুজুর বানানো ভীতিকে অস্বীকার করে মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির ওপরই আস্থা রাখছিলেন। এ অবস্থায় গণনাট্য বনাম নবনাট্যর বিতর্কে গণনাট্যই জয়ী হয়।

নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সব কিছুর ভালোমন্দ বুঝে নেওয়া। দেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিদেশীয় শিল্পসংস্কৃতির বিভিন্ন ঝোঁককে আত্মস্থ করাও নবনাট্যের লক্ষ্য ছিল। নাট্যভাষার নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবাহে পড়ে ক্লাসিক নাটক যেমন বাছা হয়েছে, তেমনই বিদেশীয় শিল্পরীতির পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য অনেক সময় বুর্জোয়া ধ্যানধারণার শিল্পাঙ্গিকের শিকার হয়েছে। বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু গণনাট্য থেকে নবনাট্যের বাহিত হয়ে এসেছে তার প্রয়োগের নতুন মাত্রা একটা সুনির্দিষ্ট অভিমুখ খুঁজে পায় কমিউনিস্ট নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখটের নাট্যাবলি প্রয়োগের মধ্যে। ব্রেখট যখন নবনাট্যের মূলস্রোত হতে পারতেন, ঠিক সেই সময় অ্যাবসার্ড থিয়েটারের জীবনদর্শন ও তার একাধিক নাট্যকারের নাটক বাংলার নবনাট্য আন্দোলনে স্থান করে নেয়। এর আগেই অবশ্য অ্যান্টি থিয়েটারের প্রবক্তা পিরানদেল্লো জনপ্রিয় হয়েছেন নান্দীকারের অজিতেশ রুদ্রর উদ্যোগে। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার অন্তঃসার-শূন্যতা বোঝানোর জন্য এই অ্যাবসার্ড থিয়েটার ঐ এক দশকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে বাদল সরকার এই কিমিতিধর্মী নাটকের জোয়ার বইয়ে দেন। *'গন্ধর্ব'* পত্রিকা, *'বহুরূপী'* পত্রিকা ও নক্ষত্র, বহুরূপী, শৌভনিক এবং শতাব্দী এই স্রোতের যখন মূল চালিকা শক্তি, সেই সময়েই দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক জীবনে যে মোচড় আসে, তাতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার সবাই ঘুরে দাঁড়ান। মোহিতের *'গিরগিটি'* যা *'রাজরক্ত'* নামে থিয়েটার ওয়ার্কশপ থেকে প্রযোজিত হয়, ঐ প্রযোজনা থেকেই বাংলা থিয়েটারে আবার বামপন্থী চিন্তন চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কথা ঠিক নবনাট্য আন্দোলন ছিল বাংলা থিয়েটারে সৃজনশীলতার এক ঝটিকা প্রবাহ।

[*২০০ বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার,* গণেশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিশ্বকোষ পরিষদ, ১৯৯৭, পৃ· ২৭৫ ২৮২]

বাংলা থিয়েটার
আঞ্চলিকতা থেকে আন্তর্জাতিকতায়

বাংলায় ব্রেখ্‌ট

বিবি। এ সংক্ষেপীকরণ 'বিশ্ববিখ্যাত'—এই শব্দযুগলের হতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার থিয়েটার জুড়েই এ সংক্ষেপীকরণের অর্থ হল বের্টোল্ট ব্রেখট—বি বি। আজ আমরা সেই বের্টোল্ট ব্রেখটের জন্ম শতবর্ষে পৌঁছে যখন গেছি, তখন বাংলায় ব্রেখট চর্চার বয়সই সাতান্ন ছাড়িয়ে গেল। ব্রেখট সুনিশ্চিত বাঙালি নাট্যকার বা নাট্যনির্দেশক নন, কিন্তু বাংলার প্রিয় নাট্যকার। বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাবনার যে সকল নাট্যকার বা নির্দেশক-অভিনেতা আমাদের বাংলা থিয়েটারের প্রাণকেন্দ্রে স্থান করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় ব্রেখট শেকসপিয়রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। শেকসপিয়র বাংলায় জনপ্রিয় হয়েছেন পঠনপাঠনের মাধ্যমে আর ব্রেখট জনপ্রিয় হয়েছেন অভিনয়ের মাধ্যমে। পঠনপাঠনে শেকসপিয়র আমাদের দেশে আবশ্যিক আর ব্রেখট যেন ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক বলেই ব্রেখট বিশেষজ্ঞতা দাবি করেন। ঐচ্ছিক বলেই ব্রেখট চর্চায় বাংলার বিশিষ্ট অভিনিবেশ সব একমুখী হয়নি, তত্ত্বঘেঁষা না হয়ে স্বাধীন, স্বতস্ফূর্ত হয়েছে। বিচিত্র, বহুমুখী হয়েছে।

বাংলায় ব্রেখট জনপ্রিয় হওয়ার কারণ ব্রেখট মার্কসবাদী দর্শনে কেবল বিশ্বাসী নন, একজন কমিউনিস্টের মতো তার প্রচারক এবং সমালোচকও। আর বাংলা থিয়েটারে তার উনিশ শতকীয় প্রতিবাদী ঐতিহ্য বহন করে বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারাবাহিক প্রয়োগে লালিত পালিত। বিপরীতভাবে মার্কসীয় মতাদর্শ বিরোধী ভাবধারাও আসে কত কানে মন্ত্রণার মতো এই মূলস্রোতে ঢুকে পড়েছে, পড়ার চেষ্টা করছে।

ব্রেখ্‌ট বাংলায় প্রথম আদৃত হয়ে অনূদিত হন ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের কলমযুদ্ধের কালে। অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বা ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে ওঠে প্রগতি লেখক সংঘের নাম পাল্টে। তার আগে প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম মুখপত্র *'অরণি'*-তে সর্বপ্রথম ব্রেখ্‌টের নাটক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ব্রেখ্‌টের *'দ্য জিউস ওয়াইফ'* প্রকাশিত হল *'আচ্ছা তাহলে চললাম'* নামে। পরের বছরই ঢাকায় গল্পকার সোমেন চন্দ হত্যার মধ্য দিয়ে হিটলারি ফ্যাসিবাদ যেন কমিউনিস্ট নিধনের জন্য এই দূর দেশেও থাবা বাড়াল। অচিরেই প্রগতি লেখক সংঘ ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ রূপে আত্মপ্রকাশ করল। আর বীরেন দাশের অনুবাদে ব্রেখটের *'ফিয়ার অ্যান্ড মিজারি অব্ দ্য থার্ড রাইখ'*, *'হিটলার জার্মান'* নাম দিয়ে *'অরণি'*-র প্রথম বর্ষ চব্বিশতম

(৬ ফেব্রুয়ারি ৪২) সংখ্যায় প্রকাশিত হল।[১] *'দ্য প্রাইভেট লাইফ অব দ্য মাস্টার রেস'* বা *'ফুর্চট উনট এলেন্ড ডেস্ ড্রিটেন রাইখোস'* প্যারিসে বসে ব্রেখ্ট রচনা করেন ১৯৩৭-এ। প্রযোজনা করেন ওইখানেই ১৯৩৮ সালে। মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪১-এ। আর কত তাড়াতাড়ি ওই নাটকেরই দুটি দৃশ্য বাংলায় অনূদিত হয়ে গেল। বাঙালির ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে এইভাবে সুদূর জার্মানির নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখ্ট সংগ্রামের সাথী হয়ে উঠলেন, যদিচ ব্রেখ্ট তখন হিটলারের হত্যা তালিকাভুক্ত বলে দেশান্তরী। জুরিখে আশ্রয় নিয়ে ১৯৪১-এর ফেব্রু-এপ্রিলে *'মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন'* রচনা-প্রযোজনায় ব্যস্ত। *'অরণি'*-র উক্ত ত্রয়োদশ সংখ্যায় অনুবাদক ব্রেখ্টের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন :

'Bertolt Brecht - একজন জার্মান কম্যুনিস্ট কবি ও নাট্যকার। প্রথম জীবনে ব্রেখ্ট বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেন। ১৯২৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পর তিনি সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের পর জার্মানী ত্যাগ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি সরকার পক্ষে যোগদান করেন এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী 'Senora Carrar's Rifle' নামে একটি নাটক রচনা করেন। ব্রেষট এর কাব্যরীতির কাছে ইংল্যান্ডের আধুনিক কবি Auden বিশেষভাবে ঋণী। ব্রেষ্ট এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাষা ও রচনাভঙ্গী।'

১৯৪১-এ বাংলার বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী সংস্কৃতিকর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে ব্রেখটের এ পরিচয় যে যথেষ্ট সাম্প্রতিক ও তরতাজা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম নাটিকা *'আচ্ছা তাহলে চললাম'*-এর নাট্যবস্তু হল নাৎসিবাহিনী কর্তৃক ইহুদি নির্যাতনেব এক মর্মান্তিক ঘটনা। একজন জার্মান চিফ সার্জেনের স্ত্রীকে তাঁর জন্মভূমি জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে যেহেতু তিনি ইহুদি ঘরের সন্তান। কী ভয়ংকর জাতিবিদ্বেষ! আর দ্বিতীয় নাটিকা *'ডের সিপটয়েন্স'* এর বঙ্গানুবাদ, *'হিটলার জার্মান'* যেটি পরে *'সন্ত্রাস'* নামে ১৯৬৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়।

কবি ও মার্কসবাদী সমালোচক ধনঞ্জয় দাশ ইন্দো-জি ডি আর মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে ১৯৮১ সালে উপরিউক্ত অনুবাদ দুটি একত্রে *'ব্রেখ্ট-এর নাটিকা'* নাম দিয়ে সম্পাদনা করে প্রকাশ করে বাংলাভাষায় ব্রেখট চর্চার সূচনাপর্বের সঙ্গে আমাদের ওয়াকিবহাল করেন। এই ছোটগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে অরুণ মিত্র অরণি গোষ্ঠীর লেখক হিসেবে যথার্থই লিখেছেন :

'ফ্যাসিজম সমস্ত পৃথিবীকে অনন্ত অন্ধকারে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছিস, সাম্রাজ্যবাদী যোগসাজসে তার আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল সমস্ত মানবিক মূল্যের বিরুদ্ধে। সে অবস্থায় সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করা সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীর নিজেদের দায় হিসেবে দেখা দিয়েছিল। সেই দায়িত্বের প্রতিফলন ছিল *'অরণি'*তে।

সুতরাং তার মনোধর্মের মহৎ প্রতিনিধি বেরটলট ব্রেষটকে তখন আবিষ্কার করতে তার দেরি হয়নি।'

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের মহত্তর মনোধর্মের মহৎ প্রতিনিধি ব্রের্টোল্ট ব্রেখটকে বাংলার জাগ্রত চৈতন্য যে তার সূচনাকালেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল তাঁর কারণ মার্কসীয় মতাদর্শে যে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই উন্নত ও অনুন্নত সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল, বাংলা তথা ভারতে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট আন্দোলন তার অগ্রণী। বের্টোল্ট ব্রেখট মার্কসীয় মতাদর্শের শৈল্পিক উপস্থাপনে তাঁর সময়কালে অগ্রণী নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলত বাংলা তথা সমগ্র ভারতের প্রগতিশীল মহলে ব্রেখ্‌ট এই কারণে থিয়েটারের অঙ্গনে অতিদ্রুত স্থান করে নিতে পারলেন।

এই কমরেড ব্রেখটকে এরপর বাংলা থিয়েটার ও চিন্তা-চেতনার জগতে ধীরে ধীরে ছোট ছোট প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মূলস্রোতের মধ্যমণি হয়ে উঠতে দেখব। কিন্তু তার আগে জার্মানির আউসবুর্গে জন্মানো বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট কীভাবে এই বাংলার রণরক্ত ব্যর্থতার হদিস নিয়ে নাটক লিখে ফেলেছিলেন বন্ধু লিয়ন ফয়েস্টভাঙ্গার-এর সহযোগে সে তথ্য আমাদের জানতে হবেই।[২] জানার সুযোগ মিলে যায় *'বাংলার ব্রেখ্‌ট চর্চা'*-র প্রবন্ধকার সরোজমোহন মিত্রের *'গ্রুপ থিয়েটার'*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সেই সঙ্গে জেনে যাই আর এক আত্মীয়তামূলক যোগসূত্র। আমাদের বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩-য় যে *'গীতাঞ্জলি'*-র ইংরেজি অনুবাদ *'দ্য গার্ডেনার'*-এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান, সেই গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ পড়ে সতেরো বছর বয়সি কিশোর ব্রেখট তার সমালোচনা নিবন্ধ লিখে ফেলেন। ১৯১৪ সালের ৯ অক্টোবর জার্মানির আউসবুর্গের থেকে প্রকাশিত *'পয়েন্টে পার্থারস্টেপ'* পত্রিকায় সেই লেখাটি প্রকাশিত হয়।

ব্রেখ্‌ট তাঁর কৈশোর থেকেই যেমন বিশ্বজনীন মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন, তেমনই সেই মানসিকতা থেকেই বোধ হয় নোবেল লরিয়েট টেগোরের দেশ ভারতবর্ষ তথা বাংলায় কীভাবে ইংরেজ শাসন কায়েম হয়ে বসল শোষণ, ছলচাতুরিকে হাতিয়াব করে, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন লিয়ন ফয়েস্টভাঙ্গার-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে।

১৯১৫ সালে ব্রেখ্‌ট আঠারো বছরের তরুণ। এই সময়ে ব্রেখটের বন্ধু ফয়েস্টভাঙ্গার *'ওয়ারেন হেস্টিংস, গভর্নর অব ইন্ডিয়া'* নামে এক নাটক লেখেন। ১৯১৬ সালে নাটকটি প্রকাশ পেলে ব্রেখ্‌টও স্বভাবত এ সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেন। ইতিমধ্যে ১৯২২-এ ব্রেখ্‌ট তাঁর *'বায়াল'*, *'ড্রামস ইন দ্য নাইট'* ও *'ইন দ্য জাঙ্গল অব্‌ সিটিজ'* তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে ফেলেছেন। ফয়েস্টভাঙ্গারের সঙ্গে যৌথভাবে মার্লোর *'এডোয়ার্ড ২য়'* অবলম্বনে *'লাইফ অব্‌ এডোয়ার্ড টু অব ইংল্যান্ড'* লিখলেও নাটকটি ব্রেখ্‌টের রচনা বলেই স্বীকৃত। ১৯২৫-২৬ সালে এই দুই বন্ধুর সম উদ্যোগে ওয়ারেন

হেস্টিংস অবলম্বনে উক্ত নাটকটি পুনর্লিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়। নাম হয় *'কলকাতা ৪ মে'* (Kalkutta, 4. Mei)। তিন অঙ্কে ভারতীয় উপনিবেশের একটি কাহিনী। বঙ্গানুবাদে নাটকটি প্রথম বেরোয় সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠীর অশোক সেনের অনুবাদে *'কলকাতা ৪ঠা মে'* নামে *'বিচিন্তা'* পত্রিকায় ১৯৭৪ সালে এবং অভিনীত হয় ওই সালেই সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠীর শিল্পীদের দ্বারা। দ্বিতীয় অনুবাদ হয় ১৯৯৪ সালে, এপি প্রকাশক বইমেলায় গ্রন্থটি প্রকাশ করে। অনুবাদক দেবব্রত চক্রবর্তী। ইনি মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেন। থিয়েটার আর্টস এই অনূদিত নাটকটি প্রযোজনা করে অমিতাভ রায়ের উদ্যোগে নির্দেশক উজ্জ্বল সেনগুপ্তের নির্দেশনায়। কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন ও জার্মানির কনসাল জেনারেলের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় ব্রেখটের *'কলকাতা ৪ মে'* এই প্রথম অভিনীত হয়। ব্রেখট শতবর্ষের চার বছর আগে কলকাতা ব্রেখটকে এই ভাবে তাঁর ভালোবাসা ও সংবেদনশীলতার প্রতি উত্তর দিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত করেছে। ব্রেখটের প্রথম দিকের রচনা বলে ব্রেখট-নাট্যশৈলীর সব বৈশিষ্ট্য এতে ধরা পড়ে না। তাই বলে নাটকটি কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। ব্রেখট যে রাজনৈতিক ব্যঙ্গে বিশ্বত্রাস হিটলারকে ক্ষতবিক্ষত করবেন, তাব পূর্বাভাস চমৎকারভাবে *'কলকাতা ৪ঠা মে'*-র নাটকের বিন্যাসে, ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্র রচনায়, সংলাপের বয়নে ফুটে উঠেছে। ব্রেখটকে যাঁরা তাঁর আঙ্গিক-কুশলতার জন্য বড়ো করে দেখেন বা দেখাতে চান তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষমতা ও পক্ষপাতিত্বকে উপেক্ষা করে, তাঁরাই *'কলকাতা. ৪ মে'*-কে কাঁচা নাটক বলবেন। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের সেইসব নাট্যপ্রযোজক বা নির্দেশক যাঁরা ব্রেখট প্রয়োগে সুনিশ্চিতভাবে কয়েকবার মহৎ ব্যর্থতা বরণ করেছেন।

'কলকাতা, ৪ মে' নাটকের মধ্যে ব্রেখট ওয়ারেন হেস্টিংসের যে জটিল চরিত্র নির্মাণ করেছেন, সেই রকমের জটিল চরিত্র ব্রেখটের একাধিক পজিটিভ হিরো বা নেগেটিভ হিরোর মধ্যে পরবর্তীকালে ফুটে উঠতে দেখি আমরা। পররাজ্য শোষণ ও শাসনের মধ্যেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মানবিকতার সুবিচার প্রত্যাশী বলে তার কাউনসিলরদের পাঠিয়েছে গভর্নর হেস্টিংসের কার্যপ্রণালিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। হেস্টিংস, ছলচাতুরি করে ইংরেজ তথা নিজের স্বার্থ পূরণ করে গেছে। দেশীয় মহারাজা নন্দকুমারের নামে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগে তার ফাঁসি দিয়েছে। এ সব ঘটনাই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে ব্রেখটের নাটকে। ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের ভেতর-বারকে নগ্ন করার মধ্যে ব্রেখটের রাজনৈতিক মনোভঙ্গি স্পষ্ট। এ নাটকের কলকাতার গভর্নর হাউসসহ অষ্টাদশ শতকের কলকাতা তথা বাংলার যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে ওঠে নেটিভ বা বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে, বারওয়েল, কাউপার, গভর্নর হেস্টিংস, লেডি মার্জারির তীক্ষ্ণ সংলাপে।

ব্রেখট এরপর *'ম্যান ইসট ম্যান'* নামে যে নাটকটি লেখেন, তাতেও ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট ধরা পড়েছে। ১৯২৭-এ লেখা এ নাটকটি ভারতে প্রবাসী ইংরেজ লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর *'ব্যারাক রুম ব্যালাডস'* অবলম্বনে রচিত।

স্বভাবতই ভারত সম্পর্কে ব্রেখট যে হঠাৎই আগ্রহী হযে পড়েছিলেন এমন তো ঘটনা নয়। জার্মানির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তি অনেক দৃঢ়মূল হয়েছিল কার্ল মার্কসের ইতিহাস অবলোকনের সূত্রে; ১৮৫৩-য় ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফল রচনার মধ্যে ভারতের স্বনির্ভর জনগণ ও মানব সম্পদের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন মার্কস। হেগেলের ভারত চিন্তার রোমান্টিকতাকে বাস্তবসম্মত রূপ দেন মার্কস। সেই মার্কসের ভাবাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার প্রাককালেই ব্রেখট ভারত তথা বাংলা তথা কলকাতা সম্পর্কে কী গভীর অনুসন্ধানী আলোকপাত করেছেন! সুতরাং এই ভারতের মাটি বিশেষত বাংলার বামপন্থী মাটি তথা কলকাতার মঞ্চে মঞ্চে ব্রেখটের বিচরণ যে জীবন্ত হয়ে উঠবে এ তো আশ্চর্যের কিছু নয়। আজ ব্রেখট শতবর্ষের বছরে বাঙালি কি আর একবার *'কলকাতা ৪ মে'* নাটকটির অভিনয় দেখতে পাবে না অমিতাভ রায় কিংবা অন্য কোনো নবীন পরিচালকের উদ্যোগে ?

২

১৯৪১ ৪২-এর ব্রেখট,. বাংলায় অনূদিত ব্রেখট, প্রথম অভিনীত হয়েছেন ষাটের দশকের গোড়ায়। ১৯৬১-তে গণনাট্য সংঘের দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ শাখা ব্রেখটের *'দ্য একসেপশন অ্যান্ড দ্য রুলস'* অবলম্বনে বাংলায় রূপান্তরিত *'আইন'* প্রথম মঞ্চস্থ করে। এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে এটিই প্রথম ব্রেখট প্রযোজনা। এ কথা ঠিক ষাটের দশকে ব্রেখট যখন কলকাতার মঞ্চে নবনাট্য আন্দোলনের প্রবক্তা বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর প্রিয় নাট্যকার হয়ে উঠবেন, তার সূচনা ঘটল কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের প্রবক্তা গণনাট্য সংঘেরই শাখার দ্বারা। পরবর্তীকালে দেখা যাবে গণনাট্য সংঘ যত না ব্রেখট মঞ্চস্থ করেছেন, তার চেয়ে বেশি ব্রেখট করেছেন নবনাট্য ভাবনার বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী, কিংবা নবনাট্য-উত্তর বিভিন্ন গ্রুপ থিযেটার। ষাট, সত্তর, আশির দশক পর্যন্ত বাংলার প্রগতিশীল থিয়েটারের একটা বড় অংশই ব্রেখটের নাট্য প্রযোজনায় উৎসাহী হয়েছিল। এমন হয়েছে একই সময়ে একই নাটক দুটি তিনটি দল ভিন্ন ভিন্ন নামে মঞ্চস্থ করেছে; অবশ্য এদের মধ্যে সেটিই জনপ্রিয় হয়েছে যার উপস্থাপনে যত্ন ও যুক্তি ছিল, তা রূপান্তরিত বা অনূদিত যাই হোক না কেন।

আমাদের প্রশ্ন গণনাট্য সংঘের শাখা ব্রেখট করছে না ব্রেখট করছে সেই সব নাট্যগোষ্ঠী যাদের বড় অংশই গণনাট্য সংঘের সমালোচক। ব্রেখট কমিউনিজমের প্রচারক হলেন নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের সময়ে। আদিপর্বের ব্রেখট আর উত্তরকালের ব্রেখট সম্পর্কে অনেক মার্কসবাদীরও সমালোচনা আছে। গণনাট্য সংঘ কী সেই কারণে ব্রেখট প্রযোজনা করেনি নাকি ব্রেখট প্রযোজনার জন্য যে শিল্পগত সৃজনশীলতার প্রয়োজন, তার যথেষ্ট অভাব ছিল বলেই গণনাট্য সংঘের খুব কম শাখাই ব্রেখট প্রযোজনায় উদ্যোগ নিয়েছে ? নাকি বামপন্থী নানান গণ আন্দোলন অভিমুখে তার প্রচারনাট্য সংগঠিত করার তাগিদ বেশি ছিল বলেই ব্রেখট প্রযোজনায় এগিয়ে আসেননি।

দ্বিতীয়ত, ব্রেখটের নাটকের বিন্যাসে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের কথা কিংবা তাঁর এপিক নাট্যতত্ত্বের জটিলতার প্রসঙ্গ নিয়ে ষাট, সত্তরে যে কূটতর্ক উঠেছিল, তাকে আত্মস্থ করে ব্রেখট করার মতো সামর্থ্য সত্যি গাঁয়ে-গঞ্জে শ্রমিক মহল্লায় গড়ে ওঠা গণনাট্য শাখার ছিল না। এই বুদ্ধিবাদিতার প্রশ্নে নবনাট্য বা গ্রুপ থিয়েটারের অনুবর্তীরা অনেক বেশি বুদ্ধিজীবী শিল্পী ছিলেন বলেই ব্রেখটের কঠিন তত্ত্বকে সহজ করে দেশের অভ্যন্তরে উত্থিত বিভিন্ন গণ আন্দোলন বা বিক্ষোভের মূল সুরকে চিহ্নিত করে ব্রেখট প্রযোজনা করেছেন।

ষাটের দশকে কংগ্রেসি পুলিশি সন্ত্রাস ও তাড়নায় বামপন্থী কর্মীদের মধ্যে টিকটিকি বা গোয়েন্দা সম্পর্কে একটা সংশয় বা ভীতি ছিল। সেই সময় ব্রেখটের *'ইনফরমার'* অবলম্বনে *'গোয়েন্দা'*, আর *'সাদা পোশাক'* অভিনীত হত। সত্তরের দশকে কংগ্রেসি সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উত্থিত গণআন্দোলনকে বাঙ্ময় করার জন্য একাধিক নাট্যদল *'ইন সার্চ অব জাস্টিস'* অবলম্বনে *'কাজির বিচার'*, *'সুবিচার সন্ধানে'* কিংবা *'রেজিস্টেবল রাইজ অব্ আর্টুরো উই'* অবলম্বনে বা অনুবাদে প্রযোজনা করেছেন। সত্তরের শেষে পশ্চিমবাংলায় যখন বামফ্রন্টের শাসন কায়েম হল তখন দেখা গেল *'ককেশিয়ান চক সার্কেল'*-এর একাধিক বঙ্গীকরণ প্রস্তাবনা দৃশ্যসহ এবং দৃশ্য ব্যতিরেকে অভিনীত হল। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে প্রস্তাবনা দৃশ্যের বিষয় যুদ্ধের সময় জমি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া চাষী জমির মালিক হবে, না সেই বিপদে যে চাষী-জমির চাষবাসের যত্ন নিয়েছে সেই জমিতে চাষের অধিকার পাবে। ১৯৬৯-৭১ পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবাংলায় জোতদারের লুকানো জমি জবর দখলের আন্দোলনেব প্রেক্ষাপটে '৭২-'৭৭ সময়ে কংগ্রেসি অত্যাচারে উৎখাত হওয়া সেইসব চাষী যখন '৭৮-এ ফিরে এলেন তখন তাঁরা সেই জমি ফিরে পাবেন নাকি যাঁরা এই সন্ত্রাসের সময়ে জমি ছেড়ে কোথাও যাননি তাঁরা জমির দখলদার বলে স্বীকৃত হবেন। '৬৯-এ ছিল বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট, তখন লুকানো জমির জবরদখল হয়েছে; '৭৮-এ বামপন্থীরা বামফ্রন্ট গঠন করেছে, এবারে বামফ্রন্ট সরকার জবরদখল নয় বর্গা আইন করে জোতদারদের বাধ্য করল ভাগচাষীদের বর্গা স্বীকার করে নিতে। অপারেশন বর্গা-র পক্ষে গণনাট্য সংঘ বা গণনাট্য-মুখী মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটাররা নাটক করে, আর কলকাতার নামী দলেরা তখন *'খড়ির গণ্ডি'*-র নৈয়ায়িক তর্ক জমিয়ে দিচ্ছেন। *'গণ্ডি'*র আজদাক চরিত্রকে অবশ্য গরিব মেহনতি জনতার প্রতিনিধি হিসেবে সবাই খুশি মনে গ্রহণ করেছে। আশির দশকে যখন কার্ল মার্কস সেন্টেনারি এল, তখন একাধিক দল গোর্কি-ব্রেখটের *'মা'* মঞ্চস্থ করেছে মার্কসবাদ বা বিপ্লবী ভাবনার সহায়ক বলে। এই সময়েই কেন্দ্রে আবার ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটেছে দেখে *'শোয়াইক ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'* অনুবাদে *'শোয়াইক গেল যুদ্ধে'* অভিনীত হয়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—শোয়াইক যেন তার মূর্ত প্রতীক।

এখন প্রশ্ন, ব্রেখট চর্চায় পশ্চিমবাংলার নাট্যদলগুলির এই আগ্রহের মূলীভূত কারণ কী যে বামপন্থী মানসিকতার পশ্চিমবাংলায় ব্রেখট করা অর্থই বামপন্থী শক্তিকে সমর্থন দেওয়, নাকি বামপন্থায় মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োগশিল্পী বা গোষ্ঠীর বিশ্বাস আছে বলেই তাঁরা ব্রেখট চর্চায় এত তন্নিষ্ঠ। এখানে আমরা এই দুটি উত্তরকেই গ্রহণ করছি। তবু পৃথক একটা উত্তর আছে যে বামপন্থায় আদৌ বিশ্বাস নেই, ব্রেখট আদতে এক নাট্যকলার রহস্য, সেই রহস্যভেদে শিল্পসৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করা, কিংবা ব্রেখটের কঠিন নাট্যতত্ত্বকে আয়ও করে এঁরা ব্রেখট করেন, দেশে-বিদেশে সম্মানিত হন, সুতরাং রাজ্য রাজধানী কলকাতার অভিজাত নাট্যগোষ্ঠী রূপে একটা স্বীকৃতি লাভই ব্রেখট প্রযোজক কোনো কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বা দার্শনিক অবস্থান।

বামপন্থায় বিশ্বাসহীন এমন কারো কারো মনে আজ সন্দেহ দেখা দিচ্ছে বামপন্থী পশ্চিমবাংলায় ব্রেখট জন্মশতবর্ষ উদযাপনকালে ব্রেখট নেই কেন ? আসলে সামর্থ্য এবং দেশকালের সঙ্গে মেলানোর মতো রসদ পেলে ব্রেখট কেন হবে না; সব সময়েই হবে। এই বছর আমরা জানি ইতিমধ্যেই ঊষা গাঙ্গুলি রঙ্গকর্মীর পক্ষে *'হিম্মতি মাঈ'* মঞ্চস্থ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি এর জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দিচ্ছে; অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্য আকাদেমির অনুদান পাচ্ছেন ব্রেখটের *'মা'* প্রযোজনার জন্য। বহরমপুরেব যুগাগ্নি তাঁদের *'মা অভযা'* নতুন করে পুনর্জীবিত করেছেন। নাট্য আকাদেমির তরুণ পরিচালকদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে ব্রেখট জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে, নিশ্চয়ই এঁদের মধ্যে কোনো বড় মাপের পরিচালক উঠে আসবেন ব্রেখটকে আশ্রয় করে। চেতনাব সুমন মুখোপাধ্যায কিছুদিন আগে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে *'দ্য মেজার্স টেকেন'* বা *'গৃহীত ব্যবস্থা'* পরিচালনা করে এলেন আমেরিকান শিক্ষার্থী অভিনেতৃবর্গ নিয়ে। চেতনার পক্ষে সুজন মুখোপাধ্যায় *'উলকি'* পুনঃপ্রযোজনা করেছেন। নান্দীপটের তরুণ পরিচালক বিমল চক্রবর্তী *'দ্য মেজার্স টেকেন'* অবলম্বনের উৎপল দত্ত অনূদিত *'সমাধান'* মঞ্চস্থ করছেন এই ১৯৯৮ থেকেই। সুতরাং বামপন্থী ব্রেখট বাংলায় এখনও সচল।

৩

সুতরাং বি বি বের্টোল্ট ব্রেখট যখন বাংলা থিয়েটারে তাঁর জন্ম শতবর্ষেও অনাদৃত নন, প্রভূত আলোচনা তর্কবিতর্কের বিষয়, তখন ১৯৪১-৪২-এর পরে ব্রেখট কীভাবে একের পর এক অনুবাদে রূপান্তরে বাঙালি ব্রেখট হয়ে উঠলেন তার পর্যালোচনায় কিঞ্চিৎ কালানুক্রমিতা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়া যাক। এ কাজে *'অনুষ্টুপ'* সাহিত্য ত্রিমাসিকের ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৯৮৪-তে প্রকাশিত সোমেন গুহ সংকলিত তালিকা (যদিচ অনেক ভুল ও অসম্পূর্ণ) এবং সরোজমোহন মিত্র লিখিত *'বাংলায় ব্রেশট চর্চা'*

প্রবন্ধের আংশিক সাহায্য নিয়ে প্রথমেই ব্রেখট কেন্দ্রিক আলোচনা, নিবন্ধ তর্কাদির প্রসঙ্গে ঢোকা যাক।

ব্রেখটের দেহাবসান হয় ১৯৫৬-র ১৪ই আগস্ট। এই ১৯৫৬-তেই ব্রেখটের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ব্রেখটের বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন, ব্রেখটের বই এ দেশে তখন মোটেই সুলভ ছিল না, উনি *'থ্রি পেনি অপেরা'* বইটি আনতে অনুরোধ জানিয়ে লন্ডনবাসী বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন। পাশ্চাত্য নাটক, নাট্যতত্ত্ব রাজনীতি ও দর্শনশাস্ত্র গুলে খাওয়া মার্কসবাদী নাট্যকার কমরেড উৎপল দত্ত তাঁর সম্পাদিত *'পাদপ্রদীপ'* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় *'বের্টোল্ট ব্রেখট কমরেড'* নিবন্ধ লিখে ব্রেখট সম্পর্কে বাংলার নাট্যকর্মীদের সচেতন করেন। গঙ্গাপদ বসু সম্পাদিত *'বহুরূপী'* পত্রিকার ৯ম সংখ্যা অক্টোবর '৫৯-তে শ্রীভরত আচার্য ছদ্মনামে গঙ্গাপদ বসুর লেখা *'পৃথিবীর সেরা নাট্য নির্দেশক'* শিরোনামায় কোপো, লুই জোভে-র সঙ্গে *'ব্রেখ্‌ট ও পিসকাতর . এপিক থিয়েটার'* বিষয়ে পরিচয়মূলক আলোচনা প্রকাশ পায়। একাদশ সংখ্যা নভে '৬০-এ *'ব্যেরথল ব্রেখট'*-এর ছবি ছাপা হয়, সেইসঙ্গে ছাপা হয় কিরণময় রাহার নিবন্ধ *'ব্যেরথল্‌ ব্রেখষট প্রসঙ্গে'*। এই সময় থেকেই এই জার্মান নাট্যকারের নামের সঠিক উচ্চারণ-অনুগ বানান লেখার একটি বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ব্রেখট, ব্রেশট, ব্রেখষট, ব্রেষট, ব্রেক্ষট ইত্যাকার বানান নিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর শুদ্ধ উচ্চারণ প্রবণতা হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। *'গন্ধর্ব'* পত্রিকা নব নাট্য আন্দোলনের একমাত্র ত্রিমাসিক। তার তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (ক্রমিক সংকলন-৫) ১৯৬০-এ পাঞ্জাবি নাট্যকার বলবন্ত গর্গির *স্টেটসম্যান* এ প্রকাশিত ইংরেজি নিবন্ধটি বঙ্গানুবাদে প্রকাশ পায় *'ব্রেখটের নাটক : চলমান জীবনের ভূমিকা'*। রচনার শিরোনামে হরফ বিন্যাসের বৈচিত্র্যে অনেকে আকৃষ্ট হন। অনুবাদক ছিলেন সুধাংশু তুঙ্গ। এরপর *'গন্ধর্ব'* বিদেশি নাট্যপ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যা বের করল। এই তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (ক্রমিক সংকলন-৭) সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ হল *'ইউরোপীয় থিয়েটার ও ব্রেখ্‌ট'*। ১৯৬১-তে *'বিদেশি নাট্য সংস্কৃতি'* বিভাগে *গন্ধর্ব*-র তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় বেরোল *'জার্মানির উৎসব'*, তার মধ্যে ব্রেখটের প্রসঙ্গ এসেছে। *'গন্ধর্ব'*-র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দেব (১৯৬২) শারদীয়া সংখ্যা পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (ক্রমিক ১৫) উৎপল দত্তেব *'মানুষের অধিকারে'* প্রকাশিত হয়ে বিপুল সাড়া ফেলেছিল। উক্ত সংখ্যায় *'বার্লিনেয়ার আঁসেম্বল'* নিয়ে জার্মান লেখক ভেরনেয়ার হেস্টের প্রবন্ধটি অনুবাদ করে বেরোয়। সেই সঙ্গে *'জাতীয় নাট্যশালা'* শিরোনামায শিফবাউয়ারডামোর থিয়েটার তথা বার্লিনেয়ার আঁসেম্বল-এর সুদৃশ্য আলোচচিত্র, সঙ্গে প্রতি তুলনা হিসেবে *'শিশিরকুমারের স্বপ্ন জাতীয় নাট্যশালা'* বলে নির্মিয়মান রবীন্দ্র সদনের আলোকচিত্র ছাপা হয। এই ১৯৬২-তে *'দৈনিক স্বাধীনতা'*-য় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রেখটের গল্প প্রথম অনুবাদ করেন : *'হাঙরেরা যদি মানুষ হত'*। *'গন্ধর্ব'*-র পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মে-জুলাই ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হয় এরিক বেন্টলে-র দীর্ঘ প্রবন্ধ *'ব্রেখটের মঞ্চরীতি'*, অনুবাদক সুধাংশু তুঙ্গ।

'গন্ধর্ব'-র ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা নভে-জানুয়ারি ১৯৬৩-তে বের হল রবিউল ইসলামের আলোচনা *'বার্টোল্ট ব্রেশট : তাঁর থিয়েটার'*। *'গন্ধর্ব'* পত্রিকা ব্রেখটের সঙ্গে এ দেশের নবনাট্য কর্মীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আবদ্ধ করে তোলার জন্য ১৯৬০ থেকে ধারাবাহিক আলোচনা, সংবাদাদি, প্রবন্ধ ও নাটকের অনুবাদ করে এসেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য পত্রিকায়ও ব্রেখট আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠেন। তাঁর নাটক অনূদিত ও রূপান্তরিত হতে থাকে।

১৯৬১-৬২-তে মেথুন প্রকাশিত ব্রেখটের নাটকের দুটি হার্ড বাউন্ড ভল্যুম কলকাতায় এসে যায়। অলিভার অ্যান্ড বয়েড প্রকাশিত রোনাল্ড গ্রে-র *'ব্রেখট'* নামক বইও একই সময় পৌঁছে যায় এখানে। এসে যায় টবি কোল সম্পাদিত *'প্লেরাইটস অন প্লেরাইটিং'*, তার মধ্যে ব্রেখটের *'এ শর্ট অর্গানাম ফর দ্য থিয়েটার'* মিলে যাওয়ায় পূর্ণোদ্যমে ব্রেখট চর্চা শুরু হয়ে যায় পশ্চিমবাংলায়।

১৯৬৪-র ৫ নভেম্বর উৎপল দত্তের উদ্যোগে সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি করে ব্রেখট সোসাইটি অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়। শোভা সেন সম্পাদক। সোসাইটির মুখপত্র *'এপিক থিয়েটার'* সত্যজিতের আঁকা মাদার কারেজ-এর গাড়ির স্কেচ দিয়ে প্রচ্ছদ, উৎপল দত্তের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে। প্রথম আর তৃতীয় এই দুটি সংখ্যায় উৎপল দত্তের অনুবাদে *'মাদার কুরাজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন'* অবলম্বনে *'হিম্মতবাঈ'* বাংলায় রূপান্তরিত হয়। *'গন্ধর্ব'*-র সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা আগস্ট অক্টোবর ১৯৬৪-র শারদীয়া সংখ্যায় উৎপল দত্ত ব্রেখট প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ লিখলেন, *'বের্টল্ট ব্রেশট . তাঁর রাজনৈতিক জীবনদর্শন ও নাটক'*। উৎপল দত্ত এইসময় দেখা যাচ্ছে ব্রেখট না লিখে ব্রেশট লিখছেন।

১৯৬৫-তে *'গন্ধর্ব'*, 'বের্টল ব্রেশট সংখ্যা ১৩৭২' বের করে। পত্রিকার পুরো সূচি কী ছিল বলা যাচ্ছে না, এই মুহূর্তে উক্ত সংখ্যার সামনের ও পেছনের কিছু পাতা ছাড়া যা ছাপা দেখছি তাতে দেখা যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখানো হয়েছিল *'বেরটোল্ড ব্রেখ্‌ট'* শীর্ষক নিবন্ধ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন *'এপিক থিয়েটারের মতাদর্শ'*, সম্পাদক প্রণীত *'বের্টল্‌ ব্রেশ্‌ট : সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী'* এবং বিষ্ণু বসু অনুবাদ করেছিলেন পুরো *'মাদার কারেজ'*, একটি সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল। *'মাদার কুরাজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন'*-এর এই প্রথম বঙ্গানুবাদ ও রূপান্তর একই বছরে হল। বেশ মনে আছে আগে *'গন্ধর্ব'* বেরিয়েছিল, পরে *'এপিক থিয়েটার'*। *'দেশ'* পত্রিকায় এই সময় সন্তোষকুমার ব্রহ্মের *'বার্লিনের চিঠি'*-তে ব্রেখ্‌ট বিষয়ে আলোচনা বের হয় ১৯৬৫-র অক্টোবর মাসে ২৮ আশ্বিন '৭২ সংখ্যায়। শম্ভু মিত্র প্রবন্ধ লিখলেন *'ব্রেখ্‌ট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা'*, বেরোল *'বহুরূপী'*-র ২৩তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর '৬৫তে। *'প্রসেনিয়াম'* ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭২/১৯৬৫-তে শোভা সেন লিখলেন : *'বার্লিনার আঁসবল : আমার অভিজ্ঞতা'*।

১৯৬৬ সাল। *'গন্ধর্ব'*-র ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল ৮ম বর্ষ ২ম সংখ্যায় ঋত্বিক ঘটক অনূদিত *'দি ককেশিয়ান চক সার্কেল'* বের হবে। কিন্তু ডাক ব্যবস্থার গোলযোগে সে লেখা ৮ম বর্ষের ১ম সংখ্যা বেরোনোর সময় পৌঁছায়নি। এই সংখ্যায় *'গণনাট্য না নবনাট্য . সঠিক পথের সন্ধানে'* শীর্ষক এক বিতর্কমূলক সম্পাদকীয় বের হয়, তার শেষ অনুচ্ছেদটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিবোধের দিক থেকে তৎকালে প্রাসঙ্গিক ছিল : 'আসলে সমস্যা কম্যুনিকেশনের। কি ভাবে কম্যুনিকেট করব। এই কম্যুনিকেশনের সমস্যা নিয়েই য়ুরোপীয় দুই নাট্যকারকে আমরা বড় বেশি চিন্তিত দেখেছি এবং দেখছি। এই নাট্যকার দুজন হলেন ব্রেখট এবং ইয়োনেস্কো। আপাতদৃষ্টিতে দুজনের মধ্যে অমিলটাই প্রচুর কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক অলক্ষ্য যোগসূত্র আবিষ্কার কবা যায়। এবং এই দুই নাট্যকার বর্তমানে আমাদের নাট্যজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছেন। নবনাট্য এই দুইজনকেই মেলাতে চায় কিংবা কার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ হবে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। একজন প্রগাঢ় আস্থাবাদী, গম্ভীর প্রকৃতির। অন্যজন নিরাশার, অর্থহীনতার শব্দপুঞ্জের চাবুকে আমাদের অন্তরস্থিত রামগড়ুড়ের ছানাটিকে ক্ষিপ্ত করে বুর্জোয়া সংস্কারসমূহ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করেন। একজন সাম্যবাদের সমর্থক। অন্যজন বুর্জোয়া সমাজের সমালোচক। উভয়কেই ত আমাদের দরকার, নয় কি ?'—ব্রেখট ও আয়োনেস্কো দুই মতাদর্শের সহাবস্থান যখন দেখা যাচ্ছে নবনাট্যর অন্তর্ভুক্ত দলগুলির নাট্য নির্বাচনে, চিন্তা-ভাবনায়, তখন সেই বাস্তব অবস্থার দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করা হয়েছিল উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

ব্রেখটের নাট্যকৌশলের মধ্যেও এক্সপ্রেশনিজম ও এপিক ঋজুতা, স্পষ্টতা যেমন সমান প্রাধান্য পেয়েছিল, তেমনই আয়োনেস্কোর কির্মিতি তত্ত্বের মধ্যেও এক্সপ্রেশিনজমের ছাপ অস্পষ্ট নয়। যাইহোক ব্রেখটই প্রাধান্য পেয়েছেন, *'গন্ধর্বে'* যেমন, সমগ্র বাংলা থিয়েটারেও তেমন। *'গন্ধর্ব'*-র ২৭ ও ২৯ সংখ্যায় ঋত্বিককুমার ঘটক অনূদিত *'দি ককেশিয়ান চক সার্কেল'* প্রকাশিত হয়। অজয় গুপ্তের আঁকা নামলিপিতে এই নাম থাকলেও ঋত্বিককুমার ঘটক নাটকের নাম বাংলায় রেখেছিলেন *'খড়ির গণ্ডী'*, গন্ধর্ব-র ওই সংখ্যার ফোলিও-তে এই নাম ছাপা হয়েছে। ২৯ সংখ্যায় আগস্ট-অক্টোবর ১৯৬৬-তে নামপত্রে *'খড়ির গণ্ডী'* সংশোধিত রূপে হরফ সাজিয়ে ছাপা হয়। এরপর *'গন্ধর্ব'* অভ্যন্তরীণ কারণে বন্ধ হয়ে যায়, নাহলে ব্রেখট নিয়ে হয়তো আরও এগোনো যেত।

১৯৬৬-তে *'গন্ধর্ব'* বন্ধ হয়ে গেল, আর ১৯৬৬-র ১৫ জুন *'থিয়েটার'* পাক্ষিক বেরোল। সাধারণ সংখ্যাগুলি বুলেটিন সাইজে। এক বছর চলেছিল, ৪র্থ সাধারণ সংখ্যায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, *'ব্রেখটের মাদার কারেজ'* নিয়ে। *'শারদীয় থিয়েটার'*-এ (দেখতে অবিকল সদ্যলুপ্ত *শারদীয় গন্ধর্ব*) উৎপল দত্তের অনুবাদে বের

হল *'ডি মাসানাম'*, *'সমাধান'* নামে। *'প্রসেনিয়াম'* ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় আগস্ট '৬৬-তে উৎপল দত্তের প্রবন্ধ ছিল *'কালের যাত্রা। কমিউনিস্ট পার্টি ও নাট্যকার ব্রেশট'*। ওই সংখ্যায় মিশেল নকভির *'রোজনামচা'*-য় প্যারিস নাট্য উৎসবে ব্রেখটের বার্লিনার আঁসবলের নাট্যানুষ্ঠানের প্রতিবেদন বেরোয়।

১৯৬৭-তে *'মধ্যাহ্ন'*-র ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় দিলীপকুমার মিত্র লেখেন *'নাট্যকার ব্রেখ্‌ট'* নিবন্ধ। *'দৈনিক বসুমতী'*-র সোমবারের পাতায় জুলাই '৬৭-তে বের হল রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের *'দুই ব্রেখট'*। ব্রেখট নিয়ে তর্ক বাধার পথে তখনও বাংলা থিয়েটার ততটা পক্বতা অর্জন করেনি। শম্ভু মিত্র *'যুগান্তর'* এর শারদীয় ১৯৬৭-তে লিখলেন *'ব্রেখটের থিয়েটার'*।

১৯৬৮ সালে ব্রেখট নিয়ে কোনো প্রবন্ধ বা আলোচনার সন্ধান মেলেনি।

১৯৬৯ এ *'আন্তর্জাতিক আঙ্গিকে'*, *'ব্রেখট ও সিনেমা'* বিষযক মার্টিন ওযালশ-এর প্রবন্ধ অনুবাদ করলেন বীরেন চক্রবর্তী। ব্রেখট যে নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্র বিষয়েও উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সে বিষযে আলোকপাতমূলক উক্ত নিবন্ধটি। ঋত্বিক ঘটক সম্পাদিত *'অভিনয় দর্পণ'*-এর দ্বিতীয় বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা ১৯৬৯-এ ধীরেন মুখোপাধ্যায় *'নাট্যকার বারটোল্ড ব্রেখট (ব্রেশট)'* শিরোনামে লিখলেন। আর চিররঞ্জন দাস সম্পাদিত *'নতুন থিয়েটার'* ১ম বার্ষিক সংকলনে *'অভিনয় প্রসঙ্গ—ব্রেখট'* প্রকাশিত হয়।

১৯৭০ *'অভিনয়'* পত্রিকার ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যার সমীর দাশগুপ্ত *'ব্রেখটীয নাটকে সঙ্গীত'* প্রকাশ করলেন।

'গঙ্গোত্রী' পত্রিকা ১৯৭১-এ ব্রেখট ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। *'সমাজতান্ত্রিক জার্মানি'* জি ডি আর-এর মুখপত্র ব্রেশট সংখ্যা প্রকাশ করে ১৯৭১-র মার্চ মাসে। এই সংখ্যায়ই *'বাংলাদেশে ব্রেশট চর্চা'* বিষয়ে চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রথম তথ্য-ভিত্তিক সমীক্ষামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। বক্ষ্যমাণ লেখা ওই আলোচনারই এক পরম্পরা। ইন্দো জি ডি আর মৈত্রী সমিতি ১৯৭১-এর ১২ এপ্রিল ব্রেশট গ্রন্থাগার স্থাপন উপলক্ষে যে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, সেই পুস্তিকায় কুমার রায় *'মহাজন আত্মীয়'* শিরোনামে ব্রেখট চর্চাকে স্বাগত জানান। এই বছরের মে মাসে *'সমাজতান্ত্রিক জার্মানি'*-র ১১ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ব্রেখট প্রযোজনায় বা চর্চায় এ দেশীয় তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী, নাট্যকার, বুদ্ধিজীবীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়। রচনার শিরোনাম ছিল *'ব্রেখ্‌ট সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা'* লেখকরা ছিলেন উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত সরকার। লক্ষণীয়, এঁদের মধ্যে একমাত্র অজিতেশই ততদিনে ব্রেখ্‌টের বঙ্গীকরণে জনপ্রিয় শিল্পী।

এই ১৯৭১ সালে মনোরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত *'নাট্যপ্রসঙ্গ'* পত্রিকায় দীপেন্দু চক্রবর্তী লিখলেন, *'ব্রেখ্‌টের নাট্যতত্ত্বে অমার্কসীয় ঝোঁক'*। এই লেখার সূত্রেই পশ্চিমবাংলার

ব্রেখট চর্চা বিতর্কে প্রবেশ করল। *'বহুরূপী'*র ৩৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৭১-এ ব্রেখট জীবনসঙ্গিনী অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেল স্মরণে তিনটি ও ব্রেখট বিষয়ে দুটি লেখা বেরোয়। স্মরণ *'হেলেন ভাইগেল'* ব্রেখ্‌ট লিখিত *'মহৎ এবং জার্মান অভিনেত্রী'* প্রবন্ধ, অনুবাদ কুমার রায়; ব্রেখ্‌ট লিখিত *'ভাইগেলের খ্যাতিতে অবতরণ'*, অনুবাদ স্বপন মজুমদার; ব্রেখট প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'ব্রেখ্‌টের সঙ্গে পরিচয়ের আদিপর্ব'*। *'দৈনিক কালান্তর'*-এর সেপ্টেম্বর '৭১ সংখ্যায় শৈলেন বসুর লেখার নাম ছিল *'ব্রেখটের নাটক ও তাঁর চিন্তাভাবনা'*। *'অমৃত'* যুগান্তর হাউসের সাহিত্য সাপ্তাহিক। এর ২৫ নভে '৭১ সংখ্যা (১১ বর্ষ ৩য় খণ্ড)-য় দিলীপ মৌলিক লিখলেন, *'বেরটল্ট ব্রেশট'*। *'পথিকৃৎ'* কাগজের '৭১-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্রীনাগরিক স্বাক্ষরিত লেখার নাম *'ব্রেখ্‌ট'*।

১৯৭২। বাংলায় সন্ত্রাস নেমে এসেছে, বামপন্থীদের ওপর শাসক কংগ্রেস আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। এ বছরে ব্রেখটের ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, লেখালেখি কম। তাও তিনটি আলোচনার হদিস মিলছে। *'অভিনয়'* পত্রিকায় মে-জুন সংখ্যায় *'বার্লিনের অনসম্বল ও বারটল্‌ট-ব্রেক্ষট'* নামে লিখলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের সরেজমিন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিবরণ। দিল্লির *'নাট্যকাল'* পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রবীর বসুর লেখার নাম ছিল *'বেরটোল্ট ব্রেশট ও তাঁর নাটক : ভূমিকা'*। চিত্তরঞ্জন ঘোষ *'আনন্দবাজার পত্রিকা'*-র ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৯/১৯৭২ ক্রোড়পত্রে লিখলেন *'রবীন্দ্রনাথ ও ব্রেখট'*। বাংলায় ব্রেখট চর্চার এ হল শিকড় সন্ধান। *'নাট্যপ্রসঙ্গ'*-র ৪র্থ সংখ্যা অক্টোবর '৭২-এ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন *'ডায়ালগ'*।

১৯৭৩ সাল। প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা পাঁচটি। দীপেন্দু চক্রবর্তী লিখলেন *'কলকাতায় ব্রেখ্‌ট বিতর্ক . একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা'*। বেরোলো *'সন্ধিক্ষণ'* মুখপত্রের ১৪ই অগাস্ট '৭৩ সংখ্যায়। ব্রেখটের মৃত্যু দিবস পালন উপলক্ষে প্রকাশিত। এই মুখপত্রেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখার নাম *'ব্রেখ্‌টের ভাঙা মূর্তি'*। কলকাতার বুকে মূর্তি ভাঙার যুগে ব্রেখটের খণ্ডিত অস্তিত্ব নিয়ে বাঙালির ব্রেখ্‌ট চর্চার বঙ্কিম বিচার। চিররঞ্জন দাস সম্পাদিত *'নোতুন থিয়েটার'* বার্ষিক সংকলন ৩ নম্বরে *'ব্রেখ্‌টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-–মি উইন্ড'* অনুবাদ বেরোয় কাজল দাসের। বাংলাদেশের *'থিয়েটার'* পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি নিবন্ধের একটি হল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'ব্রেখ্‌টের সঙ্গে পরিচয়ের আদিপর্ব'*-এর পুনর্মুদ্রণ। অন্যটি সুখরঞ্জন চক্রবর্তীর *'নাট্যকার ব্যেরথল ব্রেখ্‌ষ্‌ট ও তাঁর সাহসিকা জননী'*। নতুন প্রকাশিত *'রঙ্গমঞ্চ'* পত্রিকার ১ম বর্ষের সংখ্যায় অমল রায় লিখলেন *'মার্কসবাদ ও নাট্যকার'*।

১৯৭৪ সালে মার্চ মাসের *'গণনাট্য'* পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের নাম *'ব্রেখ্‌টের সঙ্গীত'*, লেখক সরোজমোহন মিত্র। *'পদধ্বনি'* পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় *'নাট্যাকাশে ব্রেখ্‌ট*

ও *স্তানিশ্লাভস্কি'* বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা বের হল। *'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'*র ৬ষ্ঠ সংখ্যার নিবন্ধের নাম *'মধ্যরাত্রির জরায়ু ও সৌরকরময় উত্থান'* লেখক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। *'সরণী'*-র ২য় সংকলনে দীপেন্দুর *'কলকাতায় ব্রেখ্‌ট বিতর্ক'* পুনর্মুদ্রিত হল। অনিকেত নাট্যসংস্থার মাসিক মুখপত্র *'নাট্যচর্চা'*-র ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় বেরোলো *'ট্রাজেডি, ব্রেখট ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'* লেখক সুপ্রিয় ধর। *'বাংলাদেশ'* নামের পত্রিকার ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা ও ৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যায় শিলালী ছদ্মনামে অশোক সেনের *'দেশী বিদেশী রঙ্গমঞ্চ'* বিভাগে ব্রেখট বিষয়ে আলোচনা বের হয়। *'গণনাট্য'* পত্রিকায় শান্তিময় গুহ *'বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট--জি ডি আর সূত্র থেকে'* নামে প্রকাশিত রচনার এক সংকলন করেন জানুয়ারি '৭৪ সংখ্যায়। *'শারদীয়া কালান্তর'*-এ প্রবন্ধ বেরোয় চিত্তরঞ্জন ঘোষের *'ব্রেখ্‌ট ও আমরা'*। *'বিজ্ঞাপন'* পত্রিকার কার্তিক মাসের সংখ্যায ব্রেখটের গল্প *'হাঙরেরা যদি মানুষ হতেন'* অনুবাদ বেরোয় আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের।

১৯৭৫ সাল। ব্রেখ্‌ট চর্চায় গুণগত মাত্রা বাড়ছে। এ বছরে প্রকাশিত রচনার সংখ্যাও বেশি। *'বাংলাদেশ'* পত্রিকার ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা মার্চ '৭৫ এ অরুণ মুখোপাধ্যায় কলম ধরলেন *'এ দেশের নাট্যচর্চায় বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট'*। ব্রেখট ও জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিক প্রেক্ষাপটেই প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। *'আনৃণ্য'* সুবীর পোদ্দারের সম্পাদনায় ব্রেখট সংখ্যা বের করেন। *'এপিক থিয়েটার'* ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা (বুলেটিন আকারে) রজত রায় লিখলেন *'ব্রেখ্‌ট ও চলচ্চিত্র'* বিষয়ে। *'শারদীয়া সত্যযুগ'*, *'গণনাট্য'*, *'বাংলাদেশ'*-এ যথাক্রমে প্রবন্ধ বেরোল মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের *'শতাব্দীর নাট্যবিজ্ঞানী ব্রেখট'*, শিল্পাচার্য কর্তৃক অনূদিত *'নাটকের স্ক্রিপ্টিং-মাদার কারেজ'* এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'অনন্বয় : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট'*। *'রঙ্গমঞ্চ'* পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় পল রিলা রচিত *পরিচালক ব্রেখ্‌ট'* প্রবন্ধটি অনূদিত হল। *'স্বাধিকার'* পত্রিকার ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় চিররঞ্জন দাস *'কলকাতায় ব্রেখ্‌ট প্রযোজনা'* শীর্ষক রচনায় বস্তুবাদী দৃষ্টিতে ব্রেখ্‌ট চর্চার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেন।

১৯৭৬ সাল এসে গেল। ভারতে স্বৈরশাসন জাঁকিয়ে বসেছে। এই অবস্থায় নাট্যচর্চায় যেখানেই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী রাজনীতির গন্ধ, সেখানেই পুলিশি শাসন ও গুন্ডাবাহিনীর দমনপীড়ন। পত্রপত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত— সেন্সরড। ব্রেখট পার পেয়ে গেলেন বামপন্থী কমিউনিস্ট নাট্যকার হয়েও। কেন ? আসলে এ সময়ে ব্রেখট চর্চায় আলোচনাদি তত্ত্ব ও আঙ্গিকগত প্রশ্নেই বেশি হয়েছে। আর নাট্যমঞ্চে *'পন্তুলাহা'* বা *'ভালোমানুষ'* ইত্যাদি হচ্ছে।

এ বছরে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংখ্যার যা হিসেব মিলছে তাতে তার সংখ্যা পনেরো ছাড়িয়ে গেছে। *'আনৃণ্য'* দ্বিতীয় ব্রেখ্‌ট সংখ্যার কথা আগেই বলা গেছে। *'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'* নিরুপম চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ব্রেখ্‌ট স্মরণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ইন্দো জি ডি আর মুখপত্রের ২য় সংখ্যায় *'কলকাতা ৪ঠা মে—বের্টোল্ট*

ব্রেখট' অনুবাদ বেরোয়। এটি নাটকের অনুবাদ না নাটক নিয়ে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ তা পূর্বোল্লিখিত তালিকার ভিত্তিতে বোঝা গেল না। পত্রিকাটি বর্তমান লেখকের দেখা নেই। এই পত্রিকারই জুন-জুলাই সংখ্যায় বের হল আর্নল্ড ব্রোনেন লিখিত *'নির্দেশক বের্টোল্ট ব্রেখট'*-এর বঙ্গানুবাদ। *'গণনাট্য'* ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ডিসেম্বরে লিওন ফয়েস্টভাঙ্গার লিখিত *'ব্রিটিশ সমীপে নিবেদিত বোর্টোল্ট ব্রেখ্‌ট'* প্রবন্ধের অনুবাদ। *'গণনাট্য'*-র শারদীয়ায় বেরোলো মানবেন্দ্র গোস্বামীর প্রবন্ধ *'বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের নাটক ও শিল্পগত মৌলিকত্ব প্রসঙ্গ'*। *'পরিচয়'*-এর সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হল *'ব্রেখ্‌ট-লুকাচ বিতর্ক'*, রচনা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। *'অনুক্ত'* সাহিত্যপত্রে শারদ সংখ্যায় সুদূর শিলং শৈলশহর থেকে সৌমেন সেন লিখলেন *'প্রসঙ্গ মূলত ব্রেখ্‌ট'*। অশোক মুখোপাধ্যায় লিখলেন *'এক দশকের ব্রেখট চর্চা'*, বের হল *'সময়'* পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায়। মফস্বল শহর কাটোয়া থেকে প্রকাশিত *'শঙ্খ'* শারদীয়া সংখ্যায় সুজিত গুহের লেখার নাম *'বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট'*। ওই শহর থেকেই ইকাফো স্মারকপত্রে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন *'প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা ও ব্রেখট'*। ইন্দো জি ডি আর মুখপত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় ব্রেখটের *'একসপেরিমেন্ট'* ও *'আহত সক্রেটিস'* অনুবাদ দুটি প্রকাশ পায়। *'রক্তকরবী'* ৬ষ্ঠ বার্ষিক সংকলনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ব্রেখট নিয়ে লিখলেন, *'প্রসঙ্গ : ব্রেখ্‌ট ও অন্যান্য'*। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ প্রকাশিত বার্ষিক সংকলন *'ধ্রুপদী'*তে প্রবীণ শর্মা *'ব্রেখটীয় এ্যালিয়েনেশন ও চলচ্চিত্র'* অনুবাদে প্রকাশ পেল।

জরুরি অবস্থার বছরে ব্রেখট চর্চায় আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস মোকাবিলার যেন এক বুদ্ধিবাদী মহড়া হয়ে গেল। ব্রেখট চর্চার মধ্যে ফ্যাসিস্তমুখী শক্তি ভাবল এ নেহাতই তত্ত্ব ও আঙ্গিকচর্চা হচ্ছে। সুতরাং ব্রেখটকে ভয় পাবার কিছু নেই।

এসে গেল ১৯৭৭। জরুরি অবস্থা বাতিল করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে সমগ্র ভারত জুড়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তার তুলনায় ১৯৭৭-এর কেন্দ্রে ইন্দিরা সরকারের পতনটাই লাভজনক। জনতা সরকার ভারতের নিপীড়িত মানুষকে হতাশ করল নিতান্তই অশ্বডিম্ব প্রসব করে। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্ট গঠন করে জাতীয়বাদী রাজনীতির মোকাবিলায় প্রকৃত গণভিত্তি খুঁজে পেল। গ্রাম বাংলার কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষ সন্ত্রাসমুক্ত নিরাপত্তা চাইল স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠায়। বামফ্রন্ট সরকার টিকে গেল একটানা ২২ বছর। তা সেই সাতাত্তরের বাংলায় ব্রেখট চর্চার যে কোনো প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যাবে না, অন্তত আলোচনা নিবন্ধাদির বিষয়সূচি দেখে। নাট্য প্রযোজনায় অবশ্য তীব্রতা বৃদ্ধি পেল সে প্রসঙ্গ যথাকালে আলোচিত হবে।

এ বছরে *'দর্পণ'*-এর ২০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১১ ফেব্রুয়ারিতে দুটি নিবন্ধ স্থান পেল। সুচরিতা সেনের *'বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট ও ভাইমার জার্মানি'* এবং সোমেন গুহর *'বাঙালী বার্টোল্ট ব্রেশট'*। ১৮ ফেব্রুয়ারির ৪র্থ সংখ্যায় দীপেন্দু চক্রবর্তী লিখলেন *'ব্রেখ্‌ট*

বিশেষজ্ঞদের প্রতি। দীপেন্দু বরাবরই ব্রেখট বিতর্ককে সঞ্জীবিত রেখেছেন। *'পারাপার'*-এর ৩য় সংকলনে প্রকাশিত হয় উৎপল ভট্টাচার্যের *'ব্রেখটের থিয়েটার'*। *'সম্পর্ক'*-র ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন বের হল ব্রেখটের গল্পের অনুবাদ *'শ্রীযুক্ত k কাহিনী'*। *'চলচ্ছায়া'* পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় বের হল শ্রীমতী বার্টোল্ট ব্রেষ্ট রচিত *'প্রফেসর হেলেন ভাইগেল'*, মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেন ব্রজগোপাল মুখার্জি। *'অভিনয়'* পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মার্চ-অগাস্টে প্রকাশিত হল *'স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেখট-বিশ্ব নাট্যচিন্তার দুই ধারা'* নিবন্ধ, লেখক আশিস চক্রবর্তী। *'লাপিজ লাজুলি'*-র বিশেষ সংখ্যা সেপ্টেম্বরে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ বেরোলো *'ব্রেশট ও গোদার দু'চার কথা'*। *'নাট্যলিপিকা'*-র শারদীয় সংখ্যায় তপনকুমার ঘোষাল লিখলেন *'ব্রেখ্‌ট চিন্তা'*। *'গাঙ্গেয়পত্র'*-র আগস্ট সংখ্যায় ইন্দ্রজিৎ দাস অনুবাদ করলেন *'বেরটোল্ট ব্রেশট—কবিতা ও প্রসঙ্গ'*। *'চতুষ্কোণ'* ১৭ বর্ষ পৌষ সংখ্যায় আরুণি সেন মূল জার্মান থেকে *'হাঙরেরা যদি মানুষ হতো'* গল্প অনুবাদ করলেন। *'গণনাট্য'* ১৩ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় অরুণ রায়ের অনুবাদে আর্নল্ট ব্রোনেনের *'নির্দেশক ব্রেশ্‌ট'* বের হল। *'এপিক থিয়েটার'* ১৯৭৭-র মে সংখ্যায় দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে *'বার্লিনার অসম্বলে বের্টোল্ট ব্রেশট এবং তার কার্যাবলী'* ইঙ্গেবর সিয়েটসের প্রবন্ধ বেরোয়। ডিসেম্বর সংখ্যায় শোভা সেন লেখেন, *'থিয়েটারের দেশে'*। দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেন ড· মানফ্রেড ডেকাভর্নের নিবন্ধ *'বার্লিনের অসম্বল'*।

১৯৭৮ সালে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গ্রন্থ *'নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা'*-র মধ্যে বেখট ও তাঁর থিয়েটার বিষয়ে ব্রেখটের নাটকে রাজনীতিক বিশ্বাস থিয়েটার ও নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। এ বছরই *'ব্রেশটের নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা'* নিয়ে *'দর্পণ'* সাপ্তাহিকের ২১ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১ ডিসেম্বর '৭৮ নিবন্ধ লেখেন রণজিৎ চক্রবর্তী। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ব্রেখটের প্রবন্ধ *'জনপ্রিয়করণের সমস্যা'* অনুবাদ করলেন *'মাটির কাছে'* পত্রিকার ১৯৭৮-এর শারদ সংখ্যায়।

লক্ষ করার বিষয়, ১৯৭৮ সালে জনগণের রায়ে স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধার্থ সরকারের পতন ঘটে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন বামপন্থী দলের সম্মিলিত শক্তিতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে দুই দশকের উপর সমগ্র ভারতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে এই বামপন্থী সরকারই বারবার জনগণের রায়ে পুনর্নির্বাচিত হয়ে সরকার চালাচ্ছে। সত্তরের সন্ত্রাস অবসিত হয়েছে, রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সাধারণ জনজীবনে নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন হয়েছে, শিক্ষা সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার তৎপর হয়েছে। আগে যে থিয়েটার রাষ্ট্র বা প্রশাসন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা নিয়ন্ত্রিত হত এখন সেই থিয়েটার চর্চায় নিযুক্ত নাট্যকর্মীরা ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে থাকেন। অধিকন্তু দলমত নির্বিশেষে নাট্যক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পর্ষৎ, পরে

নাট্য আকাদেমির নেতৃত্বে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যচর্চায় উৎসাহ দেবার কাজ ধারাবাহিকভাবেই চলছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের বাতাবরণে ব্রেখ্‌ট চর্চা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

সত্তরের দশকে ব্রেখট নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, প্রযোজনা হয়েছে সেই অর্থে ব্রেখটের বেশ নিরীহ নাটক, অন্তত *'থ্রি পেনি অপেরা'* বা *'গুড উওম্যান অব্ সেৎজুয়ান'* বা *'লুকস ইন টেনেব্রিস'*-এর বঙ্গীয় সংস্করণে শাসক শ্রেণীর ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। শঙ্কিত হওয়ার ছিল *'রেজিস্টেবল রাইজ অব আর্টুরো উই'* কিংবা *'ইন সার্চ অব্ জাস্টিস'*, *'মাদার'* বা *'দি একসেপশন এন্ড দি রুলস'*-এর ব্যাপক অভিনয়ে। ঘটনাচক্রে সত্তর দশকে *'ইন সার্চ অব জাস্টিস'*-এর বাংলা রূপ *'কাজির বিচার'* (১৯৭২) ছাড়া অন্য নাটক কয়টি ছাড়াছাড়া অভিনয় হয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে দেখা যাবে বাংলায় ব্রেখ্‌টচর্চা তার প্রকৃত স্থান খুঁজে পেয়েছে। মঞ্চ ছাড়া নাটক হয় না, এবার তাই মঞ্চ থেকে মাঠমঞ্চ জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্রেখট প্রযোজনা শুরু হয়।

ব্রেখট প্রযোজনার পর্যালোচনায় প্রবেশের আগে ব্রেখট সংক্রান্ত আলোচনায় এই দুই দশকের সামগ্রিক অবদানটি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক। এ দুই দশকে ব্রেখট ও তাঁর থিয়েটারের প্রয়োগকর্মাদির বিশ্লেষণ যে পরিমাণে হয়েছে সে পরিমাণে তাঁর তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা কমে এসেছে। কমে আসার কারণ ব্রেখট নিজেই তাঁর আবিষ্কৃত ফেরফ্রেমডুঙ তত্ত্বের বাঁধনে আর বাধা থাকতে চাননি তাঁর বার্লিনের্ আঁসেমবলের প্রযোজনায়—এ তথ্য জানার পর আমাদের দেশের ব্রেখট প্রযোজনায় নির্দেশকরা আর তত্ত্বের তোয়াক্কা করেননি। নাট্যবস্তুটিই আসল, প্রয়োগ সেই নাটক অনুযায়ী হবে—অভিনয়ে চরিত্র আর চরিত্রাভিনেতা কতখানি দূরত্ব বজায় রাখবেন, এ নিয়ে আর কূটকচাল চালিয়ে লাভ নেই। ১৯৬৫ সালে কলকাতায় ব্রেখ্‌টের থিয়েটারের *'মাদার কারেজ'* চলচ্চিত্র দেখার পর ফেরফ্রেমডুঙের দুর্বোধ্য পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আতঙ্ক খানিকটা কমে আসে স্থানীয় নাট্যকর্মীদের মধ্যে, তারপর ১৯৬৭ সালে শম্ভু মিত্র পূর্ব জার্মানি-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের থিয়েটার দেখে এসে *'বহুরূপী'* পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন 'কেউ যেন পণ্ডিতদের কথায় সন্ত্রস্ত না হন। ব্রেখটকে ভালো লাগলে নিজের সহজ বুদ্ধিতেই তাঁর নাটককে করবার চেষ্টা করবেন, বা দেখবেন। তাতেই ব্রেখ্‌টকে ঠিক বোঝা যাবে।'

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৯-৭০ সালে ব্রেখ্‌টকে তাঁর নিজের নাট্যভাবনার মধ্যে আত্মস্থ করে *'তিন পয়সার পালা'*য় জমিয়ে দিলেন। সেই থেকে ব্রেখট কী, ব্রেখট কেন, ব্রেখট কী ভাবে, কতখানি ব্রেখট আর কতখানি অব্রেখট ইত্যাদি আলোচনা লেখালেখি প্রচুর পরিমাণেই হল পুরো সত্তর দশক জুড়ে।

ব্রেখট নিয়ে আতঙ্ক কেটে গেছে, কারণ ব্রেখ্‌ট প্রায় বাঙালি হয়ে উঠেছেন আমাদের কাছে। ১৯৭৯ সলে *'পশ্চিমবঙ্গ'* সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাম বসু ব্রেখটের কবি প্রতিভার

দিক নিয়ে আলোচনা করলেন, এ বিষয়ে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ব্রেখটের জন্মদিন পালনের উপলক্ষে সেমিনারও হল শিশিরমঞ্চে। অরুণ মুখোপাধ্যায় *'গ্রুপ থিয়েটার'* পত্রিকায় ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় (নভে-জানু '৭৮-৭৯) প্রবন্ধ লিখলেন *'ব্রেখটকে ভুল বুঝে'*। ১৯৮০ সালে *'সমকালীন কলকাতা'* পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় *'কলিকাতা এখন ব্রেখট নগরী'*। ১৯৮১-র *'নাট্যচিন্তা'*-র ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় বেরোলো *'ব্রেখটের লেখা পরীক্ষামূলক নাটক সম্পর্কে দু'চার কথা'*। ভাষান্তর তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বছরের *'গ্রুপ থিয়েটার'* পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যায় পলাশ মজুমদার লিখলেন *'পিপলস থিয়েটার মুভমেন্টে বিপ্লবের কবি ব্রেখট, ভবিষ্যতের পথনির্দেশ'*। এই বছরই *'গন্ধর্ব'*-র ৩১ সংখ্যায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন *'ব্রেশটের নাটক : অভিনেতার ভূমিকা'*। ১৯৮২-তে *'সমতট'* পত্রিকার এপ্রিল-জুন সংখ্যায় সোমেন গুহ লিখলেন *'বের্টোল্ট ব্রেশট ও সাধারণ মানুষ'*। অশোক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে প্রকাশিত হল *'শূদ্রক'* শরৎ ১৩৯৪ ইং ১৯৮৭ সংকলনে হুয়া জুয়েলিনের প্রবন্ধ অবলম্বনে তুলনামূলক আলোচনা *'মেইলানফাঙ্ : স্তানিস্লাভস্কি : ব্রেশট'*। *'শিল্পীর আয়ুধ'* অক্টোবর ৮২-তে বেরোলো পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে ব্রেখটের নিবন্ধ *'জনপ্রিয়তা ও বাস্তববাদ'*। *'অনুষ্টুপ'* পত্রিকা বিশেষ ব্রেখট ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এবং এই সংখ্যাতেই সোমেন গুহ প্রভৃত পরিশ্রমে *'বাংলায় ব্রেষট চর্চা—একটি সংকলন'* শীর্ষক সারণিতে বাংলা ভাষায় কবে কখন কীভাবে ব্রেখট চর্চা শুরু হল তার গোড়া থেকে এই '৯০-এর দশক পর্যন্ত বহু রচনা ও অনুবাদের তালিকা দেন। আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনা এই সংকলনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এরপর ১৯৮৫-র *'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার'*-এ দুই কিস্তিতে শেখর বসু-র অনুবাদে প্রকাশ পেল *'থ্রি পেনি অপেরার'* প্রথম অভিনয়ের আনুপূর্বিক কাহিনী : *'প্রথম রজনীর আগে অজস্র রজনী'*। লেখিকা অভিনেত্রী লত লোনয়াউইল।

১৯৮৬-র শারদসংখ্যা *'গ্রুপ থিয়েটার'* পত্রিকায় সরোজমোহন মিত্র 'বাংলায় ব্রেশটচর্চা' বিষয়ে আরও বিস্তারিত হলেন। ১৯৮৮-তে *'এপিক থিয়েটার'*-এ উৎপল দত্ত লিখলেন *'শেক্সপিয়র ও ব্রেখট'* প্রবন্ধ। ব্রেখট বিষয়ে এই সময়কালে লেখালেখি কমে এসেছে, তবু এই সময়েই ১৯৯০ সালে *'শাব্দিক'* পত্রিকা প্রথম বর্ষ সংকলনের বিষয়ই করলেন *'বের্টোল্ট ব্রেশট বিশেষ সংখ্যা'*। *'বহুরূপী'* পত্রিকায় ৭৩ ও ৭৪ সংখ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য দুটি মূল্যবান নিবন্ধ লিখলেন—*'ব্রেশট-এর গ্যালিলিও : দুই স্বীকারোক্তির সমস্যা'* ও *'গ্যালিলিওর জীবন বনাম গ্যালিলিওর জীবন'*।

ব্রেখট নিয়ে বাংলা বই

বাংলায় ব্রেখট চর্চার আর এক উল্লেখযোগ্য দিক ব্রেখট ও তাঁর থিয়েটার বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ তালিকায় যে নামগুলি উঠে আসে তা হল : ১ *'স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখট'*–উৎপল দত্ত, এম সি সরকার কর্তৃক ১৯৭২-এ প্রকাশিত-

উৎপল দত্তের মূল্যবান বিশ্লেষণ। ১৯৭৮-এ নাট্যভাবনা থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে এ বইয়ের। এখন তৃতীয় মুদ্রণ চলছে। ২. *'ব্রেখ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার'*—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা প্রকাশনী থেকে ১৯৭৭-এ প্রকাশিত হল, ব্রেখ্‌ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আলোচনা। তিন বছর পরে (১৯৮০) ওই একই প্রকাশনা থেকে লেখকের দ্বিতীয় বই-—'ব্রেশ্‌ট/ডায়ালগ' বেরোয়। ৩. *'নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগ : স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেশ্‌ট'*—সঞ্জীব সেন, নবগ্রন্থ কুটির থেকে ১৯৭৮-এ প্রথম সংস্করণ বেরোয়, ১৯৮৪-তে নাট্যভাবনা থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। ৪. *'ব্রেখ্‌ট ও আধুনিক থিয়েটার'*—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে ব্রেখ্‌ট শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) বিভিন্ন সময়ে রচিত আটটি প্রবন্ধের সংকলন। ব্রেখ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার বিষয়ে গ্রন্থাদি মোটামুটি এই। এ ছাড়া ব্রেখ্‌টের কবিতা ও নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর গ্রন্থাকারে কিছু বেরিয়েছে। সম্প্রতি রথীন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ব্রেখ্‌ট জন্মশতবর্ষে *'নাট্যচিন্তা'*-র যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় ব্রেখ্‌ট চর্চার সামগ্রিক রূপরেখার সন্ধান নিতে গেলে এ বই আজ নাট্যবোদ্ধাদের কাছে অপরিহার্য। এ ছাড়া রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ব্রেখ্‌টের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে অনেক অনুপপত্তির সমাধান খুঁজছিলেন, সম্প্রতি তাঁর সেই মূল্যবান অনুসন্ধানও গ্রন্থাকারে—*'বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট : প্রয়োগের নন্দনতত্ত্ব'*—অনুষ্টুপ থেকে বেরিয়েছে।

ব্রেখ্‌ট বিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা আরও সহজ ও বিশদ হবে। ব্রেখ্‌টের অনুসন্ধান আর বাংলা থিয়েটারের রাজনৈতিক অভিমুখের অনুসন্ধান যদি কোনোদিন একসূত্রে মিলে যায়, সেইদিন বাংলায় ব্রেখ্‌টচর্চা হয়তো লক্ষ্যসিদ্ধি করতে পারবে।

এই ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলায় ব্রেখ্‌ট বিষয়ে লেখালেখির একটি সামগ্রিক রূপরেখা আঁকা গেল। এর মধ্যে তথ্যের ফাঁক থাকতে পারে, কোনো লেখার অনুল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু সচেষ্ট থাকা গেছে ব্রেখ্‌ট বিষয়ে লেখালেখির অভিমুখ বা প্রবণতা বুঝে নিতে। প্রবণতার একটি দিক হল ব্রেখ্‌টের বিভিন্ন ছোট ও বড় নাটক অনুবাদে অভিনয় করার চেয়ে বাংলায় রূপান্তরিত করে ব্রেখ্‌টকে জনপ্রিয় করার একটা উদ্যোগ প্রথম দিকে ঘটলেও পরবর্তীকালে ব্রেখ্‌টের বিশিষ্ট কয়েকটি নাটক অনূদিত অভিনয়েই সফল হয়েছে বেশি। অর্থাৎ দেশের সমকালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে মিলিয়েই ব্রেখ্‌টকে, তাঁর চিন্তাকে আপন করে নেওয়ার প্রস্তুতি তখন বাংলার বিশিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ঘটে গেছে। দ্বিতীয় প্রবণতা হল ব্রেখ্‌টের প্রবর্তিত এপিক থিয়েটার ও ফেরফ্রেমডুঙ্ বা অ্যালিয়েনেশন তত্ত্ব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা চলেছে নানান নিবন্ধাদি রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে। তৃতীয় প্রবণতা হল, ব্রেখ্‌টের রাজনৈতিক মতাদর্শ, মার্কসবাদ এবং তাঁর নাট্য প্রয়োগের দ্বান্দ্বিকতা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা। চতুর্থ প্রবণতা হল ব্রেখ্‌ট কতখানি মার্কসবাদী আর অমার্কসীয় তা নিয়ে ডান বামে তার্কিক কূটকচাল চালিয়ে ব্রেখ্‌ট থিয়েটারের ডায়ালেকটিকস্‌কে বিভ্রান্ত করা।

বাংলায় ব্রেখ্‌ট প্রযোজনা

বাংলায় অর্থাৎ বাংলাভাষায় ব্রেখ্‌টের নাট্যপ্রযোজনা কেবল পশ্চিমবাংলাতে হয়েছে তা নয়, বাংলাদেশেও ব্রেখট প্রযোজিত হয়েছে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে। ভারতেও অন্যান্য প্রদেশে যেখানে বাংলাভাষার থিয়েটার চর্চার সুযোগ আছে সেখানেও বিগত দুই তিন দশকে সফলতার সঙ্গে ব্রেখটের ছোট ও বড় নাটক দুইই অভিনীত হয়েছে।

১৯৬১ : বাংলায় প্রথম ব্রেখ্‌ট প্রযোজনা

১৯৫৯-৬১ সালে বাংলায় গণনাট্য সংঘই প্রথম ব্রেখট প্রযোজনা মঞ্চস্থ করার গৌরব অর্জন করেছে। ব্রেখটের মৃত্যুর পর জ্যোতি রায় ১৯৫৭ সালে *'অগ্রণী'* পত্রিকায় *'দি রুল এন্ড দি একসেপশন'*-এর অনুবাদ করেন *'আইন'* নামে। এবং এই অনুবাদই গণনাট্যের আড়িয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর শাখা কনকভূষণ রায়ের পরিচালনায় প্রথম অভিনীত হয়। ব্রেখটের ওই একই নাটক ১৯৬১ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হয়ে *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* নামে *'এক্ষণ'* পত্রিকায় বেরোলে ব্রেখট কলকাতার প্রগতিশীল মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেন। এই *'আইন'* বা *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* অথবা *'ব্যতিক্রম'* নামে একটি নাটক বাংলার প্রযোজকদের আকৃষ্ট করে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বের কারণে। কবিতার সৌন্দর্য ও গদ্যের রূঢ়তা এ নাট্যের আষ্টেপৃষ্ঠে। যাই হোক *'আইন'*-এর প্রথম অভিনয়ের পর অরুণ মুখোপাধ্যায়ের দাবি যে তাঁরাই ঋত্বিক নাট্য সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রথম ব্রেখট প্রযোজনা করেন। হাওড়া জুটমিল ময়দানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ *'বিধি ও ব্যতিক্রম'*-এর পাণ্ডুলিপি থেকে। সৌমিত্র অনুবাদ করেছেন ১৯৬১-তে। আসলে এ রকম ছোটখাটো দু'একটি উদ্যোগের তেমন কোনো প্রতিবেদন তখন কাগজে বেরোতো না। আর উদ্যোক্তারাও প্রথম প্রযোজনার হ্যান্ডবিল বা স্মারক তেমন কিছু তখন ছাপতে সমর্থ হতেন না; ফলে বাংলায় ব্রেখটের আদি প্রযোজনা সম্পর্কে স্মৃতিনির্ভর কথা ছাড়া পাকা প্রমাণ তেমন কিছু নেই। বর্তমান লেখকেরও এই সময়ের এক ব্রেখট অভিনয়ের কথা স্মরণে আছে--—এই *'আইন'* বা *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* নাটকেরই একটি অভিনয় হয়েছিল ইন্ডোর স্টেডিয়ামের খোলা মঞ্চে—গণনাট্য সংঘের কোনো শাখা করেছিল, সালটা ৬১-৬৩-র কোনো সময় যুব উৎসব কিনা খেয়াল নেই। *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* নাটকের একাধিক অভিনয় দেখার সৌভাগ্য অনেকের সঙ্গে বর্তমান লেখকের আছে। ১৯৬৭ সালে অনুশীলন সম্প্রদায় মমতাজউদ্দীন আহমেদের পরিচালনায় এবং চলাচল গোষ্ঠী রবি ঘোষের পরিচালনায় অভিনয় করে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজের পরিচালনায় প্রতিকৃতি নাট্যগোষ্ঠী ১৯৭২-র মে মাসে মুক্তাঙ্গনে এ নাটকের প্রথম অভিনয় করে; পরে আরও কয়েকটি অভিনয় হয়েছে। তবে *'বিধি ও ব্যতিক্রম'*-এর সর্বাধিক এবং সর্বাপেক্ষা সফল প্রযোজনা মঞ্চস্থ করেছিলেন ১৯৭৭ সালে ক্লাস থিয়েটারের রমেন সরকার। সৌমিত্রর অনুবাদকে ভিত্তি করেই শ্রী সরকার কাজটি শুরু করেন, পরে

পরিবর্তন সংশোধন সম্পাদনার মাধ্যমে এটা একটা নতুন অনুবাদ হয়ে ওঠে। ১৯৭৮ সালে গ্রিন অ্যামেচার অরুণ সরকারের পরিচালনায় আবার এই *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* অভিনীত হতে থাকে। আর এই ১৯৮১-তেই নান্দীকারের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত *'ব্যতিক্রম'* নামে এ নাটকেরই আর একটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলেন। এ প্রযোজনাটিও জনপ্রিয় হয়। আর এই ১৯৯৮ সালে ব্রেখট জন্মশতবর্ষে নান্দীপট নতুন করে *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* মঞ্চস্থ করেছে বিমল চক্রবর্তীর নির্দেশনায়। ১৯৩০ সালের চীনের মঙ্গোলিয়ার আর্থ-রাজনীতিক পটভূমিতে রচিত এই একাঙ্কে শোষণ ও বঞ্চনার বাস্তব রূপ উদ্ঘাটন করেছেন এক ব্যবসায়ী ও তার গাইড এক কুলির বাণিজ্যযাত্রাকে কেন্দ্রে রেখে। দুর্গম পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দাঁও মারার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যবসায়ী কী নির্মমতার সঙ্গে কুলিটিকে শোষণ করে পরিশেষে খুন করে তার এক ভয়ংকর নাট্যকাব্য এ নাটকের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে কুলি হত্যার বিচার। শোষণভিত্তিক সমাজের তথাকথিত আইনি বিচারে ব্যবসায়ী ছাড়া পায়, কারণ তিনি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কুলিটিকে নাকি হত্যা করেছেন। কুলিটি মালিকের প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশে জল দিতে এগিয়েছিল ঠিকই কিন্তু শোষণভিত্তিক সমাজের রীতি অনুযায়ী মালিক ভেবেছিল কুলিটি হয়তো প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে তাকে খুন কবতে আসছে। শোষক শ্রেণীর ছুতোর অভাব হয় না নিজের শ্রেণীস্বার্থ রাখার।

এ ছাড়াও এ নাটকের আরও প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়ে থাকতে পারে জেলান্তরে, সে সব তথ্য আমাদের হাতে নেই। বাংলাদেশেও ব্রেখট জনপ্রিয়, কিন্তু এ নাটকের অভিনয় বাংলাদেশের কোনো নাট্যগোষ্ঠী করেছেন কি না জানি না। বামপন্থী পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী ব্রেখটকে উপস্থাপিত করায় *'বিধি ও ব্যতিক্রম'* নাটকটি একটি অতুলনীয় বৃঙ্গানুবাদ। আমরা সব কটি অনুবাদের মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদকেই সহর্ষ অভিনন্দন জানাব।

১৯৬৪ : ব্রেখ্‌টের গ্যালিলিও চরিত

এর পরপরই ব্রেখটের যে নাটকটি এ বাংলার বিশিষ্ট এক নাট্যকারের দ্বারা প্রথম অনূদিত হয়ে সাড়া ফেলেছিল সেটি হল *'লেবেন ডেস গালিলে'*-র বঙ্গানুবাদ। *'গ্যালিলিও চরিত'*। অনুবাদ ঋত্বিক ঘটক। ১৩৭১ বঙ্গাব্দে (ইং১৯৬৪) প্রসূন বসু সম্পাদিত *'শারদীয় উত্তরকাল'* এ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি কর্তৃক সুশীল সিদ্ধান্তের পরিচালনায় ১৯৬৪ সালে এটি প্রথম অভিনীত হয়। এর ভূমিকালিপি ছিল : আন্দ্রেই-তীর্থঙ্কর বসু, গ্যালিলিও-অবন্তী সান্যাল, সাগ্রেদো অমূল্য সেন, ভার্জিনিয়া-জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, লুদোভিকো-দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পোপ-মৃণাল ভদ্র, অন্যান্য চরিত্রে বিজিতকুমার দত্ত প্রভৃতি। এই *'গ্যালিলিও চরিত'* পরে আর অভিনয় হয়েছে কি না জানা নেই, কিন্তু ব্রেখটের গালিলিও-র আরও যে কটি অনুবাদ হয়েছে, তার মধ্যে জনপ্রিয়তম প্রযোজনা ছিল কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের *'গালিলিওর*

জীবন' অনুবাদ করেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ফ্রিৎস বেনেভিটসের পরিচালনায় এর মাত্র ২০টি প্রদর্শন হয়, নাম ভূমিকায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। এ প্রযোজনা নিয়ে কলকাতা ১৯৮১ সালে তর্কে-বিতর্কে, প্রশংসার উতর-চাপানে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ত্রিতীর্থ র প্রয়োজনায় নীহার ভট্টাচার্য ও সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে '*গালিলেও গ্যালিলাই*' নামে মঞ্চস্থ করেন। কয়েকটি শো হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে সুব্রত নন্দী '*গালিলিও*' নামে আর একটি অনুবাদ করেন, ছাপা হয় অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত শারদ '*নাট্যপত্র*'-এ। বহুরূপী ১৯৮০-র অক্টোবরে সুব্রত নন্দীর এই অনুবাদই কুমার রায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেন। গালিলেওর ভূমিকায় প্রথম দিকে অবতীর্ণ হন অমর গাঙ্গুলি পরে বহুরূপী-র এই প্রযোজনায় কুমার রায় অভিনয় করেন। বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় খুবই উঁচুমানের দল। এঁরা আবদ্‌স সেলিমের অনুবাদে '*গালিলিও*' অভিনয় করেন। মূল চরিত্রে অবতীর্ণ হন বিশিষ্ট অভিনেতা আলি যাকের। পবিচালনা ছিল বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক আতাউর রহমানের। আমরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও ত্রিতীর্থ ছাড়া সব কটি প্রযোজনাই একাধিকবার দেখেছি। গালিলিওর ভূমিকায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ অভিনয় শম্ভু মিত্রের। কলকাতা নাট্যকেন্দ্রেব ওই ২০টি প্রদর্শনী যে সব দর্শক দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, আমাদের ধারণা, তাঁবা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় দেখার সৌভাগ্যে তৃপ্ত। যেমন শম্ভু মিত্রের অভিনয়, তেমনই সমগ্র প্রযোজনা ও তার প্রতিটি কুশীলবের নিখুঁত অভিনয় বা নেপথ্য কৃত্যাদি ছিল বিশ্বমানের।'

১৯৬৫ : ব্রেখ্‌টের মাদার কারেজ

১৯৬৫ সালে ব্রেখটের '*মাদার কুরাজ*'-এর প্রথম অনুবাদ করেন বিষ্ণু বসু, প্রকাশিত হয় মৎ সম্পাদিত '*গন্ধর্ব*'-র বের্টল্ট ব্রেশট সংখ্যা ১৩৭২, ইং ১৯৬৫-তে। এ অনুবাদের অভিনয় হয়নি। এর পরেই এ নাটকের প্রথম বঙ্গীয়করণ করেন উৎপল দত্ত তাঁর সম্পাদিত '*এপিক থিয়েটার*' পত্রিকার প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায়। ব্রেখট সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার মুখপত্ররূপে ১৯৬৫-র শরৎকালে '*এপিক থিয়েটার*' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই 'হিম্মতবাঈ'-র একটি দৃশ্য অভিনীত হয় বেনেভিটসের নির্দেশনায় ১৯৮৭-তে, মায়ের ভূমিকায় নেমেছিলেন শোভা সেন। ১৯৮৫ সাল অনার্য নাট্যসম্প্রদায় মধুশ্রী দত্তের অনুবাদ ও পরিচালনায় '*মাদার কারেজ ও তার ছেলেমেয়ে*' নামে একটি বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ করে, এ প্রযোজনাটি উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছিল। '*মাদার কারেজ*'-এর প্রথম সফল প্রযোজনা হল বহরমপুর যুগাগ্নি-র '*মা অভয়া*'। কৌশিক রায় চৌধুরীর বঙ্গীয়করণে গৌতম হালদারের নির্দেশনায়-অভিজিৎ সরকারের উদ্যোগী চেষ্টায় '*মা অভয়া*'-র সফল প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা সৌভাগ্যবান। মা অভয়ার ভূমিকায় যে মহিলাটি প্রথম অভিনয় করেছিলেন তাঁর অভিনয় ছিল গভীর চেতনাদীপ্ত। সম্প্রতি কলকাতায় রঙ্গকর্মীর ঊষা গাঙ্গুলি নির্দেশিত,

অভিনীত-হিন্দি *'হিম্মতমাই'*-এ শ্রীমতী উষাও যেন ওই রেনজে পৌঁছতে পারেননি। যুগাগ্নি-র *'মা অভয়া'* আবার নতুন করে মঞ্চস্থ হচ্ছে, এবার অভিনয় করছেন সীমা সরকার।

১৯৬৬ : ব্রেখ্‌টের ইনফরমার

ব্রেখটের আর একটি ছোট নাটক *'ইনফরমার'* বাংলায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে বেশ কয়েকবার। তার মধ্যে সুমন্ত চক্রবর্তী অনূদিত *'গোয়েন্দা'* প্রকাশিত হয়েছিল *'আন্তর্জাতিক'* পত্রিকায়। অভিনীত হয়েছিল গণনাট্য সংঘের সাম্প্রতিক শাখার দ্বারা ১৯৬৬-তে। *'সাদা পোশাক'* নামেও প্রকাশ চন্দ বাংলা অনুবাদ করেন, প্রকাশক সাহিত্যধারা।

১৯৭৮ সালে *'ইনফরমার'* নামেই এই ছোট নাটকটি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেন, অভিনয় করেন সোহাগ সেনের পরিচালনায় সি পি এ টি। সোহাগ সেন ১৯৮৪-তে আনসম্বল-এর প্রযোজনায় *'গুপ্তচর'* নামে ওই নাটকটি আবার মঞ্চস্থ করেন। সুযশ ভট্টাচার্যের অনুবাদে *'গুপ্তচর'* নামে ১৯৮৩-র ৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরের প্রান্তিকের প্রযোজনারূপে এটি প্রথম অভিনীত হয়। নির্দেশনা ছিল প্রদীপ ভট্টাচার্যের। প্রান্তিকের এ প্রযোজনাটিও বহুল অভিনীত। মধুশ্রী দত্ত *'পুলিশের চর'* নামে নাটকটির যে অনুবাদ করেন তা বেরোয় রথীন চক্রবর্তী সম্পাদিত *'নাট্যচিন্তা'* পত্রিকায় ১৯৮৬-র মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায়; এর অভিনয় হয়েছে কি না সে খবর নেই।

১৯৬৬ : ব্রেখ্‌টের সমাধান

'ডি মাসনামে' ব্রেখটের শিক্ষামূলক ছোট নাটকের অন্যতম। ১৯৩০ সালে রচিত। এর চমৎকার বঙ্গানুবাদ করলেন উৎপল দত্ত ১৯৬৬ সালে। বেরোল পবিত্র সরকার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *'থিয়েটার'* পত্রিকার ১ম বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৯৬৬-তে। ১৯৬৭-তে গণনাট্য সাম্প্রতিক শাখা ও থিয়েটার স্টাডি দুটি সংস্থার উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল। কমিউনিস্ট পার্টির আন্তঃপার্টি সংগ্রামের একটি দিক যেমন এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনই জনমানুষের স্বার্থ আর পার্টির স্বার্থর মধ্যে কোনটিকে কী ভাবে একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী মান্য করে চলবেন সেই প্রশ্নেরও সঙ্গত সমাধান উন্মোচন করে দেখিয়েছেন ব্রেখট তাঁর এই নাটকে। কমিউনিস্ট পার্টির এই সমালোচনামূলক নাটকের জন্য ব্রেখট তখন বিতর্কিত নাট্যকার হয়ে উঠেছেন। আমাদের এখানে ৬৬-৬৭ সালে দুই কমিউনিস্ট পার্টি। তার আগে ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টিতে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের পরিণামে পার্টি বিভাজন ঘটে গেছে। বিভাজিত পার্টির দুই লাইনেই দেখা যাচ্ছে *'সমাধান'* অভিনীত হল। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট তখন গণনাট্যের সাম্প্রতিক শাখা, তাঁরাও যেমন *'সমাধান'* মঞ্চস্থ করলেন, তেমনই নকশালবাড়ির সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী গণশিল্পী সংস্থার শাখা থিয়েটার স্টাডিও এই

একই নাটক মঞ্চস্থ করছেন। ১৯৬৯ সালে ঋত্বিক সম্প্রদায় *'সমাধান'* করলেও ১৯৮০-তে চেতনা গোষ্ঠীর উদ্যোগে মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় যে *'সমাধান'* মঞ্চস্থ হয় সেটি বহুল (৬৯ বার) অভিনীত এবং সুপ্রযোজিত। গণনাট্য সংঘের ১৯৮০-র ৭ম রাজ্য সম্মেলনে ইডেনে ২০ হাজার দর্শকের সামনে এটি অভিনীত হয়। বোকারো-র প্রবাসী প্রতিযোগিতা মঞ্চে *'সমাধান'* মঞ্চস্থ করে আশির দশক থেকেই সফলতা অর্জন করেন। এর পরেও আরও কোনো কোনো দল এ নাটকটির অভিনয় করেছে, তার মধ্যে ওপেন থিয়েটার অঞ্জন দত্তের নির্দেশনায় ম্যাক্সমুলার নাট্য প্রযোজনাটি কমিউনিস্ট বিরোধী প্রযোজনারূপেই উপস্থাপিত হয়।

'ডি মাসনামে'-র আর একটি অনুবাদ করেন নীহার ভট্টাচার্য।

১৯৬৬ : খড়ির গণ্ডী তিনরকম

'ককেশিয়ান চক সার্কল'। ব্রেখটের এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি ১৯৪৫ সালে রচিত। যৌথ খামার ব্যবস্থায় জমির প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণে মানবিকতার প্রশ্নে জমির প্রতি যত্নে কৃষকের মমতা ও আসক্তির স্বার্থকেই ব্রেখট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। সেই সঙ্গে শ্রেণী শাসনে পরিবর্তন ঘটালে সে শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা যাবে, সেই শ্রেণীর স্বার্থেই আইন বা বিচার নির্ণীত হবে—এই সিদ্ধান্তকেও ব্যক্ত করেন। এ নাটকটি ১৯৬৬ সালে ঋত্বিক ঘটকের অনুবাদে *'গন্ধর্ব'* পত্রিকার ২৭ সংখ্যা (নভে '৬৫-জানু '৬৬) ও ২৯ সংখ্যা (শারদীয় ১৯৬৬)য় প্রকাশিত হয়। ঋত্বিক ঘটক তখন পুনে শিল্প ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। ১৯৬৫-তেই নাটকটি আমাদের অনুরোধে অনুবাদ করে পাঠান, কিন্তু বিলম্বে আসার জন্য '৬৫-র শারদীয় সংখ্যায় বের করা যায়নি। ২৭ ও ২৯ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে বেরোয়; মাঝে ২৮ সংখ্যা গ্যাপ যায়, লেখাটি দুই কিস্তিতে ডাকযোগে আসে। যাইহোক, ঋত্বিক ঘটক বাংলা তথা ভারতের বামপন্থী গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বলে উনি ১৯৬৫-তেই অনুভব করেছিলেন বাংলায় কৃষক সভার নেতৃত্বে জমির আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠবে। কার্যত হলও তাই, হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে ১৯৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০ এই পাঁচ বছর জমিদার জোতদারদের হাত থেকে লুকানো জমি উদ্ধার করে জবরদখল করার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ৬৬-৬৮-তে প্রথম যুক্তফ্রন্ট, ৬৯-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 'লাঙল যার জমি তার' এই শ্লোগানে গ্রাম বাংলায় শ্রেণী শাসনের পালাবদল ঘটাতে চলেছে। এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়েই ব্রেখটের *'খড়ির গণ্ডী'* অনূদিত হল ঋত্বিক ঘটকের উদ্যোগে। কিন্তু কলকাতা বা জেলার নাট্যদল তখন এ নাটক অভিনয়ের তাগিদ অনুভব করেনি। সামর্থ্যের অভাব ছিল না বলব না, আসলে চাষির হাতে জমি দেবার ঘটনার তাৎপর্যই তখন বোঝেননি আমাদের তৎকালীন নাট্য প্রযোজক দল বা নির্দেশকরা। বরং অনেক অনামা নাট্যদল প্রায় শৌখিন, সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠীর অশোক সেন নিজেই এই নাটকটির পৃথক অনুবাদ করে *'ককেশিয়ান চক সার্কল'* নামে ১৯৬৮-তে একবার অভিনয় করেন। এই সময় রঞ্জন ঘোষ *'সোনালী*

সমুদ্রের গান' নামে এর একটি রূপান্তর করেন, আগরতলা থেকে *'দৈনিক সংবাদ'* শারদসংখ্যা ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয়। *'ককেশিয়ান চক সার্কল'* বাংলায় ব্রেখ্‌ট চর্চার প্রেক্ষিতে গুরুত্ব পেয়েছে প্রায় এক দশক বাদে, ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর। যে জমির লাইন কৃষকের রক্ত ঝরিয়ে আইনকে অস্বীকার করে বেআইনি জবরদখলের লড়াই ছিল, সেই লড়াই যখন বামফ্রন্টের আমলে আইনি পথে 'অপারেশন বর্গা' নামে জমিতে চাষির বর্গাস্বত্ব মেনে নেওয়ার ঘটনাকে বাধ্যতামূলক করল, ভূমি সংস্কার আইনের এ একটি সফল প্রয়োগ, যা সারা দেশে দৃষ্টান্তমূলক (জনকল্যামূলক অর্থনীতির প্রবক্তা অমর্ত্য সেন এই পদ্ধতির গুণ উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেছেন) হয়ে উঠেছে। তখন দেখা গেল এ রাজ্যের বামপন্থী ও অবামপন্থী একাধিক নাট্যগোষ্ঠী *'ককেশিযান চক সার্কল'* প্রযোজনায় মেতে উঠেছেন।

কলকাতায একসঙ্গে তিনটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ ১৯৭৮ সালে। নান্দীকার মঞ্চস্থ করলেন *'খাড়ির গণ্ডী'* নামে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অনুবাদ ও নির্দেশনায়। সুব্রত নন্দীর অনুবাদ ও নির্দেশনায় থিয়েটার ফ্রন্ট মঞ্চস্থ করলেন *'খড়িমাটির গণ্ডী'* নামে। বাদল সরকার তাঁর অঙ্গন মঞ্চের রীতিতে *'গণ্ডী'* নামে নামালেন শতাব্দীর প্রযোজনায়। এই তিনটির মধ্যে সেরা প্রযোজনা হয় নান্দীকারের। প্রোলোগ বা নান্দীঅংশ বাদ দেয় নান্দীকার ও শতাব্দী। তাতেই বোঝা যায় ব্রেখটের নাটকের কমিটমেন্ট আর আমাদের বুদ্ধিজৈবিক কমিটমেন্টের মধ্যে ব্যবধান কোথায়। *'ককেশিয়ান চক সার্কল'* নামে জিষ্ণু দে আর একটি অনুবাদ করেন, এটি প্রকাশিত হযেছিল সম্ভবত *'পরিচয়'* পত্রিকায়, কোনো অভিনয়ের খবর নেই। *'খড়িব বৃত্ত'* নামে পার্থ মুখোপাধ্যায় আরেকটি অনুবাদ করেন ১৯৭১-এ সায়ন্তনী সংস্থা 'ককেশিয়ান চক সার্কল' অবলম্বনে *'আদালত থেকে'* মঞ্চস্থ করেন, রূপান্তর ও নির্দেশনা ছিল মিহির চট্টোপাধ্যায়ের। ১৯৯০ সালে অঞ্জন দত্তের রূপান্তরিত *'গণ্ডীর খেল'* মঞ্চস্থ হয় ওপেন থিয়েটারের উদ্যোগে, নির্দেশনা অঞ্জন দত্তের।

১৯৬৮ : ব্রেখ্‌টের ভালো মানুষ নিয়ে কত পালা

'দি গুড পারসন অব সেটজুয়ান' ব্রেখট লেখেন ১৯৩৮-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ১৯৬৮ সালে অশোক সেন প্রথম অনুবাদ করেন ইংরেজি নামেই, অভিনয়ও করেন তাঁর সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠীর উদ্যোগে। ওই বছরেই ইন্দো জি ডি আর মৈত্রী সমিতিও এই অনুবাদ অভিনয় করে। এই শৌখিন উদ্যোগের পরে ১৯৭১ সালে শ্যামল সেন পরিচালিত থিয়েটার গিল্ড প্রলয় শূরের অনুবাদ রূপান্তরে *'ভাল মানুষের মেয়ে'* নামে মঞ্চস্থ করেন। এই সময়ে শৌভনিকের নিবেদিতা দাস সম্ভবত ১৯৭২-এ *'শুকতারা'* নামে এ নাটকের রূপান্তর করেন, নাটকটি শৌভনিক সংস্থার উক্ত নামের পত্রিকার ১ম কিংবা ২য় সংখ্যায় ছাপা হয়, অভিনয় হওয়ার খবর নেই। *'দ্য গুড উওম্যান অব সেটজুয়ান'* সত্তর দশকে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশে জনপ্রিয় প্রযোজনা হয়ে ওঠে। ব্রেখ্‌টকে

পশ্চিমবাংলায় জনপ্রিয় করেছিলেন যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্যদল নান্দীকারের প্রযোজনায় *'তিন পয়সার পালা'* নামিয়ে (১৯৬৯), সে কথায় পরে আসছি, সেই নান্দীকার তার দলের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে ১৯৭৪ সালে মঞ্চস্থ করেন *'ভাল মানুষ'*। নান্দীকারের দ্বিতীয় জনপ্রিয় ব্রেখ্‌ট প্রযোজনা। বাংলায় রূপান্তর ও নির্দেশনা অজিতেশের। কেয়ার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি ছিল শান্তা, শান্তাপ্রসাদ। নান্দীকার এ নাটকের মোট ৩০৫ রজনী অভিনয় করেছিল, কেয়া সব কটি অভিনয়ই করেছেন। এই ১৯৭৪ সালেই চতুর্মুখ অসীম চক্রবর্তীর রূপান্তর ও নির্দেশনায় ওই ১৯৭৪ সালই ৫ মে মঞ্চস্থ করল *'ভাল মানুষের পালা'*। ১৯৭৮ সালে এই রূপান্তরেই পুনঃপ্রযোজিত হয়। দুবার মিলিয়ে মোট অভিনয় হয়েছে মাত্র ২৭ বার। হাওড়ার সাঁকরাইল এলাকার সারথি-র রাজেন দাসের রূপান্তর *'ভাল মানুষের গল্প'* প্রকাশিত হয় *'অভিনয়'* পত্রিকায়, অভিনয় হয়েছে কিনা খবর নেই। সুধাংশু দাশগুপ্ত রূপান্তরিত *'বহুবল্লভা'* ও *'অভিনয়'* পত্রিকায় বের হয়; অভিনয় হয়েছিল ১৯৭৫-এ সান্ধ্য নাট্যসংঘের উদ্যোগে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে প্রথম ব্রেখট প্রযোজনার প্রবর্তন করেন নাগরিক নাট্যগোষ্ঠী, ঢাকা। আলী যাকের রূপান্তরিত ও নির্দেশিত প্রযোজনার নাম হল *'সৎ মানুষের খোঁজে'*। ১৯৭৫-এর ডিসেম্বর মাসে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশে ব্রেখট প্রযোজনার আদিপর্বের ইতিহাসে এই *'সৎ মানুষের খোঁজে'*-র রজতজয়ন্তী মঞ্চায়ন এক নতুন ঘটনা। এ নাটকের এখনও পর্যন্ত শেষ বঙ্গীকরণ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের *'শঙ্খপুরের সুকন্যা'* নান্দীকারের প্রযোজনায় অন্যতম ভালো কাজের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৯০-এর অক্টোবর মাসে *'শঙ্খপুরের সুকন্যা'* প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নান্দীকারের অতীতের প্রযোজনা *'ভালো মানুষ'*-এ যেমন কেয়া চক্রবর্তী, তেমনই এবারের প্রযোজনায় স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর অভিনয়ের গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে। সঙ্গে তরুণ অভিনেতা গৌতম হালদারও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ছিলেন উজ্জ্বল।

১৯৬৮ : ব্রেখ্‌ট অবলম্বনে মালবাজারের মা মালতী

১৯৬৮-তে ব্রেখটের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ *'সেন্ট জোয়ান অব দি স্টক ইয়ার্ডস'*-এর বঙ্গীকরণ করেন নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমে এর নাম দেন *'অথ মালতী বৃষভ কথা'*। চতুর্মুখ গোষ্ঠী অসীম চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ১৯৬৮-তে এটি মঞ্চস্থ করে। পরবর্তীকালে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এই নাট্যরূপটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নাম দেন *'মালবাজারের মা মালতী'* প্রযোজনা করেন দেবেশ চক্রবর্তী, তাঁর এপিক অ্যাক্টরস ওয়ার্কশপ-এর উদ্যোগে ১৯৮২-র ১১ অক্টোবর শিশির-মঞ্চে। প্রথম অভিনয়ের পর এটি ১৯৮৩-৮৫ পর্যন্ত একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। ফ্রান্সের অগ্নিকন্যা জোয়ান অব আর্ককে নিয়ে ব্রেখট একাধিক নাটক লেখেন, তার মধ্যে *'সেন্ট জোয়ান অব দি স্টক ইয়ার্ডস'*, *'ট্রায়াল অব জোয়ান অব আর্ক'* এবং

'ভিশনস অব সিমোন মাশা' বাংলায় রূপান্তরিত ও অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। *'মালবাজারের মা মালতী'* প্রযোজনায় পরিচালক মুখোশ সম্পর্কিত ব্রেখটের ভাবনার এক চমৎকার সমন্বয় করেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী চরিত্রগুলি তার স্ব স্ব শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব উপস্থিত করেছে মুখোশ ব্যবহারের মাধ্যমে। বিত্তবানের সঙ্গে শ্রমজীবীর সংঘাতে জোয়ান বা মা মালতী এখানে নেতৃত্বে রয়েছেন।

১৯৬৯ : ব্রেখ্‌ট ও তিন পয়সার পালা

১৯৬৮ পর্যন্ত ব্রেখটের যে কটি নাটকের বাংলা ভাষায় অনূদিত বা রূপান্তরিত প্রয়োগের কথা বলা হল তাতে প্রতিটি নাটকের প্রথম প্রযোজনার সূত্র ধরেই কালানুক্রমিকভাবে তথ্য অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৬১-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় ব্রেখট মূলত বিশিষ্ট নাট্যামোদীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। ব্যাপক দর্শক সমাজের কাছে ব্রেখটকে হাজির করা হল ১৯৬৯ সালে, করলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকারের ব্যানারে। রঙ্গনা মঞ্চে নান্দীকারকে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ব্রেখটের এই প্রযোজনা, যার নাম *'তিন পয়সার পালা'*। *'তিন পয়সার পালা'* ভিখিরিদের নিয়ে ব্যবসার এক মজাদার আলেখ্য। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ, তার দেহ, তার শ্রম কীভাবে মুনাফার পণ্যে পরিণত হয় তার উদঘাটন। পৃথিবীর সব জনপদেই শোষণ আছে। তাই ভিখিরি আছে। মানুষের সহানুভূতিকে মূলধন করে মানুষ দিয়েই মানুষের বিচিত্র ব্যবসা। লন্ডনের সোহ থেকে কলকাতার কালীঘাট ভিখিরি ব্যবসার একই ছবি। সুতরাং অজিতেশের স্বচ্ছন্দ রূপান্তরে ব্রেখট সহজেই বাঙালি হয়ে দর্শককে মজিয়ে দিলেন। এ নাটকের আঙ্গিকে সংগীত ও নাটের যে দেশজ লোকরীতি ব্যবহার করলেন অজিতেশ, তার প্রবাহে প্রায় এক দশক বাংলার বহু ছোটখাটো দলের নাট্যকল্পনার আধখানা ব্রেখট আর আধখানা অজিতেশ ভর করেন। নান্দীকারের এই প্রযোজনার হুবহু প্রতিরূপ তৈরি করেছিলেন বাটানগর থিয়েটার ইউনিট। পূর্ণাঙ্গ নাটকের যে সব প্রতিযোগিতা তখন অনুষ্ঠিত হত, সেইসব মঞ্চে বাটানগর থিয়েটার ইউনিটের কর্তৃক অভিনীত হত এ প্রযোজনা। কল্যাণীতে এর একটি অভিনয় দেখে বর্তমান লেখক বিস্ময় মেনেছিলেন। কলিকাতা যাত্রা সমাজ এর একটি যাত্রা প্রতিরূপও উপস্থিত করেছিলেন পশ্চিমবাংলার গ্রামেগঞ্জে ১৯৭৮ সালে। বাংলাদেশের বহুবচন গোষ্ঠী কামালউদ্দীন নীলুর রূপান্তরে *'তিন পয়সার পালা'* অভিনয় করেন ১৯৮৩ সালে, তারপর ১৯৯৭-৯৮ সময়েও পুনরভিনয় নাট্যাঙ্গন করেছিলেন। ১৯৯৬ সালের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশের নতুন নাট্যদল নাগরিক নাট্যাঙ্গন মুজিবর রহমান দিলুর রূপান্তরিত *'জনতার রঙ্গশালা'* ইনামুল হকের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ করে। এই নাটক ব্রেখট জন্ম শতবর্ষেও অভিনীত হচ্ছে।

১৯৬৯-৭০ সাল ভর *'তিন পয়সার পালা'* জমে যাওয়ায় বুদ্ধিজৈবিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই কলকাতার মঞ্চে বিভিন্ন দলের উদ্যোগে ব্রেখট করার ধুম পড়ে যায়।

১৯৭০ : গোর্কি-ব্রেখ্‌টের মা

১৯৭০ সালে ব্রেখটের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় নতুন করে সম্প্রসারিত গোর্কির *'মা'* উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলায় প্রথম অনুবাদ করলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ, তাঁকে সাহায্য করলেন বাসবী রায় ও শঙ্খ ঘোষ। ইন্দো-জি-ডি-আর মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে এই ১৯৭০-এ এর প্রথম অভিনয় হয়। তারপর ঋত্বিক সাউথ গোষ্ঠী প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ১৯৮০-র ২১ জানুয়ারি প্রথম *'মা'* মঞ্চস্থ করেন। বিশাল প্রযোজনা, ১৯৮৯-র ২০ মে পর্যন্ত ২৮ বার অভিনীত হয়েছে এ নাটক। বাংলায় তখন সন্ত্রাসের অবসান ঘটিয়ে বামপন্থী সরকারের সুসময়। মা-র চেতনার উন্মেষ ঘটছে ধীরে ধীরে, হাতে বই তুলে নিয়েছেন মা, ছেলে পাভেলের অসমাপ্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন না। এই আবেদন নিয়ে নারীমুক্তির প্রশ্নও প্রবল হয়ে ধাক্কা দেয় রাজনীতিক নেতৃত্বের চেতনায়। ফলে নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লড়াই বিশেষ মাত্রা পায় '৭৭-এর পরবর্তী সময়ে। ১৯৮২-তে চেতনা অরুণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ ও নির্দেশনায় *'মা'* নামান ৩১ ডিসেম্বর। সম্পূর্ণ ১৯৮৩ সালে জুড়ে *'মা'*-এর অভিনয় হয় ৪২টি প্রদর্শন। ঋত্বিক ও চেতনার *'মা'* এর অব্যবহিত পরে হিন্দিতে ঊষা গাঙ্গুলির *'মা'*-র চরিত্রাভিনয় সর্বোৎকৃষ্ট। ১৯৮৩-তে কার্ল মার্কসের মৃত্যুশতবর্ষ পালিত হচ্ছিল সারা দেশ জুড়ে। এই সময় মফস্বলের প্রতিযোগিতা মঞ্চে শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্রও গোর্কি-ব্রেখট অবলম্বনে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রসারিত *'মা'*-ও উদ্দীপক প্রযোজনা হয়ে ওঠে। বহু অভিনয় হয়েছে এ নাটকের।

১৯৭২ : সন্ত্রাস কবলিত পশ্চিমবাংলায় ব্রেখ্‌ট

১৯৭২ সাল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের দুঃসময়। এই দুঃসময়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপ ব্রেখ্‌টের দুটি ছোট নাটকের রূপান্তর মঞ্চস্থ করে। *'ব্রেখ্‌টের ইন সার্চ অব জাস্টিস'* ছোট নাটকের অশোক মুখোপাধ্যায় অনূদিত *'কাজির বিচার'* সময়োচিত নির্বাচন ছিল তখনকার পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কালে। এই সঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায় বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে যুগ্মভাবে বঙ্গীকরণ করলেন *'লুকস ইন টেনেব্রিস'* অবলম্বনে *'পাঁচু ও মাসি'*। হিটলারি সন্ত্রাসের আড়ালে দেশীয় সন্ত্রাসের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে থিয়েটার ওয়ার্কশপ সময়োচিত হলেও *'পাঁচু ও মাসি'*-তে সমালোচিত হয়েছে তীব্রভাবে। বেশ্যাবাড়ির পরিবেশ মাসি ও পাঁচুর অশ্লীল সংলাপে প্রযোজনা জমলেও মূল নাটকের বক্তব্যকে রূপান্তরিত নাটকের মধ্যে লক্ষ্যযুক্ত করা হয়নি। বড়োলোকদের ব্যবসা আর ছোটলোকদের ব্যবসায় ফারাক কতটুকু পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী কী ব্রেখটের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই কথা বলতে পেরেছেন এমন প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

১৯৭২ : ব্রেখ্‌টের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী নাটক আর্টুরো উই

ব্রেখট ১৯৪১ হিটলারের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে নাটক লিখলেন *'দ্য রেজিস্টেবল রাইজ*

অব আর্টুরো উই'। নীহার ভট্টাচার্য মূলের প্রতি অনুগত থেকে অনুবাদ করলেন এ নাটক এবং শেখর চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের লক্ষ্যে থিয়েটার ইউনিটের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ করলেন *'আর্টুরো উই'* ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২। মূলের প্রতি একান্ত আনুগত্যের জন্যই 'আর্টুরো উই' প্রযোজনায় স্বাচ্ছন্দ্য কিছু কম ছিল তবে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে ব্রেখটের নাটক এই প্রথম করা। বাংলা প্রযোজনায় সঠিক ব্রেখ্‌ট বা বেঠিক ব্রেখট তর্কে শেখর চট্টোপাধ্যায় সঠিক ব্রেখটে পুরো নম্বর পেয়ে যান। *'আর্টুরো উই'* মফস্বলে অভিনয় করেছেন বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার। পরিচালক ও মূল চরিত্রের অভিনয়ে প্রদীপ ভট্টাচার্য ছিলেন। *'আর্টুরো উই'* বাংলাদেশেও অভিনীত হয়েছে *'ধূর্ত উই'* নামে। ঢাকা থিয়েটারের এটি ছিল ১৮তম প্রযোজনা। বাংলা রূপান্তর করেন তাহমিনা আহমেদ। নির্দেশনায় ছিলেন জার্মান পরিচালক ক্লস ক্যাসেনব্যর্গ। উই চরিত্রে অভিনয় করেন হুমায়ুন ফরিদি। ১৯৮৯-র ৩০ নভেম্বর প্রথম অভিনীত হয়।

১৯৭৪ : ব্রেখ্‌টের একটি ছোট নাটক

ব্রেখ্‌টের একটি ছোট নাটক *'দি বেগার অর দি ডেড ডগ'* অশোক মুখোপাধ্যায় বঙ্গীকরণ করলেন *'ভিক্ষুক অথবা মৃত কুকুর'*। *'অভিনয়'* পত্রিকায় বের হয়। শৌভিক এই বছরই এটি মঞ্চস্থ করে। উদয়ন ঘোষ আসানসোলের সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় বসে-এ নাটকের একটি রূপ দিলেন *'সম্রাট ভূত দেখছে. ভূত'* খড়গপুরের উদয় সংঘ এটি মঞ্চস্থ করে। ব্রেখটেব ছোট নাটকের মধ্যে এই নাটকটির আরও ৩টি রূপান্তর করা হয়। পরিমল মুখোপাধ্যায় নাম দেন *'একটি ভিক্ষুক অথবা একটি মৃত কুকুর'*। শোভন মিত্রের রূপান্তরিত নাটকের নাম *'কুকুর ও ভিখারী'*। অমল রায় নাম দিলেন *'সম্রাটের চেয়েও বড়'*। বাংলার জেলা শহরে ব্রেখট খুব কম হয়েছে, এ নাটকটি তার ব্যতিক্রম।

১৯৭৫ : ব্রেখ্‌টের মজার নাটক হের পুনটিলা

নীহার ভট্টাচার্য ১৯৭২-এ *'আর্টুরো উই'* অনুবাদ করেছিলেন, এবার এই ১৯৭৫ সালে বাংলা রূপান্তর করলেন ব্রেখটের মজাদার সহজপাচ্য *'হার পুনটিলা এন্ড নেখট মাত্তি'* অবলম্বনে *'পন্তুলাহা'*। শেখর চট্টোপাধ্যায় অভিনীত নির্দেশিত *'পন্তুলাহা'* থিয়েটার ইউনিটের জনপ্রিয় প্রযোজনা হয়ে উঠল। *'তিন পয়সার পালা'*-র মতোই *'পন্তুলাহা'* জমে গেল হালকা উপভোগ্য নাটক বলে।

এই নাটকটি বাংলাদেশেরও জনপ্রিয় প্রযোজনা। নাগরিক, ঢাকার প্রযোজনা। আসাদুজ্জামান নূরের রূপান্তর ও নির্দেশনায় হের পুনটিলার নাম হল *'দেওয়ান গাজির কিস্যা'*। ১৯৭৭ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হওয়ার পর থেকে ৯০-৯১ সাল পর্যন্ত ১৮৫ বার প্রদর্শন হয়েছে, আর এই ১৯৯৯-এ নিশ্চয়ই ২০০ রজনী অতিক্রম করে গেছে। এই

'দেওয়ান গাজির কিসসা'-ই কলকাতায় সমবেত প্রয়াসের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় কয়েকটি অভিনয় হয়েছিল বিজন থিয়েটারে।

১৯৭৫ : কলকাতা ও ব্রেখ্‌ট

১৯৭৫ সালে পশ্চিমবাংলায় ব্রেখটের আরও দুটি নাটক বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। কলকাতা ব্রেখ্‌টের নাটকের বিষয় হয়েছে এটা জেনে স্বভাবতই আমাদের যে পরিমাণ উৎসাহিত হওয়ার কথা ছিল, কার্যত তা হয়নি, *'কলকাতা ৪ঠা মে'* নামে অশোক সেন ফয়েস্টভাঙ্গার ও ব্রেখটের যুগ্ম উদ্যোগে রচিত *'ক্যালকাটা ফোর্থ মে'* নাটকের বঙ্গানুবাদ করে অভিনয় করেন ১৯৭৫ সালে সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠীর উদ্যোগে। এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ দুষ্প্রাপ্য ছিল বলেই অশোক সেনের অনুবাদ সত্ত্বেও অধিকাংশ নাট্যকর্মী এই নাটকের কোনো খোঁজ পাননি। ১৯৯৪ সালে এই নাটকটি মূল জার্মান থেকে দেবব্রত চক্রবর্তী অনুবাদ করেন এবং থিয়েটার আর্টস ওয়ার্কশপ অমিতাভ রায়ের উদ্যোগে উজ্জ্বল সেনগুপ্তের নির্দেশনায় অভিনয় করেন। ঐ বছরই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। লর্ড হেস্টিংসের আমলে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ঘটনা নিয়েই ফয়েস্টভাঙ্গার প্রথমে এ নাটকটি লেখেন, তারপর ব্রেখট তাকে ঘষেমেজে একটা ঐতিহাসিক নাটকের চেহারা দেন। এ নাটক ব্রেখটের এপিক থিয়েটারের আঙ্গিক আবিষ্কারের আগেই রচিত। নাটকটির দেবব্রত চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ বেশ সাবলীল। তা সত্ত্বেও এ নাটকের অভিনয় এত কম হওয়ার কারণ, নয়ের দশকে পৌঁছে বাংলার থিয়েটারে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা যেন কমে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্ন চেহারা উদঘাটনের নাটক হিসেবেও *'কলকাতা ৪ মে'* একটি উল্লেখ্য প্রযোজনা হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। গ্রুপ থিয়েটার না করলেও গণনাট্য সংঘের কোনো সমর্থ শাখা তো মঞ্চস্থ করতে পারত এই ব্রেখট জন্ম শতবর্ষ পালনের কালে। কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখাও তো মঞ্চস্থ করতে পারতেন এ নাটকটি, বিভাস চক্রবর্তী বা গৌতম হালদার বা সুমন মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রিত নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে।

১৯৭৫ : ব্রেখ্‌টের ইন দি জাঙ্গল অব সিটিজ

ব্রেখটের আদিপর্বের আর একটি নাটক এই বছরে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হয়। ইন্দ্র মুখোপাধ্যায় রূপান্তরিত এই নাটকের নাম ছিল *'এই অরণ্য'*। প্রযোজনা করেছিল আর্টিজান। কয়টি প্রদর্শন হয়েছে জানা নেই।

১৯৭৫ : ব্রেখ্‌টের সেনোরা কারারের রাইফেল

থিয়েটারে রাজনীতির প্রশ্নে উচ্চকিত দল ছিল থিয়েটার লাইবর। ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্যের পরিচালনা শান্তিশেখর সিংহ অনূদিত *'সেনোরা কারারের রাইফেল'* একাঙ্কটি

মঞ্চস্থ হয় এই সন্ত্রাস কবলিত দুঃসময়ে। নাটকটি এই বছরেই প্রকাশিত হয় *'ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর'* পত্রিকায়। এই একাঙ্কটি পরবর্তীকালে আরও তিন জন রূপান্তর করেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেন *'সেনোরা কারারের রাইফেল'* নামে *'এপিক থিয়েটার'*-এ। আর একটি অনুবাদ বা রূপান্তর করেন বিপ্লব চক্রবর্তী। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় রূপ দেন *'যুদ্ধের আগুনে'* নামে, শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র, দক্ষিণেশ্বর-এর অভিনয় করেছে ১৯৭৭ সালে। অসিত চন্দ *'রাইফেল'* নামে এর বাংলা করেন ১৯৭৮ সালে। এই নাটকটি যে পরিমাণে অনুবাদ বা রূপান্তর হয়েছে, সে পরিমাণে অভিনয় হয়েছে খুবই কম। শাব্দিক, দত্তপুকুরের একটি ছোট দল *'সেনোরা কারারের রাইফেল'* মঞ্চস্থ করেছিল ১৯৯০ সালে। আর এই ব্রেখট জন্ম শতবর্ষে বিজ্ঞাপিত হয়েছে কৃষ্টি সংসদ, সোনারপুরের ব্রেখ্ট শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে *'সেনোরা কারারের রাইফেল'* অভিনীত হবে সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তের নির্দেশনায়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি মফস্বলের প্রতিযোগিতা মঞ্চে ব্রেখট হাজির হয়েছেন খুবই কম।

১৯৭৬-৭৭ : রাজনৈতিক অস্থিরতা, পালাবদল

১৯৭৬ ভারতব্যাপী জরুরি অবস্থার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্রেখটের যে সব নাটকের বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে, সেগুলির ইতস্তত অভিনয় ছাড়া নতুন কোনো উদ্যম দেখা যায়নি অনুবাদ বা রূপান্তরের। ১৯৭৭ ভারত সহ পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল। বামপন্থী শাসন প্রবর্তিত হয় এই বাংলায়।-ব্রেখটের কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বেশ কিছু নাটক এই '৭৭ বা তার পরবর্তী সময়ে নতুন উৎসাহে মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে *'ডি মুটার'*, *'ককেশিয়ান চক সার্কল'*, *'ডি মাসনামে'*, *'দ্য রুল এন্ড দ্য একসেপশন'*, *'গ্যালিলিও'* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব নাটকের প্রযোজনার কথা প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হয়েছে।

জনগণের তীব্র প্রতিরোধে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। এবার দেখা গেল স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধী বেশ কয়েকটি নাটকের নতুন অনুবাদ হল এবং মঞ্চস্থ হয়ে প্রচুর সাড়া ফেলল শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা দেশজুড়ে। থিয়েটার ওয়ার্কশপের *'শোয়াইক গেল যুদ্ধে'* (১৯৮২) তার বড় দৃষ্টান্ত। বিভাসের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় শোয়াইক-চরিত্রে।

১৯৭৭ : স্বৈরতন্ত্রের কালো থাবার অভিজ্ঞতা স্মরণে

১৯৭৭-এর চেতনা মঞ্চস্থ করে ফ্যাসিবাদবিরোধী একাঙ্ক *'উল্কি'*। ব্রেখ্টের নাৎসিবাদ বিরোধী প্রতিবাদী একাঙ্ক *'দাস ক্রাইডেক্রয়েৎস'*-এর অনুবাদ করলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। শিবশঙ্কর ঘোষের নির্দেশনায় *'উল্কি'*-র ৭৭টা প্রদর্শন হয় '৭৭ থেকে '৮২-র মধ্যে। *'খড়ির চিকে'* নামে এই নাটকটি খড়দহের রক্তকরবী সংস্থা কনক রায়ের নির্দেশনায় অভিনয় করতেন।

ব্রেখটের *'জিউস ওয়াইফ'* এই সময়ে একাধিক অনুবাদ বা রূপান্তরে বাংলায় অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে পবিত্র সরকার *'ইহুদী স্ত্রী'* নামে অনুবাদ করেছেন, বেরিয়েছিল *'এপিক থিয়েটার'* পত্রিকায়। তরুণ ঘটক যে অনুবাদ করলেন তা দিলীপ দত্তের পরিচালনায় দৃশ্যকাব্য সংস্থা অভিনয় করে। রঞ্জন ঘোষও এই নাটকের একটি অনুবাদ করেন।

উৎপল দত্ত ব্রেখটকে বাংলায় যাত্রামঞ্চে নিয়ে গেলেন এই সময়ে। *'ডি টাগে ডিআর কমুনে'*-র কাঠামোয় *'মুক্তিদীক্ষা'* যাত্রাপালা রচনা করে লোকনাট্য দলকে দিয়ে অভিনয় করান। সারা দেশ জুড়ে আবেগ প্রকম্পিত হয় *'মুক্তিদীক্ষা'*-য়। এইটাই পরে পিএলটি আয়োজিত ব্রেখ্‌ট নাট্য উৎসবে *'কমিউনের দিনগুলি'* নামে একবার অভিনয় করান ১৯৮১-তে।

১৯৭৮ : অনূদিত হল ব্রেখটের ব্রেডশপ ও মেহগনি

শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অরণি বন্দ্যোপাধ্যায় রূপান্তরিত *'রুটি রুজি'* অভিনীত হল থিয়েটার ইউনিটের উদ্যোগে।

বাংলাদেশে নাগরিক, ঢাকা তাঁদের তৃতীয় ব্রেখ্‌ট প্রযোজনা নির্বাচন করলেন *'স্টাড মাহগনি'* অবলম্বনে আসাদুজ্জামানের রূপান্তরিত *'মোহনগরী'*। এর নির্দেশনাতেও আসাদুজ্জামান নূরই ছিলেন। এটিও নাগরিকের উল্লেখ প্রযোজনা। আমাদের পশ্চিমবাংলায় *'মোহনগরী'* সবে এই ১৯৯৮-এ অনূদিত হল। *'নাট্যচিন্তা'*-র ব্রেখট জন্ম শতবর্ষ সংখ্যায় উৎপল ঝা এই অনুবাদ করেছেন *'সিটি অব মহাগনি'*। এখনও অভিনয় হয়নি।

১৯৭৯ : বাংলা মঞ্চে আবার সেন্ট জোয়ান

নাটক নির্বাচনের পেছনে প্রায়শ কোনো সমকালীন ঘটনা বা প্রবণতার প্রেরণা থাকে। ভারতে তখন জনতা সরকারের আমল। ভারতের সদ্য প্রাক্তন নেত্রী ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের তখন বিচার চলছে। জনতা সরকারও নানান দল মতের আর এক বুর্জোয়া স্বার্থের রক্ষক সরকার, বামপন্থীরা তাদের সমর্থন করেছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসন অবসানের জন্য, এখন দেখছে এই মিলিঝুলি স্বার্থের সরকার জনগণের কোনো উপকারই করতে পারছে না। এমতাবস্থায় বামপন্থী পশ্চিমবাংলায় দেখা গেল অনল গুপ্তের অনুবাদ ও নির্দেশনায় ব্রেখটের *'সেন্ট জোয়ানের বিচার'* মঞ্চস্থ হতে। ১৯৭৯-র ২৭শে ফেব্রুয়ারি শিশির মঞ্চে এই অনূদিত নাটক প্রথম অভিনীত হয় ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার কর্তৃক। শ্রীমতী গান্ধির বিচারের সঙ্গে সেন্ট জোয়ানের বিচারের যোগাযোগ নিতান্তই কাকতালীয়। তা সত্ত্বেও ভারতবাসী ১৯৮০-র নির্বাচনে সদ্য পরিত্যক্ত শ্রীমতী গান্ধিকেই বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনল। যাই হোক, এই

কাকতালীয় যোগাযোগ বাদ দিলে *'সেন্ট জোয়ানের বিচার'* খুবই বড় মাপের দৃষ্টিনন্দন প্রযোজনা হয়েছিল মূলত পরিচালক আর অভিনেতৃবর্গের কৃতিত্বে।

১৯৮০-৮২ : ব্রেখ্‌টের একাধিক প্রযোজনা :

সঙ্গে নতুন প্রযোজনা

পূর্বোল্লিখিত বহু নাটকই এই সময়ে প্রযোজিত ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। পাশাপাশি এল শোয়াইক, এক নতুন অভিজ্ঞতা।

১৯৮২-র সাড়া জাগানো প্রযোজনা হল থিয়েটার ওয়ার্কশপের *'শোয়াইক গেল যুদ্ধে'*। এক অসাধারণ মাপের ক্ষুরধার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তির ঝলকানিতে শোয়াইক-রূপী বিভাস চক্রবর্তী ও বুলিঙ্গার-রূপী অশোক মুখোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখে বাঙালি বা ভারতবাসী স্মরণ করল তাদের সদ্য অতিক্রান্ত স্বৈরতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। অনুবাদ ছিল অশোক মুখোপাধ্যায়ের। পরিচালনা বিভাসের। বিভাসের জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনয় এই শোয়াইক।

জয় বসু *'শোয়াইকের ভারত দর্শন'* বলে যে নাটকটি করেছিলেন সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ১৯৮৭-তে, তার সঙ্গে মূল শোয়াইকের সম্পর্ক কতখানি জানা নেই।

১৯৮৩ : ব্রেখ্‌টের ট্রায়াল অব লুকুল্লুস

১৯৮৩-তে কবি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেন ব্রেখটের *'ট্রায়াল অব লুকুল্লুস'* *'লুকুল্লুসের বিচার'* নামে এবং *'নান্দীমুখ'* পত্রিকায় ছাপা হয়। চেনা-অচেনা এ নাটকটির অভিনয় করে সমর দত্তের নির্দেশনায়। অসিত সরকারও *'লুকুল্লুসের বিচার'* নামে আর একটি অনুবাদ করেন। জন্মশতবর্ষে চন্দন সেন রূপ দেন *'ভীষ্মলোচনের কল্পবিচার'* নামে। *'ভীষ্মলোচনের কল্পবিচার'* বরাহনগরের লোকায়ত অভিনয় করে ব্রেখট জন্মশতবর্ষে। এই রূপান্তরিত নিয়ে এই ১৯৯৯ সালেই খড়দহের থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম *'তুমি কী করেছ'* নামে অসাধারণ শিল্পসম্মত পথনাটক মঞ্চস্থ করে বিপুল সাড়া জাগায়।

১৯৮৫-৯০ : ব্রেখ্‌টের আদিপর্বের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়

কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন জার্মান নাটক ও থিয়েটার বিষয়ে এ রাজ্যের সব নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের আকৃষ্ট করাব চেষ্টা করে আসছে সত্তর দশক থেকে। অনেক বামপন্থী পরিচালকরা ওদের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিতেন, যেমন শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত নন্দী; আবার অনেকে ওদের অচ্ছুৎ জ্ঞান করতেন, যেমন উৎপল দত্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী। ম্যাক্সমুলার ভবন খুবই গণতান্ত্রিক ভঙ্গিতে ব্রেখট চর্চায় সাহায্য করতেন। সঙ্গে কমিউনিজম বিরোধী আর কমিউনিজমপন্থী দুই পাল্লাতেই ওদের ভূমিকা ছিল অনায়াস। ১৯৮০ নাগাদ হাইমের পরিচালনায়

আন্তিগোনে নিয়ে ঝামেলায় ম্যাক্সমুলার এ রাজ্যের নাট্যকর্মীদের নিয়ে কিঞ্চিৎ বিপন্ন বোধ করে। পরে অবশ্য সামলে নেয়।

এই পর্বে ম্যাক্সমুলার ভবনের সক্রিয় সহযোগিতায় একজন বড়মাপের পরিচালক একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করেন। তিনি তরুণ পরিচালক অঞ্জন দত্ত, ভালো অভিনেতা এবং গায়কও। অঞ্জন দত্ত ব্রেখ্‌টের আদি-পর্বের অ-অনূদিত ব্রেখ্‌ট নিয়ে পড়লেন।

১৯৮৫-তে অঞ্জন দত্তর ওপেন থিয়েটার ব্রেখটের তিনটি আদিপর্বের ব্রেখট অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেন। প্রথমে নামান ব্রেখ্‌টের ১৯১৫-য় রচিত *'বাল'*-এর বাংলা রূপ। তারপরে *'ড্রামস ইন দ্য নাইট'*-এর বাংলা *'ফেরা'* ১৯৮৫-র ৪ঠা অক্টোবর। আর *'পাতি প্রেমের গল্প'* ১৯৮৫-র ৮ই নভেম্বর। এই দিনই মঞ্চস্থ হয় *'ম্যান ইজ ম্যান'*-এর বাংলা রূপান্তর *'মানুষ = মানুষ'*। কোনো নাটকেরই বেশি অভিনয় হয়নি, তবে মিডিয়ার প্রচার ছিল ভালোই। অঞ্জন দও এরপর নামান *'সমাধান'* কমিউনিস্ট নির্মমতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে। অঞ্জনের কাজে শিল্পনির্মাণের যত্ন আছে, যার জন্য ব্রেখট প্রযোজনায় অঞ্জন দত্ত অন্যতম সফল নির্দেশক। অঞ্জন দত্ত বর্তমানে জীবনমুখী গানের গায়ক হিসেবে এত ব্যস্ত যে নাটক করা কমে এসেছে; তবে চলচ্চিত্রে অঞ্জন একজন গুণী অভিনেতা।

১৯৯২ : ব্রেখ্‌ট প্রযোজনায় নতুন পরিচালকের অবদান

দীর্ঘ দুই দশক পশ্চিমবাংলা পরম শান্তিতে বামপন্থী সরকারের শাসনামলে থেকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। নাট্যশিল্পী ও পরিচালকদের মধ্যে অনেক সমর্থ প্রতিভা প্রয়াত হয়েছেন। গণনাট্য সংঘের রাজনৈতিক নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রায় সেই অভাব অনুভূত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ব্রেখট চর্চায় ঘাটতি এসেছে, যেমন রাজনৈতিক থিয়েটারও সামগ্রিক সংকটাপন্ন। হতাশা যখন গ্রাস করতে চাইছে তখন ব্রেখটের আর একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস উজ্জ্বল প্রযোজনা মঞ্চস্থ করল সায়ক ১৯৯২ সালে।

অশোক মুখোপাধ্যায় অনূদিত ব্রেখ্‌টের *'ভিসনস্ অব সিমোন মাশা'*-র বাংলা *'যদিও স্বপ্ন'* সায়কের মেঘনাদ ভট্টাচার্যের যত্নে একটি উদ্দীপক দর্শন হয়ে উঠেছিল। সিমোন মাশার ভূমিকায় মৌসুমী সাহার নিষ্ঠাও কম ছিল না। পরিচালক হিসেবে মেঘনাদও যোগ্যতা প্রমাণ করেছিল।

১৯৯২ সালে চেতনার নবীন পরিচালকরূপে সুমন মুখোপাধ্যায় ব্রেখটের *'কোরিওলেনাস'* প্রযোজনায় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অক্টোবরের ৩ তারিখে সুমন মুখোপাধ্যায় রূপান্তরিত ও নির্দেশিত *'কোরিওলেনাস'* প্রথম অভিনয়ের পর ৯টি প্রদর্শন হয়েছে। কোরিওলেনাসের ভূমিকায় সুপ্রিয় দত্ত নিজস্ব ক্ষমতার পরিচয়ের দীপ্ত হয় উঠেছিলেন।

বাংলাদেশে *'কোরিওলেনাস'* প্রথম অনুবাদ করেন মান্নান হীরা ১৯৯১-তে। আরণ্যক,

ঢাকা-র ১৯তম প্রযোজনা। নির্দেশনায় ছিলেন ওপার বাংলার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক মামুনুর রশীদ। খুবই উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, বিষয়ে ও আঙ্গিকে।

১৯৯৮ : জন্মশতবর্ষে ব্রেখ্‌ট প্রযোজনা

এবার ১৯৯৮ সালে অনসম্বলের সোহাগ সেন ব্রেখটের *'সেভেন ডেডলি সিনস'* অবলম্বনে *'পাপ'* মঞ্চস্থ করে ব্রেখট প্রযোজনায় তাঁর পরিচালন দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। সমীর দাশগুপ্ত ব্রেখটের মিউজিক্যাল ব্যালে স্ক্রিপ্টটি অনুবাদ করেছিলেন অনেক আগেই, প্রমা থেকে বেরিয়েছিল *'পাপসপ্তক'* নামে। সেই ক্ষুদ্র নাট্যবস্তুকে বিবর্ধিত করেছেন সোহাগ সেন। সোহাগ সেন অবশ্য অনেক আগেই আশির দশকে *'গুপ্তচর'* ও *'ইহুদি স্ত্রী'* প্রযোজনা করেন। ১৯৮৪-র মে মাসে *'গুপ্তচর'* অভিনীত হয়। ব্রেখট প্রযোজনায় তাঁর পূর্ণ সামর্থ্য প্রমাণিত হল এই নব্বইয়ের দশকে।

ঊষা গাঙ্গুলিও পশ্চিমবাংলার সমর্থ পরিচালিকা। ইতিপূর্বে রায়না নির্দেশিত ব্রেখ্‌টের *'মা'*-তে মা-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন; এবার ব্রেখ্‌টের *'মাদার কারেজ'* হিন্দিতে নামালেন *'হিম্মতমাই'* নামে। নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন জবরদস্ত।

অযান্ত্রিক ব্রেখটের *'থ্রি পেনি অপেরা'* অবলম্বনে অরুণ তপাদারের রূপান্তরিত *'শিবরাজ চরিত'* অভিনয় করে ফেব্রুয়ারি '৯৮-তে। ৯৯-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে ২৫টির বেশি প্রদর্শন হয়েছে।

ব্রেখট জন্ম শতবর্ষে নান্দীকার *'ব্রেখ্‌টের খোঁজে'* নামে এক আলেখ্য রচনা করেছে; মঞ্চে এবং দূরদর্শনে তা দেখানোও হয়েছে।

১৯৯৯-র জানুয়ারির ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্রেখট জন্ম শতবর্ষ পালন করল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। তাতে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজিত ব্রেখটের নাটক সম্পূর্ণত বা আংশিকভাবে অভিনীত হয়েছে।

জন্মশতবর্ষে ব্রেখট নতুন করে কিছু কিছু রূপান্তরিত হচ্ছেন। তার মধ্যে চন্দন সেন *'ইনফরমার'*-এর নতুন রূপ দিয়েছেন *'গুপ্তচর'* নামেই, চাকদহের হযবরল প্রথম মঞ্চস্থ করেছে অক্টোবর '৯৮ তে রানাঘাটে। *'ট্রায়াল অব লুকুলুস'* অবলম্বন চন্দন সেন লিখেছেন *'ভীষ্মলোচনের কল্পবিচার'*। কিংশুক মিশ্রের নির্দেশনায় বরাহনগরের লোকায়ত এটি অভিনয় করেছে ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৯। বর্ধমানের জামুড়িয়ার চেনামুখ গোষ্ঠী পিন্টু কবির নির্দেশনায় উৎপল দত্ত অনূদিত *'সমাধান'* মঞ্চস্থ করছেন। শিলিগুড়ির সৃজন সেনাও এই *'সমাধান'* মঞ্চস্থ করছেন।

আশা করা যায় বাংলায় ব্রেখ্‌ট চর্চার এই সামগ্রিক রূপরেখার থেকে আগামী প্রজন্ম ব্রেখট প্রযোজনার তাৎপর্য অন্তরে গ্রহণ করবে এবং নতুনভাবে ব্রেখ্‌ট প্রযোজনায় এগিয়ে যাবে-কারণ পৃথিবীটাকে এখনও সকলের বাসোপযোগী করার মতো পরিবর্তন সাধনের কাজ যে অনেক বাকি।

পাদটীকা :

১। *ব্রেষ্‌ট-এর নাটিকা,* ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, প্রকাশক : ইন্দো জি ডি আর মৈত্রী সমিতি।

২। *কলকাতা ৪ মে,* লিয়ন ফয়েস্টভাঙ্গার ও বের্টোল্ট ব্রেষ্‌ট, মূল জার্মান থেকে অনুবাদ : দেবব্রত চক্রবর্তী। প্রকাশক : এ পি, ৪৭ টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা ২৬, প্রকাশকাল : বইমেলা, ১৯৯৪।

৩। *বাংলায় ব্রেশ্‌ট চর্চা,* সরোজমোহন মিত্র, *গ্রুপ থিয়েটার,* ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, শারদীয়, অগাস্ট অক্টোবর '৮৬।

৪। দ্রষ্টব্য বিষ্ণু বসুর ভূমিকা *'বাংলায় প্রযোজিত ব্রেশটের প্রথম নাটক', নাট্যচিন্তা,* ইউগেন বের্টোল্ট ব্রেশট জন্মশতবর্ষ সংখ্যা : ১৯৯৮।

[*দুই বাংলার থিয়েটার,* বগুড়া, বাংলাদেশ, ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৯]

আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও বাংলাদেশের নাট্যচর্চা

একদা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো ছিলই এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলার। সে সম্পর্ক একই জলবায়ু ভৌগোলিক অখণ্ডতায় স্বদেশবাসীর সম্পর্ক। একই আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় সাংস্কৃতিক অভিন্নতার সম্পর্ক। তখন থেকে ক্রম-বিকশিত অভিজ্ঞতায় আঞ্চলিকতা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধে আমরা তো একই ছিলাম।

তারপর কুরাষ্ট্রের মূঢ় শাসননীতির আবর্তে অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকেই ধর্মীয় ব্যবধান বড় হতে হতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আমরা আলাদা হলাম। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব মনে রেখেও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ভারতবর্ষকে টুকরো হতে হল। জন্ম নিল বঙ্গদেশকে দু'টুকরো করে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ। অজস্র রক্তপাত আর উদ্বাস্তু বিনিময়েও দুই বাংলার আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন করতে পারেনি কুরাষ্ট্রের এই রাজনৈতিক বিভাজন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গের নিরন্তর গণআন্দোলন আমাদেরকে শিক্ষিত করল যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে—আঞ্চলিকতার সার্বিক বিকাশ ঘটিয়েই জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক বোধের সম্প্রসারণে—পশ্চিমবঙ্গের লড়াই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের অখণ্ড সত্তার জন্য, জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিটি ভাষা ধর্ম জাতি উপজাতির সম্যক বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশ্লিষ্ট পূর্ববঙ্গ যে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য পূর্ব পাকিস্তান হল, সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি তার পূরণ হল না পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারিতার জন্য। ধর্মীয় চেতনার ঐক্য, যা প্রকারান্তরে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা তা যে একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীকেও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় রেখে শোষণ করে, পূর্ব পাকিস্তানও তার দৃষ্টান্ত। ফলে পূর্ব পাকিস্তান যে পূর্ববঙ্গ, বাংলাভাষার ঘনীভূত আবেগের ঐক্য বাংলাদেশ, তারা যে বাঙালি, এই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাহান্ন-র একুশে আন্দোলনের অনিবার্যতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একদিন জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে।

আজকের বাংলাদেশ বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চেতনার এক মূর্ত বলয়। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা তাদের দিয়েছিল

ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি। পরবর্তীতে উপর্যুপরি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে প্রায় ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হতে দেখেও আমাদের এ রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বলতে পারি—ধর্মীয় বাতাবরণ তাদের কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের গ্যারান্টি হলেও বাংলাদেশের সংস্কৃতিবান মানুষের মন ও মননে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তিলমাত্র নেই, থাকলে সেটা রয়েছে ধর্মান্ধ স্বার্থপর কূট জনমানুষের একাংশের মধ্যে। তার কারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ক্রমবিকশিত সাংস্কৃতিক চেতনা। ধর্মীয় রীতিনীতির বর্মটা যে রাজনৈতিক স্বার্থ ও অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার এ অভিজ্ঞতা আমাদের দুই বাংলার। দুই বাংলা যখন এক ছিলাম তখনকার। এক বাংলা যখন দুই হলাম সেই এখনকার।

পৃথক পটভূমিতে পৃথক লড়াই। বাংলাদেশটা, তার অন্তর্গত সংগ্রামী মানষের নিরন্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পকেট হয়ে থাকল বা গেল ; আর আমরা এতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বন্ধু থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অগ্রণী শিবিরে জোট নিরপেক্ষতার শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েও আজ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পকেট হতে চলেছি। তা বলে কি লড়াই থেমে গেছে ? না থামেনি।

আমাদের দুই বাংলার নাটক ও থিয়েটারের জগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে লড়াই জারি হ্যায। রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, ধর্মীয় মৌলবাদী উত্থান, আর্থিক শোষণ, সামাজিক বঞ্চনা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

২

স্বাধীনতার সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সংগ্রাম, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করার সংগ্রাম, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় ঐক্য রচনার সংগ্রাম—সব কয়টি সংগ্রামের ভরকেন্দ্র দুই বাংলার একই এতিহ্য সূত্রে—রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম।

এ বাংলার কলকাতার রবীন্দ্রসদন ও জেলাপ্রতি রবীন্দ্রভবন এবং নজরুল মঞ্চের মতো ও বাংলায় হয়তো এত মঞ্চ নেই, কিন্তু পথেঘাটে ও লোকরুচির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল। আঞ্চলিকতার প্রতি টানকে অক্ষুণ্ন রেখেও জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধে দুই বাংলা আজ সহমর্মী।

আজ বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ ও আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকলেও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষের একটা পৃথক সম্ভ্রম বোধ তৈরি হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র—তার গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠার প্রতি আমাদের আগ্রহ আত্মীয়তার আন্তরিকতায় মোড়া।

৩

এই সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা নিয়েই দুই বাংলার থিয়েটারের কতিপয় মানুষ ১৯৯১-র গোড়াতেই এক আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের আহ্বানে বাংলাদেশের ঢাকায় মিলিত হয়েছিলাম।

যে রাষ্ট্রসংঘের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় আজ থেকে ৪৩ বছর আগে আমরা রাজনৈতিক বিভাজনের শিকার হয়েছিলাম, আজ তারই এক অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর শাখা আই টি আই বাংলাদেশ সেন্টারের ডাকে আমরা যেন এক হলাম ; অন্তত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে। থিয়েটারের অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রীয় বিভাজনের পরেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রীতির সূত্রে দুই বাংলার নাট্যকর্মীরা প্রায়শ আমরা কাছাকাছি থাকি বা হই। ১৯৫৭-র সরকারি শুভেচ্ছা সফর উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বহুরূপী গিয়েছিল ঢাকার বুলবুল চারুকলা কেন্দ্রের সাহায্যার্থে *'ছেঁড়াতার'* ও *'রক্তকরবী'* অভিনয় করতে। সে উপলক্ষে ঢাকায় বসে শম্ভু মিত্র বলেছিলেন :

'আমরা নাটক করি পাশ্চাত্যের আদর্শে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে মঞ্চ সাজাই, পাশ্চাত্যের অনুকরণে গল্প বানাই বা অভিনয় করি। অথচ পুরো প্রাচ্য মহাদেশে শিল্প প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, যেটা মোটেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে নয়। ...আমরা শুধু বুঝতে চাই যে, আমাদের এই মহাদেশের শিল্পমানসে কোন বিশেষ শিল্পরীতি আছে, যাকে শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে আমাদের গভীর কথাগুলো একান্ত করে প্রকাশ করতে পারবো। কারণ পরের ধার করা ভাষায় ব্যবহারিক জীবনের মোটা কাজ হয়তো চালানো যায়, কিন্তু অন্তরের আবেগের যে বহু বর্ণ বৈচিত্র্য আছে, তাকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাই আমাদের এমন একটা থিয়েটার তৈরি করতে হবে যেটা বিদেশীদের চতুর্থ শ্রেণীর অনুকরণ নয়, একেবারে আমাদের নিজস্ব এবং বিশিষ্ট থিয়েটার। জাপানে সে রকম থিয়েটার আছে। চীনে আছে। আমাদেব এই দুটি দেশের ঐতিহ্যও আছে।

'যেমন বিলিতি ছবির এনাটমীর মাঝে বা দৃশ্য সংস্থানের আদর্শে আমরা প্রাচ্যের ছবি বিচার করি না, তেমনি আমাদের নাটকও বিলিতি নাট্যসাহিত্যের মাপ অনুযায়ী বিচার হবে না। বিচার হবে তার রসবস্তুর ওপরে, তার আত্মপ্রকাশের মাপে।

'তাই আমরা অনেক দিনই আশা করেছি যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের নাটক নিয়ে আসবো। কারণ দেশজ সংস্কৃতির মূল এই পূর্ব পাকিস্তানে গভীর ও বহুদিনজাত, এখানকার শিল্পীরা সেই ঐতিহ্য স্মরণ রেখে নতুন সংস্কৃতির রূপকার। এখানে মাটির গন্ধ জলের গন্ধ যেমন লোকগাথায় প্রকাশ পেয়েছে আজও তেমনি পাচ্ছে এবং আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেতে চাচ্ছে।

'আমরাও তাই আমাদের এই নাট্যবোধকে সেই দেশে যাচাই করে জানতে এসেছি যে আমরা ঠিক পথে কতোটা এগিয়েছি।'

এরপরে শ্রীমিত্র যা বলেছেন তা আমাদের উভয়দেশের থিয়েটারেরই অনুসন্ধান, উপলব্ধি ও অর্জনের বিষয়। শ্রীমিত্র বলছেন, '.....এ কাজ আমাদের সকলের, প্রাচ্যের থিয়েটারকে উপলব্ধি করার, তাকে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে রূপ দিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করবার'।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে, ঢাকা তখন পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলা ভাষা ও

বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের লড়াই শুরু হয়ে গেছে বহুরূপী গিয়ে ঢাকায় নাটক করার অন্তত পাঁচ বছর আগে। চট্টগ্রামের কুমার প্রীতীশ বলের লেখার[২] সাহায্যে বলা যায় 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটা জোয়ার এসেছিল। অনেক দিনের খরা ও অজন্মার পর কী শহর ও কী গ্রামাঞ্চল সর্বত্র নাচ, গানের ঢল নামে। তার সাথে এলো নাট্যাভিনয়, যা এতোদিন এখানকার মুসলমান সমাজের কাছে নিষিদ্ধ বলেই গণ্য ছিল।' পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় বাতাবরণ কাটিয়ে সেখানকার মানুষজন যখনই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ঐশ্লামিক শাসকগোষ্ঠীর দমন পীড়ন। শ্রীবলের লেখার সাহায্যেই বলা যায় '১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে একটা নীরব সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়ে গেল। এ বৎসর চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সর্বপ্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আর এ বৎসরেই জন্মলাভ করে 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'। এ সময় মহিলারাও (চট্টগ্রামে) এগিয়ে এলেন অভিনয় শিল্পে। 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' গণসঙ্গীতের পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ নাটকও পরিবেশন করে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব পালন করে। ৫৪ সালে ৯২ক ধারা জারি হলে রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি নাট্যকর্মীদের ওপরও নির্যাতন শুরু হয়।

১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' কলীম শরাফীর পরিচালনায় '*বিভাব*' নামে একটি নতুন আঙ্গিকের নাটক পরিবেশন করে। এ ছাড়া লেডি গ্রেগরি রচিত '*রাইজিং অব দি মুন*' অবলম্বনে সলিল চৌধুরী অনূদিত '*অরুণোদয়ের পথে*' মঞ্চস্থ করে এখানে রেলওয়ে শিল্পীসংঘ '*দুঃখীর ইমান*' নাটকটিও পরিবেশন করে। ১৯৫৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে চট্টগ্রামের জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে মুনীর চৌধুরী রচিত '*কবর*' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।'— এই সেই '*কবর*' যা বলা যায় পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী মানুষের প্রথম নিজস্ব কণ্ঠস্বর।

এই কণ্ঠস্বর জন্ম নেওয়ার নেপথ্যে এ বাংলার ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পরিচালিত গণসংস্কৃতির প্রেরণা ছিল প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবর্তনায়। সেই গণসঙ্গীত, সেই '*অরুণোদয়ের পথে*', সেই '*বিভাব*' এবং '*দুঃখীর ইমান*'-এর হাত ধরে ও বাংলায় জন্ম নিয়েছিল '*পার্কের কোণ থেকে*', '*কবর*' প্রভৃতি মৌলিক নাটক।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার নাটক। মামুনুর রশীদের '*বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*'[৩]-র সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে এ বাংলায় শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে বাংলার প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনকে বারবার ব্যাহত করার চেষ্টার অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও বাংলারও। মামুনুর লিখছেন, 'সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় একটা প্রবল আলোড়ন দেখা যায়। পাকিস্তানের শাসনামলে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি নাটকের সুস্থ বিকাশ নানাভাবে প্রতিহত করা হয়েছে।' মামুনুর স্পষ্ট ভাষায় লিখছেন 'কখনো ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা, কখনো পুলিশী

সেন্সর দিয়ে, কখনো আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নাট্যচর্চাকে নিয়মিত করতে দেয়া হয়নি।'

মামুনুরের মতন এই রকম স্পষ্টবক্তা শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বলেই ওপার বাংলার অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে এপার বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এত গভীর সহমর্মিতা।

৭১-এ যখন বাংলাদেশ জন্মলাভ করল, তখন রামেন্দু মজুমদারের ভাষায় 'স্বাধীনতা যে একটা জাতির সংস্কৃতিতে কি নতুন প্রাণবন্যা সৃষ্টি করতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ বাংলাদেশের নাটক। রাজনৈতিক অধিকারের সাথে সাথে অর্জিত হল সাংস্কৃতিক স্বাধিকার।'[৪] ও বাংলার এই নবলব্ধ স্বাধিকার অর্জনের পথে এ বাংলার অভিজ্ঞতাও তাঁদের কাজে লেগেছিল। তাঁর স্বীকৃতি শ্রীমজুমদারের লেখাতেই রয়েছে : 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের অনেক নাট্যকর্মীই কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার চর্চার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। সত্তরের দশকের কলকাতার কল্লোলিত নাট্যচর্চা তাঁদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।' এ বাংলার এক নাট্যকার নিখিলরঞ্জন দাস ১৯৮৩-তে যখন ও বাংলায় যান তখন নাট্যচর্চার এই পরিকাঠামোর একটা চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যথার্থই লেখেন :

'আলোয় ঝলমল করছে মহিলা সমিতি। ঢাকা শহরে নাট্যপ্রেমীদের মিলনায়তন। ভেতরের বন্দোবস্তে নয়, মেজাজে একে কলকাতার একাদেমি বলা-চলে। সামনে, এখানে-ওখানে, নানা দলের প্রযোজনার সুদৃশ্য বিজ্ঞাপন, বোর্ড স্ট্যান্ডে সাঁটা, নাটকের পত্রপত্রিকার স্টল, নাটকের খুচরো আলোচনা, কফি-কর্নার। বেশ জমজমাট। দর্শক চরিত্রও প্রায় কলকাতার একাদেমির দর্শকের মত।'

কিন্তু বাইরের এই সাদৃশ্য রচনার জন্য তো আর একটা স্বাধীন দেশের নাট্যচর্চা শুরু হয়নি ; তার ভেতরে একটা তাগিদ ছিল সে তাগিদের চরিত্র এ বাংলার নাট্যকার বন্ধুর চোখ এড়ায়নি। তিনি লিখছেন, '১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি করে যেখানে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে—সে হলো প্রগতিশীল নাটক।' 'স্বাধীনতা বাংলাদেশকে দিয়েছে নাটকের প্রতি অনুগত একগুচ্ছ ঋজু মেরুদণ্ডনির্ভর কর্মী, স্বাধীনতা দিয়েছে নিয়মিত নাটকাভিনয়'। স্বাধীনতা দিয়েছে গণমুখী নাটক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কালের এই গণমুখীন নাট্য আন্দোলনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা মেলে 'থিয়েটারে' প্রকাশিত কুমার প্রীতীশ বলের *'স্বাধীনতাপূর্ব চট্টগ্রামে নাট্যচর্চা'* নিবন্ধে :

'একাত্তরের ১৫ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে পরিবেশিত হয় অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমেদ এর নাটক 'এবারের সংগ্রাম' কয়েক লক্ষ দর্শকের সামনে। পরদিন থেকে 'এবারের সংগ্রাম' পথনাটক হিসেবে পরিবেশিত হতে লাগলো শহরের বিভিন্ন এলাকায়। এর মধ্যে আরো একটি নাটক 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' রচনা শুরু করেন মমতাজউদ্দীন আহমেদ, নাটকটি ২৪ মার্চ

মঞ্চায়ন করা হয় চট্টগ্রামের প্যারেড মাঠে। দর্শক ছিল প্রায় ৮০ হাজার। নাটক চলাকালীন সময়ে তাহের সোবহান নামে একজন খবর নিয়ে এলেন যে, বন্দরে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দিচ্ছে জনসাধারণ। তাই পাকিস্তানী সৈন্য গুলি চালাচ্ছে। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে এবং নাটক শেষে প্রায় দশ হাজার দর্শক স্বাধীনতা যুদ্ধেব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হযে স্বতস্ফূর্তঃ আবেগে মিছিল করে ছুটে যায় বন্দরে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেবাব জন্য।'

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাত নাট্যদলের মুখ্য ঘোষণাই ছিল 'অস্ত্র ছেড়ে মঞ্চে নেমেছি'।

*'নূরলদীনের সারাজীবনে'*র মুখ্য প্রয়োগশিল্পী আলি যাকেব-এর ভাষায় : 'বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা সূচনায় বলেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বন্দুক ছেড়ে নাটক ধরেছি। তার মানে এই যুদ্ধ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির যুদ্ধ। এই যুদ্ধ তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও মেরুদণ্ড সোজা রেখে, অবক্ষয়ী সমাজে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে লালিত সংস্কৃতি পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে।' ১৯৮৩-তে লেখা এই প্রবন্ধের মুখবন্ধের জায়গায় আলি লিখেছেন, '১৯৭৩-এ কেবল নাটক ভালোবাসার উত্তেজনাতেই নাটক শুরু হয়। এরপর সময় যত এগোতে থাকে সেই ভালোবাসা উপযুক্ততার কষ্টিপাথরে যাচাই করার সময় চলে আসে। এবং নাট্যকর্মীদের অনেক বেশি পরিশ্রমী হতে হয়।' আলি এ ক্ষেত্রে কলকাতার একদল থিয়েটারের জন্য থিয়েটার করার দৃষ্টিভঙ্গি বন্ধুদের মতো তাঁদের তদানীন্তন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন। আলিকে এ ক্ষেত্রে মনে হতে পারে তিনি বোধ হয় শিল্প-সর্বস্ববাদী। যদিচ এ অভিযোগ যে ও বাংলাব বেশ কিছু নাট্যকর্মীরা তোলেননি, তা নয়। এ সমস্যা এ বাংলার নাট্যজগতেও আছে।

বাংলাদেশের থিয়েটারের কর্মীরাও যে স্বাধীনতার যোদ্ধা, সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পকর্মী সে কথা খেয়ালে রেখেও আলি যাকের, থিয়েটার কর্মীরা যে থিয়েটাবের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদেই পরিশ্রমী হতে বাধ্য হয়েছে তার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করে লিখছেন :

'তাদের বুদ্ধিমত্তাকে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আরও সজাগ করে তুলতে হয। একাধিক নাট্যকর্মী বিদেশে বিভিন্ন নাট্য শিক্ষাকেন্দ্রে হাতেকলমে কাজ শিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তাদেব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটে ঢাকার মঞ্চে কি অভিনয়ে কি আলোক পরিকল্পনায়। বছব ছযেক আগে একটি নাটক কেবল একটি প্রতীকী দৃশ্যসজ্জার সীমাবদ্ধতায় চুটিযে অভিনয় হতো। আব আজ বেশির ভাগ নাটকে, নাটকের ফর্ম অথবা কনটেন্টের সাথে সাযুজ্য রেখে মঞ্চ তৈরি হয়। অভিনয়ের ছক বাঁধা হয় মঞ্চ এবং বিষয়বস্তুর বিশদ পর্যালোচনার পর।'

যে কোন একটি নাটকের কোন বিশেষ চরিত্রসৃষ্টিতে অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপও করানো হয় অনেক দলে। দলগত অভিনয়, এই সেদিন পর্যন্ত,— একচেটিয়া ভূষণ ছিলো হাতে গোনা যায় এ রকম দুই কি তিনটি দলের। আর আজ অনেক দলই বলিষ্ঠ টিমওয়ার্ক নিয়ে গর্ব করতে পারেন। অনেক নতুন গ্রুপে প্রচণ্ড শক্তিধর তরুণ অভিনেতার সন্নিবেশ ঘটেছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ঢাকা টেলিভিশনের আজকের সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কোন না কোন নাট্যদলের সাথে সংযুক্ত এবং নিয়মিত মঞ্চাভিনয় করে থাকেন।

স্বাধীনতা অর্জনের এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের থিয়েটারের প্রয়োগগত এই সাফল্য অর্জনই যদি মূল লক্ষ্য হত তাহলে বাংলাদেশের থিয়েটার বলে কি তার কোনো পৃথক নিজস্ব পরিচিতির জগৎ থাকত? ১৯৫৭-য় শম্ভু মিত্র ওপার বাংলায় গিয়ে যে কথা বলে এসেছিলেন সেই 'পাশ্চাত্যের অনুসরণে নয়। ....আমরা শুধু বুঝতে চাই যে, আমাদের এই মহাদেশের শিল্পমানসে কোন বিশেষ শিল্পরীতি আছে, যাকে শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে আমাদের গভীর কথাগুলো একান্ত করে প্রকাশ করতে পারবো।' শিল্প-মানসের সেই নিজস্ব শিল্পরীতির জগৎ আবিষ্কার করা এবং শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করে নিজস্ব গভীর কথাগুলো একান্ত করে বলতে পারার লক্ষ্যে বাংলাদেশে গত সাত ও আটের দশকে নিজস্ব নাট্যজগৎটি নির্মাণ করতে পেরেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। অন্তত এ বাংলার থেকে আলাদা, বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যজগৎ। বাংলাদেশের নাট্যজগতের নিজস্ব ভুবনটি তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলেই এ বাংলার চোখে তাঁরা আর অধমর্ণ নন, না এ বাংলার কাছে, না বিশ্বনাট্য জগতের কাছে। তার অর্থ এ নয় তাঁরা কেবলই আঞ্চলিক। বাংলাদেশের থিয়েটার আজ একই সঙ্গে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক।

বাংলাদেশ তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় নিজের সমস্যাকে যেমন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন, তেমনই বিশ্ব সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বিশ্লেষণ করেছেন বলেই গত দুই দশকে বাংলাদেশ মৌলিক নাট্যরচনায় একটা সম্মানীয় স্থান অর্জন করেছেন। আজ সেখানে মুনীর চৌধুরী, সাঈদ আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, আবদুল্লাহেল মাহমুদ, ডঃ রাজীব হুমায়ুন, মান্নান হীরা, রবিউল আলম, ডঃ ইনামুল হক, নাজমুল আহসান, বিপ্লব বালা প্রভৃতি সমর্থ নাট্যকারের সমাবেশ লক্ষ করার মতো।

এই সব নাট্যকারেরা যে সব মৌলিক নাট্যরচনা করেছেন তার প্রয়োগেও বাংলাদেশের নির্দেশকবৃন্দ আধুনিক বিশ্বমানের প্রয়োগদক্ষতা প্রদর্শনে সচেষ্ট রয়েছেন। এঁদের অনেকেই দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের পাশাপাশি নিজস্ব জলবায়ু মাটিতে লালিত যে লোকবৃত্তের নাট্যপ্রয়োগে রীতি বর্তমান, পুনরাবিষ্কার ও সংস্কার করে আধুনিক টোটাল থিয়েটারের ধারণায় নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন। আবদুল্লাহ্ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, আরিফুল হক, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, আলি যাকের, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর, তারিক আনাম খান, গোলাম সারোয়ার, লিয়াকত আলি লাকি, ম হামিদ প্রমুখ নির্দেশক আজ বাংলাদেশের প্রথম সারির সমর্থ প্রয়োগশিল্পী। এঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ আল মামুন, আরিফুল হকের কাজে বাস্তবতাবাদী অভিনয় রীতির প্রয়োগ দক্ষতা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনই স্টাইলাইজড রীতিতে কাব্যনাট্য প্রয়োগ বা রবীন্দ্রনাটক কিংবা ক্ল্যাসিক প্রয়োগের দক্ষতাও দুর্লক্ষ্য নয়। আলি যাকের স্টাইলাইজড রীতির প্রয়োগে কুশলী প্রয়োগশিল্পী, এঁর *'নূরলদীনের সারা জীবন'* এ বাংলার কাছে

কাব্যনাটক প্রয়োগের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। আরিফুল হকের *'ক্ষতবিক্ষত'* প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধের এক মূল্যবান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মামুনুর রশীদ এপিক রীতির অভিনয় প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের তরুণ প্রয়োগশিল্পী আসাদুজ্জামান নূরও এপিক রীতিতে ব্রেখ্‌ট প্রযোজনায় খ্যাত। তরুণ প্রয়োগশিল্পীদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ প্রভূত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর একাধিক মহাকাব্যিক নাট্যপ্রয়োগে। জাতীয় অভিনয় বৈশিষ্ট্যের অন্বেষণে এঁর রোমান্টিকতার সঙ্গে সেলিম আর দীনের বর্ণনাধর্মী ব্যালাড রীতির নাট্যরচনা কৌশলের চমৎকার সমন্বয় এ বাংলাকেও উদ্দীপিত করে—*'কিত্তনখোলা'*, *'কেরামত মঙ্গল'* এবং সাম্প্রতিক প্রযোজনা *'হাতহদাই'*-এর ত্রিলজি রচনায় এরা আজ কীর্তিমান।এর মধ্যে *'হাতহদাই'* এক অসাধারণ আধুনিক নাট্যপ্রয়োগ—কী বিষয় ও বক্তব্যের প্রগতিশীলতায়, কী প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের অনুপুঙ্খ বাস্তবতা সমগ্রতার রোমান্টিকতায়।

জাতীয় নাট্যবৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ও পুনরাবিষ্কার করার যে ভাবনা নাট্যাচার্য শ্রীমিত্রকে একদা উদ্দীপিত করেছিল, যা নিয়ে এ বাংলায় গত দশকে যথেষ্ট তর্ক উঠেছিল, এবং এখনও তার নিষ্পত্তি হয়নি, বরং বলা যায় লোকনাট্য চর্চার আধিক্যে ভারতীয় থিয়েটারে এক বিপদ দেখা দিয়েছে, যার ঢেউ পশ্চিমবাংলাতেও এসে পৌঁছেছে ; সেই জাতীয় নাট্যরীতি খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বোধ হয় কাঙ্ক্ষিত স্থানে সমীপস্থ।

মুনীর চৌধুরীর *'কবর'* (১৯৫৫) থেকে আবদুল্লাহ্ আল মামুনের *'সুবচন নির্বাসনে'* (১৯৭৪) প্রায় দুই দশকের প্রাগুনী ও অধমর্ণ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ নিজের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে মৌলিক নাট্যসৃষ্টিতে যে সমৃদ্ধি নির্মাণ করেছেন তাকে জাতির জীবন দর্পণই বলা হয়।

স্বাধীনতার লড়াই এবং তার জাতীয় জীবনের সর্বত্র দুর্নীতি ও স্বৈরাচার যে ভাবে বাংলাদেশের গ্রাম-নগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ ও অনুপুঙ্খবাস্তবতা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার প্রয়োগশিল্পীরা যে ভাবে তুলে ধরছেন তাকে শ্রেণীযুদ্ধই বলা যায়। বাংলাদেশের এই মৌলিক নাট্যসৃষ্টির তালিকায় যে নাটকগুলি এ বাংলার গত দুই দশকের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটকসমূহের পাশে রেখে বিচার করতে হবে নাট্য-ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের, সেগুলি হল আবদুল্লাহ আল মামুনের *'সুবচন নির্বাসনে'* (১৯৭৪), *'এখন : দুঃসময়'* (১৯৭৪), *'সেনাপতি'* (১৯৭৯), *'অরক্ষিত মতিঝিল'* (১৯৮২), *'এখনও ক্রীতদাস'* (১৯৮৩), *'আয়নায় বন্ধুর মুখ'* (১৯৮৩) ; সৈয়দ শামসুল হকের *'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'* (১৯৭৬), *'নূরলদীনের সারাজীবন'* (১৯৮১), *'এখানে এখন'* (১৯৮২), *'যুদ্ধ ও যুদ্ধ'* (১৯৮৬) ; মামুনুর রশীদের *'গন্ধর্বনগরী'* (১৯৭৭),

'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮/৯), *'ওরা আছে বলেই'* (১৯৮১), *'ইবলিশ'* (১৯৮১-৩), *'গিনিপিগ'* (১৯৮৫), *'অববাহিকা'*(?) ; সেলিম আল দীনের *'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি'* (১৯৭৬), *'শকুন্তলা'* (১৯৭৮), *'কিত্তনখোলা'* (১৯৮১), *'কেরামত মঙ্গল'* (১৯৮৫), *'হাত হদাই'* (১৯৮৯) ; মমতাজউদ্দিন আহমদের *'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা'* শীর্ষক নাট্যত্রয়ী (১৯৭৬), *'ক্ষতবিক্ষত'* (১৯৮৫) ; আবদুল্লাহেল মাহমুদের *'নানকার পালা'* (১৯৮৭); আবদুল মতিন খানের *'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব'* (১৯৭৮), এস এম সোলায়মানের *'এই দেশে এই বেশে'* (১৯৯০); ডঃ রাজীব হুমায়ুনের *'নীলপানিয়া'* (১৯৯১) প্রভৃতি।

বাংলাদেশের এই নিজস্ব নাট্যভূমণ্ডল যাতে তার নিজের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ঘটেছে, এইসব মৌলিক নাট্যসৃজনের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর একটি ধারা হল বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের ধ্রুপদী নাটক নির্বাচন ও তার প্রয়োগ.পরিচর্যা। এ ক্ষেত্রে এ বাংলার অভিজ্ঞতা ভিন্ন; আমাদের এখানে নিজস্ব দেশ-কাল-পাত্র পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য ঘটিয়ে বিশ্বনাট্য সংগ্রহের বিশিষ্ট কীর্তিগুলিকে প্রায়শ আত্মসাৎ করে নেওয়ার রীতিই প্রবল এবং এ ক্ষেত্রে আমরা কীর্তিমান ; তুলনায় মৌলিক নাট্যসৃষ্টির পরিমাণ কম, যদিচ তার গভীরতা অনেক গাঢ় ও প্রভাববিস্তারী। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ দীন। তার কারণ তাঁদের অনূদিত বিদেশি নাট্যসৃষ্টির প্রয়োগে তাদের উচ্চারণের আঞ্চলিকতা এ বাংলার শিষ্টজন মান্য সাধারণ উচ্চারণ রীতি। কানে বড় পীড়াদায়ক ; বিশেষত ক্রিয়াপদে অপিনিহিতির প্রভাব, স ও শ-র প্রায়শ ছ-এ রূপান্তরণ বড় বিসদৃশ। দ্বিতীয়ত, প্রয়োগেও নানাবিধ আড়ষ্টতা লক্ষণীয়। তৃতীয় একটি ধারা, ও বাংলার কিছু ছোট ও মাঝারি নাট্যদলের নাট্য নির্বাচনের মধ্যে লক্ষ করা যায়, সেটি এ বাংলার পটভূমিতে রচিত জনপ্রিয় কিছু পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের প্রয়োগ। প্রতিবেশী নাট্যচর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবেই একে বিবেচনা করতে পারলে খুশি হওয়া যেত, কিন্তু যেহেতু কোনো বড় দল এ বাংলার একমাত্র রবীন্দ্রনাট্য ছাড়া অন্য কোনো নাট্যকারের নাটক করেনি, তাই মনে হয় ছোটখাটো দল যখন এ বাংলার নাটক করেন, তখন যেন কিছুটা বিজাতীয় প্রসঙ্গের চর্চা করেছে বলেই ও বাংলার নাট্য বিশেষজ্ঞদের কাছে ওরা কদর পায় না।

যেমন আমাদের এ বাংলাতেও সারা বিশ্বের অধুনাতন নাটকও যত দ্রুত এ বাংলায় মঞ্চস্থ হয়ে যায়, কিন্তু বাংলাদেশের গত দুই দশকের একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটকও এ বাংলার কোনো উল্লেখ্য নাট্যদলের প্রযোজনা তালিকাভুক্ত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ দুই বাংলারই বাংলা ভাষার কেন্দ্রমণি। ও বাংলার রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে নিজস্ব ভাবনা আছে, বিশ্লেষণ আছে ; কিন্তু রবীন্দ্র সংলাপ উচ্চারণের শুদ্ধতা অতীব সতর্কতার মধ্যেও প্রায়শ স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে ও বাংলার চেষ্টা আমাদের এ বাংলার মতোই সমান আন্তরিক।

এই আন্তরিকতা নিয়েই ও বাংলা যে কাজটি সরবে ও বিপুল প্রচারসহ করে চলেছে তা হল বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যরীতির অনুসন্ধান। শ্রীমিত্র যা রবীন্দ্রনাট্যের সার্থক প্রয়োগের মধ্যে অনুধাবন করেছিলেন, তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে নিজস্ব অভিনয়ের যে দৈহিক ও বাচনিক ভঙ্গিটি আবিষ্কার করেছিলেন, *'চাঁদবণিকের পালা'*য় যার সম্ভাব্য খসড়াটি নির্মাণ করেছিলেন, সেই জাতীয় নাট্যচরিত্র আবিষ্কারে আজ বাংলাদেশের ঢাকা থিয়েটারের নির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও নাট্যকার সেলিম আল দীন বদ্ধপরিকর।

'আমরা মূলতঃ উনিশ শতকে ইউরোপ প্রভাবিত শহুরে নাটকের যে ধারা বাংলা নাটকে সৃষ্ট হয়েছিল সে সম্পর্কে কম উৎসাহী। আমাদের ঢাকা থিয়েটারও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের গঠন স্বরূপটি আবিষ্কার করতে চায়। ....আমরা বাংলা নাটকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে—বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখীনতা পরস্পরের পরিপূরক। ....গান দর্শককে চিত্র ও ভাবের দিকে—পরিবেশ ও অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্র নাটকেও তাই দেখি গানের উজ্জ্বল ব্যবহার। সে গানে শুধু সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পাই না—সেখানে দেখতে পাই আদি বাংলা নাটকের আঙ্গিক পূজারী আমাদের পিতৃপ্রতিম নাট্য দার্শনিককে। ....আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সেমিটিক মূল্যবোধের বদলে আমরা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষ্য। দক্ষিণে গর্জায়মান সমুদ্র। কাকে ভয় ? ঢাকা থিয়েটার নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাবে আদি নাট্য মাতৃকার উৎসমূলে।

*'কিত্তনখোলা'*র ভূমিকায় সেলিম ১৯৮৫-তে যে কথা বলেছেন ১৯৯০-এর *'হাতহদাই'*-এ সেই বর্ণনাত্মক গীতল নাট্যভঙ্গিটি আধুনিক টোটাল থিয়েটারের স্থাপত্যধর্মী মঞ্চসজ্জায় বর্ণিল বেশভূষায় নাট্যোক্ত গর্জায়মান সমুদ্রপারের নাবিক জীবনের আলেখ্য রচনায় এক পূর্ণতা পায়।

আমরা যাঁরা নাট্য সম্পর্কের মধ্যে আঞ্চলিকতা সন্ধানে ১৯৯১-র জানুয়ারির ঢাকায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তাঁরা কেউ এসেছিলাম ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কেউ থাইল্যান্ড থেকে, কেউ অস্ট্রেলিয়া, কেউ জার্মানি, কেউ বা ইরান থেকে। তাঁরা সবাই বিস্মিত হয়ে অনুপুঙ্খ বিচারে লক্ষ করেছি, আলোচনা আমরা যাই করি না কেন, যে বাংলাদেশ তার আঞ্চলিক থিয়েটারকে রচনা করতে পেরেছে। নাটকের বক্তব্য, বিষয়বস্তুর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামকে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন স্বর ও সুরে উচ্চকিত করেও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত থিয়েটার নির্মাণের নিজস্বতায় বাংলাদেশকে এখানে স্বচ্ছন্দে চেনা যায়।

আবদুল কুদ্দুস বয়াতীর গ্রামীণ নাট্য *'পালাগানের'* ইম্প্রোভাইজেশন আজকের থিয়েটারে যে প্রেরণা দেয়, সেই ইম্প্রোভাইজশনকে টোটাল থিয়েটারের অঙ্গ হিসেবে মান্য করে—থিয়েটারের *'এখনও ক্রীতদাস'* যে শ্রেণীযুদ্ধ রচনা করে কৃষ্ণ-রসিকতার বাস্তবতায়, কিংবা আরণ্যকের কৃষক বিদ্রোহের প্রেরণায় *'নানকার পালা'* যখন

একালের বাংলাদেশের দিনমজুরের লড়াইয়ে উৎসাহ যোগায় যোগ্য উপমান রচনা করে, অথবা *'হাতহদাই'*র বর্ণিল বর্ণনা নাট্যে যখন নোয়াখালির আঞ্চলিকতা সমুদ্রপারের জীবননাট্যে নিজেকে সমর্পিত করে ধর্মীয় সর্ববিধ সংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলে সমুদ্র-স্নান করে ওঠে, তখন বুঝি আঞ্চলিকতার যথার্থ ও সত্য রূপায়ণ এমন করেই জাতীয় নাট্যের বিশিষ্টতা অর্জন করে। এবং এই জাতীয় নাট্যের মধ্যেই অন্তর্লীন থাকে বিশ্বনাট্য বোধের আন্তর্জাতিকতা। তাই ভাষার ব্যবধান ঘুচে গিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যনির্মাণ কত সহজে আপন করে নেয় থাইল্যান্ডের ডঃ চুয়া সু পং, অষ্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী পামেলা পাইন, জার্মান নাট্য সমালোচক উলফ্‌গাঙ্গ রুফ, ইরানের আবদুল হাই শাম্মাসি-কে। আর ভারতবর্ষ তো প্রতিবেশী রাষ্ট্র; এখানে থেকে যাঁরা গিয়েছিলাম বিষ্ণু বসু, অশোক মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও বর্তমান প্রতিবেদক তাঁরা তো মুগ্ধ হবই।

পাদটীকা :

১। সাংবাদিক সম্মেলনে শম্ভু মিত্রের ভাষণ, *'সংবাদ'* ১৮ মার্চ ১৯৫৭, সূত্র *'বহুরূপী'*, স্বপন মজুমদার, পৃঃ ৪১।

২। *স্বাধীনতা পূর্ব চট্টগ্রামের নাট্যচর্চা,* কুমার প্রীতীশ বল, *থিয়েটার,* ষোড়শ বর্ষ, ৩য় ৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৯৮।

৩। *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা,* মামুনুর রশীদ, *'থিয়েটারের নাটক'* স্মারকগ্রন্থ, থিয়েটার ওয়ার্কশপের দুই দশকপূর্তিতে কলকাতায় থিয়েটার এর আগমন উপলক্ষে প্রকাশিত, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

৪। *থিয়েটারের কড়চা,* রামেন্দু মজুমদার, *'থিয়েটারের নাটক'* স্মারকগ্রন্থ, ঐ।

৫। *বাংলাদেশ : বাংলা নাটক,* নিখিলরঞ্জন দাস, *গ্রুপ থিয়েটার,* ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা অগাস্ট অক্টোবর ১৯৮৩।

৬। *বাংলাদেশের নাটক, নাট্যমঞ্চ এগিয়ে চলেছে,* আলি যাকের, *গ্রুপ থিয়েটার,* ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা অগাস্ট অক্টোবর ১৯৮৩।

৭। *কিত্তনখোলা,* সেলিম আল দীন, ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৮৫।

[*গ্রুপ থিয়েটার,* ১৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মে জুলাই ১৯৯১, পৃঃ ২১ ৩২]

শিকড়ের রস নিয়ে বহিরঙ্গণে
বাংলা থিয়েটার

শতাব্দী শেষের ঘণ্টা : যবনিকা কম্পমান

আমাদের এই বিংশ শতাব্দী শেষ হতে আর মাত্র তিন মাস বাকি, যেন বা এক ক্রান্তিকালের শেষ ঘণ্টা বাজার প্রতীক্ষায় সবাই, যবনিকা কম্পমান, তিলমাত্র সময় নষ্ট করার নাই। নটনটী কলাকুশলী সবাই অপেক্ষা করছে বাংলা নাটক নাট্যশালার একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যাশা পূরণের। কালের কষ্টিপাথরে বিংশ শতাব্দীর বাংলা থিয়েটারের সব অবদানের মূল্যায়ন হয়ে গেছে, এখন প্রতীক্ষা বিশ্বের নাট্য-অঙ্গনে বাংলা থিয়েটারের শেষ বিচারের রায়টুক্ জানার।

এই মূহূর্তে বাংলা নাটক ও তার প্রযোজনা নিয়ে মেঘনাদ ভট্টাচার্যের সায়ক গোষ্ঠী তিন মাসের আমেরিকা পরিক্রমা সেরে দেশের ফেরার প্রতীক্ষায়। নির্বাচিত নাটক দুটি আমাদের দেশ-কাল-পাত্র বিচারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দীপ্তবার্তার দুটি মৌলিক সৃষ্টি। একটি তরুণ নাট্যকার ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর *'বাসভূমি'*, অপরটি অমৃতা প্রীতমের গল্প অবলম্বনে চন্দন সেনের নাট্য রূপান্তর *'কর্ণাবতী'*—দুটি প্রযোজনাই পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা-পোক্ত সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর সাফল্যের অব্যর্থ তীর, যা বাংলা থিয়েটারের জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যভেদে সুনিশ্চিতভাবে সফল। অন্তত শতাব্দী শেষের প্রান্তে সায়ক যে শিশিরকুমারের গ্লানি মুছে দিতে পারছে, পারছে নাট্যকার মন্মথ রায়েরও জন্মশতবর্ষে তাঁর উচ্চারিত সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে যে 'বিশ্বনাট্য সাহিত্যের আসরে এক মহান আসন' অর্জন করবে একদিন বাংলা নাটক। সায়কের এই আমেরিকা পরিক্রমা, সফল দুটি প্রযোজনা নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকা মহাদেশের পনেরোটি শহর পরিক্রমা, বিশ্বনাট্য সাহিত্যের আসরে তাই বাংলা নাটক ও নাট্য প্রয়োগের মহাউত্তরণ কিনা জানি না, কিন্তু এটা মানি, ধনবাদী এই কুবেরের সাম্রাজ্যজয়ে বাংলা থিয়েটারের প্রায় সত্তর বছরের প্রয়াস চলছে নিরলস। এর মধ্যে অবশ্য অধনবাদী, একদা সাম্যবাদী দেশসমূহও পরিক্রমার লক্ষ্য ছিল বাংলা থিয়েটারের প্রগতিপন্থীদের, এবং এই শতাব্দীর শেষার্ধে তা সফলও হয়েছে।

সেই কবে শিশিরকুমার তাঁর *'সীতা'* প্রযোজনা নিয়ে আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে রিক্তহস্তে প্রায় ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বছরে প্রায় চারমাস আমেরিকায় কাটিয়ে ১৯৩১-এর জানুয়ারি মাসে মাত্র তিনটি প্রদর্শন করে *'নিউইয়র্ক সান'* প্রভৃতি পত্রপত্রিকার প্রশংসার কাটিং নিয়ে। শিশিরকুমারের আমেরিকা পরিক্রমায় বাংলা থিয়েটারের পরিচিত ঘটল Hindu Players বলে, বাঙালি শিল্পী বলে নয়। হিন্দুস্থানের নাট্যশিল্পী, তাই হিন্দু প্লেয়ারস বলে চিহ্নিতকরণ।

দলে মুসলমান শিল্পী থাকলেও সাহেবরা তখন হিন্দু প্লেয়ারস বলেই অভিহিত করত। আমরা যে হিন্দুস্থানের অন্তর্গত একটি আঞ্চলিক রাজ্যের ভাষাভাষী মানুষ। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠকবিকেও ওঁরা হিন্দু পোয়েট বলেই চিহ্নিত করত। এথনিক সভ্যতার প্রতি শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার সঠিক বিচারই এই। আজ অবশ্য বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নিয়ে বাংলার একাংশে যে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেখানকার রাষ্ট্রভাষা যেহেতু বাংলা, তাই বাংলা নাটক বা থিয়েটার বলতে পাশ্চাত্যের মানুষ আজ সাধারণভাবে বাংলাদেশের থিয়েটারকেই বুঝিয়ে থাকেন।

যা হোক শিশিরকুমারের বিশ্বজয় পূর্ণ না হলেও এ শতাব্দীর সত্তরের দশকে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে সমান্তরাল ধারার থিয়েটারের অন্যতম মুখ্য সংগঠন বহুরূপী-র অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ *'অপরাজিতা'*র বিশ্বজয় নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের কথা। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দুই ভূখণ্ডে তৃপ্তি মিত্রের *'অপরাজিতা'*র অভিনয় ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। দেশ দুটি হল রাশিয়া ও পূর্ব জার্মানি। আর পরের বছর ১৯৭৪ সালে তৃপ্তি মিত্র কানাডা, আমেরিকা ও বাংলাদেশ সফর করেন। এবং সব জায়গায়ই *'অপরাজিতা'*র অবিস্মরণীয় অভিনয়-দক্ষতা বাংলা থিয়েটারের মর্যাদাকে বিশ্বমানের স্বীকৃতি দেয়। আগেকার দিন হলে সারা বার্নহার্ড, ইসাডোরা ডানকান বা এলিনর দুঁজে-র সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হত তৃপ্তি মিত্রের নাম। তৃপ্তি মিত্রের পর থিয়েটার সেন্টারে তরুণ রায় ১৯৭৫ সালে ফ্রান্সের ন্যানসিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর *'পরাজিত নায়ক'*। এ যাওয়া বাংলা থিয়েটারের পক্ষে সম্মানের।

তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ রায়ের বিশ্ব পরিক্রমার পর অরুণ মুখোপাধ্যায়ের চেতনা গোষ্ঠীই দুদফায় আমেরিকার একগুচ্ছ শহরে অভিনয় করে আসে। প্রথমবার *'মারীচ সংবাদ'* আর *'জগন্নাথ'* নিয়ে ১৯৮০ সালে। দ্বিতীয়বার ১৯৯০-এ *'কবীর'* ও *'হরিপদ হরিবোল'* সহ। প্রথমবার যখন *'মারীচ সংবাদ'* নিয়ে যায়, তখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাংলা নাট্যের অঙ্গন থেকে চেতনা নামক বামপন্থী গোষ্ঠীর ওই মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনামূলক নাটক *'মারীচ সংবাদ'* কী করে আমেরিকার বাঙালি অধ্যুষিত দর্শক সমাজেই অভিনীত হল, এটা ভেবে এখানে অনেকেই অবাক মেনেছেন। খোদ ব্রেখটকেই যেখানে অমার্কিনি কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে শুনানি চলেছে, সেখানে 'সিয়া সিয়া' গান গাইবার অনুমতি পেয়েছিল চেতনা, ভাবতেই অবাক লাগে। নাকি এ গানটা বিপ্লবকেতনকে গাইতেই হয়নি, গাইবার আগেই নাটক সেনসরড হয়ে গিয়েছিল। খোদ অরুণের মুখে খবর নিয়ে জেনেছি, তা হয়নি, পুরো গানটাই পাওয়া যেত। চেতনা যখন আমেরিকা গিয়েছিল, তখনও সোভিয়েত সরকার টিঁকে ছিল, বোঝা যায়নি যে ভেতর থেকে তার ক্ষয়রোগ ধরেছে। দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সোভিয়েত আর চীন মতভেদ থেকে বৈরিতামূলক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আর সত্তর দশকের প্রথমেই আমেরিকার সঙ্গে চীন সুসম্পর্ক গড়ে তুলছে, বোঝাই যাচ্ছে আমেরিকা এখন মাছ খাব না গোছের বেড়ালের ভূমিকা নিচ্ছে। সুতরাং ১৯৮০-তে চেতনার *'মারীচ সংবাদ'* নিয়ে আমেরিকা সফর তার বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে চিড় খাওয়াতে পারেনি এটা ঠিক, কিন্তু আমেরিকার সাহেবরা *'মারীচ সংবাদ'* ও *'জগন্নাথ'* দেখে কী বলল তা আমরা জানতে পারলাম না, তবে কি চেতনার সফল আমেরিকাবাসী বাঙালিদের প্যাকেজ প্রোগ্রাম ছিল এবং সম্ভবত চেতনার দেখাদেখি এইরকম সাংস্কৃতিক প্যাকেজ প্রোগ্রাম আশির দশক থেকে এ দেশের কিছু শিল্পী বা দলের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ছে, এ কথা আজ সত্য। তাই ১৯৯০-তে চেতনা যখন দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকা সফরে গেল *'কবীর'* ও *'হরিপদ হরিবোল'* নিয়ে তখন কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্ট হল না বাংলা থিয়েটারের বিশ্বযাত্রা নিয়ে।

বিশ্বস্বীকৃতি নিয়ে এসেছিলেন এরপর ১৯৮৫ সালে তৎকালীন জি ডি আর সংস্কৃতি মন্ত্রকের আমন্ত্রণে উৎপল দত্তের পি এল টি। *'মহাবিদ্রোহ'* প্রযোজনা নিয়ে পূর্ব জার্মানির ৭টি শহরে অভিনয় করে বাংলা থিয়েটারের ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করে আসেন। জার্মানবাসীরা আপ্লুত হয়েছিলেন *'মহাবিদ্রোহ'* দেখে। ইতিমধ্যে ১৯৮৬-তে হংকং ব্রেখট নাট্যোৎসবে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইউনিটি থিয়েটার ব্রেখ্‌টের *'পন্তুলাহা'* মঞ্চস্থ করে এলো। এই প্রথম ব্রেখ্‌ট বিশেষজ্ঞ ও অনুবাদক John Willctt-এর মতোন বিশিষ্ট দর্শকের কাছে Asian Brecht প্রযোজনা হিসাবে *'পন্তুলাহা'* স্বীকৃতি আদায় করে নিল। Willctt লিখলেন, 'I loved your Puntila (or Pontu Laha) which I thought much the clearest and most direct of any of the Asian Brecht productions seen at the Hong Kong Brecht Festival. It was very funny, and contained some outstanding performances—your own land-owner, the ADC and the singer, in particular.' আর একজন বিশিষ্ট দর্শক, সাংহাই পিপলস আর্ট থিয়েটারের পরিচালক হুয়াং ৎসুয়োলিন জানালেন, 'Puntila is wonderful production—we enjoyed it very much. Personally I think your production and performance is the Himalay of the Festival.'

শেখর চট্টোপাধ্যায় হংকং ঘুরে আসার পর *'আজকাল'* পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এক সাংবাদিক লিখেছিলেন, 'সত্তরের দশক বাংলা মঞ্চে ব্রেশট-এর দশক, একসময় লক্ষ করা যায়, একই নাটকের দুটি কিংবা তিনটি প্রযোজনা পাশাপাশি চলছে। আশির দশকে ব্রেশট চর্চা কিছুটা শিথিল। বাংলা থিয়েটারেও আজ স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। ঠিক এমনই সময় একটি চোখে পড়ার মতো সংবাদ—হংকং ইন্টারন্যাশনাল ব্রেশট সোসাইটি আয়োজিত নাট্যোৎসবে উপস্থিত দর্শক, প্রতিনিধি, গবেষক ও পণ্ডিতদের মতে কলকাতার ইউনিটি থিয়েটারের *'পন্তুলাহা'* (ব্রেশটের হের পুন্টিলা.....) শ্রেষ্ঠ

প্রযোজনা। নিঃসন্দেহে কলকাতাব নাট্যকর্মীদের কাছে এ এক সুখের সংবাদ, গৌরবের সংবাদ। ইউনিটি থিয়েটারের কর্ণধার শেখর চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত এই মুহূর্তে দুঃখী বাংলা থিয়েটারের সুখী মানুষ, যেহেতু থিয়েটারের জন্য কোনও কান, ভেনিস, বার্লিন নেই, নেই কোনও সোনার তালপাতা বা রুপোর ভাল্লুক।'

আমরা এই কথাই বলতে চাইছিলাম, সাংবাদিক শেখর দাস বাংলা থিয়েটারের '*পত্তুলাহা*'র বিশ্বজয় সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে মন্তব্য করেছেন, আমাদেরও ওই একই কথা। বাংলা থিয়েটার তার প্রয়োগবৈভবে বিশ্ব থিয়েটারের মানে পৌঁছেছে গণনাট্য পরবর্তী নবনাট্য আন্দোলনের যুগে তিন প্রযোগশিল্পীর সৃজনশীলতার সূত্রে ; শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু এঁদের সোনালি দিনে এঁরা কেউই বিশ্বজয়ে বোরোননি। শম্ভু মিত্র ব্যক্তিগতভাবে নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিদেশে গেছেন, থিয়েটার নিয়ে যেতে পারেননি। উৎপল দত্ত তো থিয়েটার উপলক্ষে বহুবার বিদেশে গেছেন বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতায অংশগ্রহণের জন্য, দল নিয়ে যখন গেলেন পূর্ব ইউরোপে তখন তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ নেই, পিপলস লিটল থিয়েটার, পিপলস লিটল থিয়েটারের তখন যৌবন। উৎপল দত্তের এই পর্যায়ের সৃষ্টিতেও তখন আগুন ছিল। কিন্তু এরপর ৩ বছর বাদে সোভিয়েত বিপর্যয়েব মুখে যখন '*নীচের মহল*' নিয়ে গেলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেসন্সের ব্যবস্থায় সোভিয়েত সফরে ১৯৮৮-এর ১২ মে-৬ জুনের মধ্যে তখন সেই প্রদর্শন শেষে দেশে ফেরার পর সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে পি এল টি কোনো সাংবাদিক সম্মেলনই করেনি। বোঝা যায় সোভিয়েতে তখন '*নীচের মহল*' দেখাব দর্শক কোথায়, সবাই তো তখন গোরবাচভের নেতৃত্বে লেনিনমূর্তি ধূলিসাৎ করার পরিকল্পনায়। সবার নিশ্চয় স্মরণে আছে ১৯৮৯-এ সোভিয়েত সরকারের পতন হল একান্ত নীরবে, প্রতিবিপ্লবের নিঃশব্দ আক্রমণে। অথচ এই '*নীচের মহল*'ই সোভিয়েত বা সব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া পরিক্রমা করে আসতে পারত সেই পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে। যেতে পারত নাকি উৎপল দত্তের '*বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*', '*কল্লোল*' কিংবা '*মানুষের অধিকারে*', যখন লিটল থিয়েটার গ্রুপ বা পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

আজ সেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যে মিডিয়া-বিপ্লবের দ্বারা তার সমাজতান্ত্রিক শত্রুকে কোণঠাসা করে এনেছে, যে মিডিয়া আমাদের থিয়েটারে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের কথা বলাকে চিরকালই থিয়েটারি বিপ্লব বলে হ্যাক থুঃ করে এসেছে, সেই মিডিয়া থিয়েটারে বিশ্বজয় নিয়ে তখনই লিখবে, যখন আঞ্চলিক থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় থিয়েটারের নিজস্ব রূপ বলে জব্বর প্যাটেলের '*ঘাসিরাম কোতোয়াল*' বা হাবিব তনবিরের '*চরণদাস চোর*' বা বি জয়শ্রীর কোনো লোকনাটক তার পুরাতনী বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ভারতীয় থিয়েটার বলে নিজের দাবি উপস্থিত করবে। তখনই কেবল মিডিয়া সক্রিয় হবে থিয়েটারের বিশ্ব অভিযানে। বাংলা থিয়েটারের বেলায় এ জাতীয়

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বার্তা নিয়ে বিদেশ অভিযান করা হয়নি বলে সমগ্র দেশের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবাংলার থিয়েটার মিডিয়ার কাছে প্রায় অচ্ছুত। তাই থিয়েটারের জন্য কোন কান ভেনিস বার্লিন নেই, কেন নেই কোন সোনার তালপাতা বা রুপোর ভাল্লুক, সে বিষয়ে কোনো মিডিয়ারই মাথাব্যথা নেই।

অথচ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে প্রায়ই বাংলা নাটকের ছোটোখাটো প্যাকেজ ট্যুর কিংবা আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপে পাড়ি দেয় আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট বা ওই জাতীয় কোনো উদ্যোগী সংস্থার আমন্ত্রণে। ১৯৮১ সালে আই টি আই আয়োজিত সিওলে তৃতীয় বিশ্ব নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ নেয় থিয়েটার আয়োজনা সৈয়দ শামসুল হকের *'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'*। পরবর্তীতে থিয়েটার ফেরদৌসী মজুমদারের অভিনীত *'কোকিলারা'* প্রযোজনা নিয়ে আমেরিকার নিউজার্সি নিউইয়র্ক শহরে কয়েকটি অভিনয় করে আসে, এ সব অভিনয়ের অধিকাংশ ভোক্তা ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশীয়রা। বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যগোষ্ঠী এ যাবত তিনবার ইউরোপ ভ্রমণ করে এসেছে। ১৯৮৬-তে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে বার্নার্ড শ থিয়েটারের আতাউর রহমানের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাট্যের কোলাজ *'আসন ভাঙার খেলা'* পরিবেশন করে *'মুক্তধারা'*, *'বিসর্জন'*, *'অচলায়তন'* ও *'রক্তকরবী'*-র নির্বাচিত দৃশ্য নিয়ে। ১৯৮৮-তে লন্ডন কমনওয়েলথ স্কুলে *'দেওয়ান গাজীর কিসসা'*র ৩টি প্রদর্শন করে। আর ১৯৯৫ সালে *'মুখোশ'* ও *'খাট্টাতামাশা'* নিয়ে সফল প্যাকেজ ট্যুর করে আসে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো ও লস এঞ্জেলস শহরে। সর্বশেষ সংবাদ নিউইয়র্কের অভিবাসী বাংলাদেশী সুদীপ্ত চ্যাটার্জির অনুবাদ ও নির্দেশনায় এপিক থিয়েটার এন্ড কয়্যার প্রযোজনা হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের *'Nuraldin's Lifetime'* গত ৫ই আগস্ট '৯৯-তে প্রথম অভিনীত হল নিউইয়র্ক শহরেই। হক সাহেব ছাড়া এই মুহূর্তে বাংলাদেশের একান্ত মৌলিক রীতি ও বক্তব্যের নাটক যিনি লেখেন সেলিম আল দীন, তাঁর নাটক ও ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনা পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে বাংলার নিজস্ব ঘরানার নাট্য প্রয়োগরীতি বলে। দেখা গেছে ১৯৯১-এ ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ সেন্টার আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র উপলক্ষে পরিবেশিত বাংলাদেশের নাট্য উৎসবে ঢাকা থিয়েটারের *'হাতহদাই'*-এর মর্মবস্তু ও প্রয়োগের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইরান ও ফিলিপিনসের প্রতিনিধিবৃন্দ। আর সে নাটকের মধ্যে বাঙালির বিশ্বজয়ের কথা যদি ফুটে ওঠে তার সাত ঘাটে জল খাওয়ার সূত্রে, তবে ষাটোর্দ্ধ আনার ভাণ্ডারির তরুণীর আঙ্কুরিকে নিয়ে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসানোর মধ্যেও ফুটে উঠে জীবন জয়ের দুরন্ত উল্লাস।

এর বিপরীতে এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চিমবাংলার থিয়েটারের কোনো সর্বজন-আদৃত মাথা নেই বলে সায়কের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আমেরিকা ভ্রমণ আর্থিক দিক দিয়ে যতই

সফল হোক, গুরুত্বে তাৎপর্যে কোনো গুণান্বিত নয় বলে সায়কের সগোত্র কোনো নাট্যদল বা মিডিয়ার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কার্যত ঘটনা কি তাই? এ কি নেহাতই প্রবাসী বাঙালির বাণিজ্যিক প্যাকেজ, সায়কের বাছাই করা শিল্পীবর্গের নিতান্তই প্রমোদ ভ্রমণ!

'বাসভূমি' বা *'কর্ণাবতী'* পশ্চিমবাংলার থিয়েটারের এই সময়ের জনপ্রিয় প্রযোজনা। কারো কারো মতে রঙিন সোপ অপেরা নাকি সায়কের এই প্রযোজনা। যাইহোক, নাটকের বিষয় হিসেবে আমাদের এই উন্নয়নশীল এথনিক সমাজের নারীর মর্যাদার প্রশ্নটি কতখানি গুরুত্ব দিয়ে বাস্তব সূত্রের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে সেটা আমরা বিবেচনা করব না? অভিনয়ে *'বাসভূমি'*কে সোপ অপেরার পর্যায়ে ফেলব নিতান্তই তার পারিবারিক বৃত্তের কাঠামোয় নাটকটি বাঁধা বলে? তবে *'কর্ণাবতী'*কে? সেখানে তো গোটা রাজস্থানটাই উঠে এসেছে তার বেশভূষা রং-বেরঙের ঔজ্জ্বল্য, কথা, চরিত্র, গান, নদী প্রভৃতি সব মিলিয়ে একটা খাঁটি এথনিক সমাজের জীবন্ত প্রতিরূপ নয় কি? সমস্যা অবশ্য এথনিক সোসাইটির নয়; এ সমস্যা, এ প্রশ্ন এখনকার পোস্ট মডার্নিজমের। সন্তানের পরিচয় আর বাপের সূত্রে নয়, মায়ের সূত্রে। এ দাবি ইউরোপে কবে উঠেছে জানা নেই, কিন্তু আমাদের দেশে আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য—নীনা গুপ্তের মাতৃত্বেই তো তার কন্যার পরিচয়। সুতরাং *'কর্ণাবতী'*র নদীর উপমানের কাব্য কারো কাছে শতাব্দীর গ্রহণযোগ্য এক প্রত্যয় আরোপিত বলে মনে হলেও অভিনয়গুণে অনায়াস হয়ে ওঠে প্রায় সকলের কাছে। কুসুম্বি-র মতো প্রতিবাদী নারী রাজস্থানের পটভূমিতে আজ বাস্তব কিনা জানা যায় না, কিন্তু বোম্বে বা কলকাতার নগরজীবনে শিক্ষিত পরিমণ্ডলে কুসুম্বির মতো প্রতিবাদী জননী আজ এক নয়, একাধিক।

এই রকম এক বা একাধিক জননী আমেরিকা প্রবাসিনী বাঙালিদের মধ্যে আছে কিনা জানি না কিন্তু এটা ঘটনা, সুখলোভী দেশত্যাগী ভোগী অভিবাসী বাঙালি সমাজ সায়ক প্রযোজিত বাংলা নাটক দেখে আহ্লাদিত হল না শিক্ষিত হল, তাতে বাংলা থিয়েটারের কিছু আসে যায় না। কোনো এন আর আই-ই দেশে ফিরে যেমন দেশের জন্য কিছু করবে এ প্রত্যাশা করা আর ধন্য আশা কুহকিনী আবৃত্তি করা এক, তেমনই কোনো এন আর আই বাংলা থিয়েটারের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলে স্টার রংমহল বিশ্বরূপার বন্ধ দরজা খুলতে টাকা ঢালবে এও ভাবা যাচ্ছে না। যাচ্ছে কি? সুতরাং সায়কের আমেরিকা ভ্রমণে তার শিল্পী-কলাকুশলীদের লাভ হলেও বাংলা থিয়েটারের বিশ্ব মর্যাদা বাড়ল বলে এখন আর কেউ মনে করবে না।

এমন অবস্থায় শতাব্দী শেষের প্রান্তে বাংলা থিয়েটারের জন্য যদি গর্ববোধ করতেই হয়, যদি বিশ্ব থিয়েটারের সমপর্যায়ে বাংলা থিয়েটারের সম্মানকে উঁচুতে তুলে ধরতেই হয়, তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সাম্প্রতিক প্রস্থান-অভিমুখের দিকে আমাদের তাকাতেই হয়। কিন্তু খেয়াল রাখতেই হয় আমাদের এ বাংলায় কি বিগত পাঁচ দশকে এমন কিছু সৃষ্টি হয়নি যা দিয়ে আমরা বিশ্বনাট্যের অঙ্গনে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি হ্যাঁ

এ আমাদের বাংলা নাটক, ইউরোপীয় নাট্যের কাঠামোয় হলেও এ আমাদের বাংলা নাট্যর নিজস্ব ভাষা। অবশ্যই আমাদের এই শতাব্দীর সর্বকালীন ও সমকালীন রবীন্দ্রনাট্য *'ডাকঘর'* (১৯১২) এ *'রক্তকরবী'* (১৯২৬)-র বহুরূপী প্রযোজনার (*'রক্তকরবী'* ১৯৫৪ / *'ডাকঘর'* ১৯৫৭) কথা বলতে হবে অভিনেতা ও নির্দেশক শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্রের পাশ্চাত্য প্রতিভা অতিক্রমী অভিনয়কলার কথা, বলতে হবে উৎপল দত্তের পাশ্চাত্য সমতুল বিশালাকৃতি বহুতলীয় বৈপ্লবিক রাজনৈতিক নাট্যপ্রয়োগভাষার বৈভবের কথা, বলতে হবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েব নিত্যনতুন প্রয়োগরীতির অনিবার্য প্রভাববিস্তারী ক্ষমতার কথা। গর্ব করতে হবে বাংলা প্রসেনিয়াম মঞ্চের বিপ্রতীপে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় নাট্যভাষা ও বিষয়ের, ভাবতে হবে কৌতুকের আবরণে সমকালীন জীবনের মিলনাণ্ডক রূপের স্রষ্টা নাট্যকার অভিনেতা মনোজ মিত্রের কথা। বিবেচনা করতে হবে সমকালীন জীবনের প্রতিস্পর্ধী শক্তির যাবিষ্কারক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যভাষার কথা। অতি সম্প্রতি বিভাস চক্রবর্তীর বাঙালির নিজস্ব নাট্যভাষার অনায়াস প্রয়োগ সাফল্যের দৃষ্টান্ত *'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'* (১৯৮৮)-ব কথা। এতখানি বলার পরে বলতে হবে এইসব বিশ্বজয়ী নাট্যপ্রয়োগের মূল আদলটাই হয়তো পাশ্চাত্য থিয়েটার থেকে নেওয়া। এই পাশ্চাত্য থিয়েটার থেকে নেব কি নেব না বা অনায়াসে পাশ্চাত্যের আদলের মধ্যে নিজের আদলটাকেই প্রাধান্য দেব এই সব ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতন নাট্যকার নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। এবং চিত্রপটের অপেক্ষা চিত্তপটের ওপর নির্ভর করেই বাঙালির নিজস্ব সাঙ্গীতিক নাট্যআঙ্গিকেই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অভিব্যক্ত কবেছিলেন, *'বাল্মীকি প্রতিভা'* দিয়ে শুরু করে *'শাপমোচন'*, *'মায়ার খেলা'*য় সমাপন তার প্রমাণ। এবং বাঙালির নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিক আবিষ্কার বা পুনর্যোজনা কল্পে যখন দুই বাংলায়ই সচেতন উদ্যম সূচিত হয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথের পর গণনাট্যকার ও প্রয়োগভাবুক বিজন ভট্টাচার্যের দেশজ নাট্যরীতি প্রকাশের এক আকুলতা আমরা লক্ষ করি। কিন্তু উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাবে তা পরিস্ফুট হয় না। পরিস্ফূট ও বিকশিত হয় গণনাট্য-নবনাট্য উত্তরকালে প্রসেনিয়াম মঞ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাদল সরকারের এক অন্তরঙ্গ থিয়েটারের আবেদন মণ্ডিত অঙ্গন মঞ্চের থিয়েটার, পরবর্তীতে যা কার্জন পার্কের খোলা জায়গায় মুক্তমঞ্চের নাট্যরীতি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদল সরকার তাঁর কলম ও কল্পনার জোরে তাঁর এই নতুন নাট্যআঙ্গিকের এক তাত্ত্বিক আবরণ দিয়ে বললেন, এ তাঁর থার্ড থিয়েটার। একদা বামপন্থী বাদল সরকার তাঁর এই নাট্যবিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল স্রোতের বাইরে নকশালবাড়ি লাইনে বিশ্বাসী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের নাট্যকর্মীতে রূপান্তরিত করে ফেললেন সত্তর আশির দশকে। বাদলবাবুর নাটকের বড়ো সম্পদ নাট্যর কাব্যগুণ, সংলাপের ছন্দোময়তা, কবিত্র বা গানের ধুয়ার মতো কোরাসের আবর্তন। তাঁর নাট্য-আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য হল সম্পূর্ণ দৈহিক সঞ্চালনের মাধ্যমেই নিরাভরণ রূপকল্প নির্মাণ। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের এই তত্ত্ববিশ্বের

মধ্যে ত পাশ্চাত্যের ইউজিন বারবা-র থার্ড থিয়েটার (অবশ্য বাদলবাবু চট্টগ্রামে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, ইউজিন বারবা যে থার্ড থিয়েটারের কথা বলে আমারটা তা নয়, আমার চিন্তাটা একেবারে ভিন্নরকম), জুডিথ মালিনা ও জুলিয়ান বেকের লিভিং থিয়েটার বা গ্রোটোভস্কি-র পুওর থিয়েটারের সারাৎসার খুঁজে পাওয়া যায়। তবু বলতে হবে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাট্যের নিজস্বতার পর বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ বিশ্বজয় না করলেও গোটা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী থিয়েটার তথা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের থিয়েটারের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। প্রবীর গুহর এ এল টি, কাঁচরাপাড়ার পথসেনার মতো অসংখ্য দল যার উত্তরসূরী। বাদলবাবুর এই নাট্য-আঙ্গিকের মধ্যে দেশজ-লোকজ ভঙ্গি কিছু নেই, আছে সহজে লোকবৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হওয়া।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে তৃতীয় দুনিয়ার লোক-আঙ্গিকের থিয়েটার রক্ষা ও তার পুনরুদ্ধার দ্বারা আধুনিক আঞ্চলিক থিয়েটার গড়ার একটা পরিকল্পনা যেসব দেশ গ্রহণ করেছে ভারত ও বাংলাদেশ তার অন্যতম। এই প্রকল্পেই উত্তর মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যখন হাবিব তনবির, জব্বর প্যাটেল, বি জয়শ্রীর আবির্ভাব ঘটছে, তখন বিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিমবাংলার থিয়েটারে বিভাস চক্রবর্তীর একটা *'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'* মধ্যে আমরা যখন চলকে উঠে থেমে যাই, তার কোনো তেমন অনুসরণ বা ধারাবাহিকতা তৈরি হয় না, তখন ও বাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে দেখা যায় এক নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির প্রয়াস সেলিম আল দীন ও ঢাকা থিয়েটারের যুগল সৃজনে, উদ্ভাবনায় ও উৎক্রান্ত কল্পনায় বাংলার এক নিজস্ব নাট্যউদ্ভাস।

প্রসেনিয়ামের তিনদিক ঘেরা পাটাতন, মঞ্চের আলো, সঙ্গী, আবহ ইত্যাদি যোগেই বাংলা নাট্যর প্রত্ন আদলটি আবিষ্কার ও তার প্রতিষ্ঠার নেশায় মেতে উঠেছেন সেলিম আল দীন। এবং তার সঙ্গে সহবতে যতখানি পারেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও তাঁর ঢাকা থিয়েটার। বাঙলার মধ্যযুগীয় পালাগান, পাঁচালি, কথকতা, কবিগান, ধামালি, গম্ভীরা, রামলীলা, হাস্তর গান ইত্যাদি আঙ্গিকের অনুসরণে লোকসমাজের নিম্নবিত্ত উপেক্ষিত জাতি উপজাতি অন্ত্যজদের জীবনযাপিনের এমন আধুনিক নাট্যনির্মাণ এই শতাব্দী শেষের এ ভূখণ্ডের বোধ করি সব চেয়ে অহংকৃত অবদান, রবীন্দ্রনাথের পর, বাদল সরকারের পর, বাংলার এ এক নিজস্ব সৃষ্টির উৎসার।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব থিয়েটারের অঙ্গনে ব্রেখ্‌টের নাট্যসৃষ্টির কোনো তুলনা নেই। সেই, থিয়েটারের পাশে একান্ত ছোট্ট একটা কোণে জনগণের থিয়েটার হিসেবে রবীন্দ্রনাট্যের একটা অংশকে আমরা দেখতে পাই। বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার বাংলার বিশ্বজয়ে তেমন বড়ো ভূমিকা নিতে পারেনি। এখন বিশ্ব থিয়েটারের অঙ্গনে বাংলা থিয়েটারের নিজস্ব কণ্ঠস্বর তার রূপবৈভব যেন বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সেলিম আল দীনের বর্ণনানাট্য বা কথানাট্যে। সেলিমের *'কিত্তনখোলা'*, *'কেরামত মঙ্গল'*, *'হাতহদাই'*

ত্রয়ী নাট্য এবং তারপর রচিত *'চাকা'*, *'হরগজ'*, *'যৈবতী কন্যার মন'*, *'বনপাংশুল'*— মানবজীবন সংসারের নানাবিধ ঊনতার মধ্যে মহত্তর জীবনযুদ্ধকে প্রতিষ্ঠার এক একটি উজ্জ্বল দিশা।

সেলিমের সৃষ্টি এই এক একটি উজ্জ্বল দিশার মধ্যে যদি কেউ আমাদের যুক্ত ও বিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের পরম্পরাব লক্ষণ খুঁজে না পান, তাহলে বলব সেলিমের সৃষ্টিকে দেখা হবে খণ্ডিত দৃষ্টিতে। সেলিম বাংলা নাট্যের প্রত্ন আঙ্গিকের তত্ত্ববিশ্বে ডুব দিয়ে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প রচনার কথা বলেন তারই মধ্যে ভাষাগত প্রচ্ছন্নতায় লুকিয়ে আছে বা থাকছে মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরম্পরা। সেলিম মুখে কখনও মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান বলেন না। তাঁর নাটকের চরিত্ররা কেউ বিপ্লব করে না, তবে বিপ্লব এলে তাবা বাধাও দেবে না। এইসব সহ দ্বিবিধ পরম্পরায় সেলিম তাই আঞ্চলিক বাংলার প্রতিনিধি যেমন, তেমনই প্রতিনিধি বিশ্ব আর্থ-সামাজিক ভাবনার। কেমন করে সেলিম তার *'কিত্তনখোলা'* থেকে *'বনপাংশুল'* পর্যন্ত সাত-আটটি নাটকের মধ্যে মহাকাব্যিক বাস্তবতার স্তরে বাংলার অন্ত্যজ উপেক্ষিত জাতি উপজাতির মানুষের বাঁচা মবা বাঁচা সংগ্রামের জীবনালেখ্য রচনা করে চলেছে, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই যে দর্শক বা পাঠকেব, তাঁবা জানতেই পারছেন না যে বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পর্যায়ে বাংলা নাটক ও নাট্যকলা কীভাবে স্বকীয় সৃজনে বিশ্বনাট্যের সমীপে উন্নীত হয়ে গেল।

*'কিত্তনখোলা'*য় মেলার উদ্দেশ্যে মেলা করা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আনপড় জনজীবন তার লোকবিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা রিরংসা আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ নিয়ে জমিহারা দিনমজুর, পাটের কারবারি, মহাজন, যাত্রাওয়ালা, বাকসো সিনেমাওলা, গাড়িওয়ালা, জুয়ার মালিক, বয়াতি, বেদেনি সব নিয়ে *'কিত্তনখোলা'*। সমাজের এই নিচুতলার মানুষের জন্য 'তখন কোথাও এই রূপান্তরিত জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষা করছে   সেটা কি? সেই বদলের রঙ কেমন?'

'কেরামত মঙ্গলে' কেরামত আমাদের এই বাংলার প্রেক্ষিতে এক জগন্নাথ, চীনের প্রেক্ষিতে হয়তো আ কিউ। শেকড়ছেঁড়া বোকাইচণ্ডী কেরামত তার জীবনযাত্রায় অসংখ্যবার শিকার হয় সমাজের ওপরতলার মানুষের কাছে। ভারত-পাকিস্তানের দেশ বিভাজনের সময় থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মের কিছু পর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর সময়কাল জুড়ে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড ঘটনার আবর্তে কেরামত আবর্তিত হয়। এ নাটকেও বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত সমাজের অসংখ্য চরিত্র এসে ভিড় করে কেরামতের চারপাশে। হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হাজং, গারো উপজাতি, জমিদার, কৃষক, দিনমজুর, মাঝি, রাজনৈতিক কর্মী, নেতা, মুক্তিযোদ্ধা সব কিছুর সঙ্গে দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কেরামত—তার অন্তরের সৌহার্দ্য দিয়ে অবৈধ ভ্রূণের রক্ষক হতে চায়। কেরামতের প্রতিবাদের ভাষা আত্মনির্যাতনের ভাষা : 'আমাক কুত্তা হিয়াল কাক হগুন দিয়া খাওয়াও। তার আগে

পরযন্ত তারপরেও আদমসুরত বেবাক মায়ের গবভে শান্তি দিক।' আ কিউ, জগন্নাথের মতো কেরামতের প্রতিবাদের ভাষা তাবৎ দর্শকের মর্মযাতনার কারণ হয়।

'হাতহদাই' নাটককে সবাই সেলিমের ট্রিলজি-র তৃতীয় পর্ব বলে নির্দেশ করেন। এ নাটক দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় সেলিমের এ এক মহৎ সৃষ্টি। ব্রেখ্‌টের এপিক থিয়েটারের মতোই বাংলার এ এক মহত্তম বর্ণনানাট্য। জাহাজি আনার ভাণ্ডারির জীবনজয়ের মূল কাহিনীর সঙ্গে কত বিচিত্র সংলগ্ন চরিত্রের খণ্ড কাহিনী মিলে এ এক অখণ্ড জীবননাট্য—হাতহদাই। কেরামত যেখানে দোজখের মধ্যে মুক্তির স্বপ্ন দেখে, আনার সেখানে নিজের খোঁড়া গোর নিজে বুজিয়ে বিধবা শ্যালিকা আঙ্গুরিকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে চরটুবায় পাড়ি দেয়। মুসলমান সমাজে ধর্মবিশ্বাস যেমন প্রবল, তেমনি সেই ধর্মীয় অন্ধতা, তার নানাবিধ সংস্কারকে আঘাত করার প্রবল বিশ্বাসও এ নাটকের অন্যতম সম্পদ। সেলিম তাঁর কোনো লেখালেখি বা ভাষণে মার্কসীয় দর্শনের কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর এই সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই ধরা পড়ে তাঁর বস্তুবাদী জীবনদর্শনের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা।

পরবর্তী সৃষ্টি *'চাকা'*। ১৯৮৬-৮৭-র গণ-অভ্যুত্থানের এক বেওয়ারিশ শব নিয়ে নাম পরিচয়হীন দিগন্ত থেকে দিগন্তে, গ্রাম থেকে গ্রামে এ গোযানবাহী চংক্রমণ। কোনো রাজনীতিক গোষ্ঠীই যখন তার দাবিদার হয় না, তখন জনৈক খেতমজুরের খোঁড়া কবরে তার গতি হয়। কিন্তু 'চাকা' পঠনের পর আমাদের মনে হয় মাদার কুরাজের শকটের সঙ্গে সেলিমের শববাহী গো-শকটের কোনো তুলনাই হয় না, তবু যুদ্ধ-ব্যবসায়ের মধ্যে মাদার কুরাজকে যেমন সন্তানসন্ততি হারিয়ে নির্মম জীবন-যাপনের কারণেই শকট টেনেই যেতে হয়, সেলিমের নাম-পরিচয়হীন সহস্র শহিদের এক শববাহী গাড়োয়ানকেও যেন আমরা গাড়িটা গড়িয়ে নিয়ে যেতেই দেখি।

*'চাকা'*র পর উল্লেখযোগ্য নাটক *'হরগজ'*। ১৯৮৯-র টর্নেডো বিধ্বস্ত কৃষিজীবী জনপদে প্রকৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধ মানুষের উদ্ধার অভিযান। আবিদ আলি, ৬. হাওলাদার, ড্রাইভার খয়েরালির চোখ দিয়ে প্রাকৃতিক আক্রমণের বিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ পশুপাশি উদ্ভিদ সমস্ত জীবনজগতের অসহায়তা বর্ণনাই যেন এই কথানাট্যের প্রস্থান। *'হরগজ'* অবশ্য এখনও মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হননি নাসিরউদ্দীন ইউসুফ। *'হরগজে'*র পর সেলিমের উল্লেখ্য সৃষ্টি *'বনপাংশুল'*। মান্দাই উপজাতি সমাজের বেশভূষা, জীবনযাপন, মন্ত্রপূজা, সংস্কার, প্রেম-প্রতিহিংসা, ঘাত-প্রতিঘাতসহ এ এক পাঁচালি নাট্য। *'বনপাংশুল'* ঢাকা থিয়েটারের বাংলা বর্ণনানাট্যের পরম্পরায় আর এক মূল্যবান সংযোজন। এর-মধ্যে আর একটি অবশ্য উল্লেখ্য সেলিম সৃষ্টি হল *'একটি মারমা রূপকথা'*। সেলিম একে গবেষণাগার নাট্য-প্রয়োগ রূপে বিবেচনা করার অনুরোধ করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মারমা উপজাতি জীবনের এই আধুনিক রূপকথার প্রয়োগ যত আয়াসসাধ্যই হোক,

আধুনিক থিয়েটারের পরিভাষায় এও এ দিশা।

এখন প্রশ্ন এইসব প্রয়োগকে যদি দিশা বলি তাহলে ওই রীতিতে রচিত নাটক ও নাট্য-আঙ্গিকই কি আমাদের বাংলা নাট্যের একমাত্র গন্তব্য বলে আমরা মনে করব? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে তো রবীন্দ্রনাট্যের অনুসরণে এ যাবৎ কত নাটকই না নির্মাণ করা যেত বা শম্ভু মিত্রের প্রয়োগ অনুকরণে হতে পারত বাংলা নাট্যের একটা নির্ধারিত প্রবাহ। না এরকম কোনো স্থির আদল আর একবিংশ শতকের মুখে কোনো ভাষার থিয়েটারেই সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। তাই সেলিম আলি দীন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ প্রকল্পিত বর্ণনাত্মক নাট্য বা কথানাট্য বা পাঁচালি নাট্যর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেও ওর পুরনাবর্তন আধুনিক বাংলা নাট্যর প্রকৃত রূপ, এ কথা সুস্থিরভাবে আদৌ বলা যাবে কিনা সন্দেহ থেকেই যায়। বরং বলা যায় থিয়েটারের আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সর্বজনবোধ্য আঙ্গিকের প্রযোজনা এখনও বহুদিন ধরে চলবে। এ কথা ও বাংলার নাগরিক, ঢাকাব প্রযোজনা, *'ঈর্ষা'* বা *'খাট্টা তামাশা'*র সঙ্গে সমান্তরাল স্মরণে এ বাংলাব চুপকথা-র *'জন্মদিন'* কিংবা শূদ্রকের দেবাশিস মজুমদারের *'রাঙামাটি'*, নান্দীকারের *'গোত্রান্তর'*-এর দর্শন মনে রেখেই বলা যেতে পারে।

বলা যেতে পারে বাংলার বৈপ্লবিক থিয়েটারের যে রূপকল্প উৎপল দত্ত নির্মাণ করেছিলেন বিশ্ব রাজনৈতিক থিয়েটার অঙ্গনে, সে ধারার অনুবর্তন শতাব্দী শেষেব প্রান্তে আজ আমরা আর দেখছি না বটে কিন্তু কলকাতার থিয়েটারের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উষা গাঙ্গুলির *'লোককথা'*, *'কোর্ট মার্শাল'* বা মুক্তমঞ্চের *'মইয়াত'* প্রযোজনার মধ্যে ভাষা হিন্দি হলেও শ্রেণী শাসনের মৌল বঞ্চনা অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রাজনৈতিক চেতনার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি সাম্প্রতিক সমাজদেহে ধাক্কা দিচ্ছে বইকী। ধাক্কা দিচ্ছে গ্রামবাংলা বা জেলা শহরের মঞ্চে মঞ্চে অভিনীত ছোটো ছোটো একাঙ্কের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী বামপন্থী রাজনৈতিক থিয়েটার যা আশি-নব্বইয়েব অন্তিম পর্বে পৌঁছেও তরতাজা। দশটি অবশ্য উল্লেখ্য একাঙ্ক রচনা ও প্রযোজনার কথা বললে এক নিশ্বাসে বলতে গর্ববোধ হবে, যেমন কৃষ্টিসংসদ সোনারপুরের সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তেব রচিত নির্দেশিত *'কাজের দিন'*, হালিশহর ইউনিটি মালঞ্চ'র গোপাল দাস রচিত নির্দেশিত *'হনুয়া কা বেটা'*, শান্তনু মজুমদার রচিত দেবাশিস সরকার নির্দেশিত *'চরিত্র'*, অশনি, হুগলির কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় রচিত জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত *'হর্জমশক্তি'*, বিচিত্রা (কালিয়াগঞ্জ)-এর হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত ও শান্তনু দাস নির্দেশিত *'বন্দুক'*, যুগাগ্নি (বহরমপুর) প্রযোজনা মান্নান হীরা রচিত অভিজিৎ সরকার নির্দেশিত *'ঘুমের মানুষ'*, আরোহী (ব্যান্ডেল) প্রযোজনা অমিতাভ চক্রবর্তী রচিত রঞ্জন রায় নির্দেশিত *'নষ্টনীড়'*, ঋত্বিক (বহরমপুর) প্রযোজনা গৌতম রায়চৌধুরী রচিত নির্দেশিত *'৩০শে জানুয়ারি'*, মালঞ্চ (মালদহ) প্রযোজনা পরিমল ত্রিবেদী রচিত নির্দেশিত *'উদাস পূজা'*, সারথি (চুঁচুড়া) প্রযোজনা শ্যামাকান্ত দাস অবলম্বনে সমীর সেনগুপ্ত পরিচালিত

'সোনালি ডানার চিল'। খুঁজলে দেখা যাবে হয়তো আরও একশোটা একাঙ্কের সন্ধান মিলবে। নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যে গ্রামবাংলার থিয়েটারের এই রাজনীতিক অভিব্যক্তির একটা বড় প্রেরণা এ-রাজ্যের বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ যে গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত আছে, তা বোঝা যায় এই শক্তির জোরেই নিরবচ্ছিন্ন ২৩ বছরের বামশাসনের শান্তির নীড় দেখে। বিপরীতে শহর ও রাজ্যে রাজধানীর উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত হোয়াইট কালারদের ভোগমুখী জীবন-যাপনের অন্তহীন চাহিদার যেমন শেষ নেই, তেমনই সুখশান্তির গুরু-ভোজনের চোঁয়া-ঢেকুরে এখন তাঁরা যেমন আন্দোলন-বিমুখ, তেমনই তাঁদের বুদ্ধিজৈবিক শিল্পীদেরও কেউ কেউ বামপন্থী-বিমুখ, সমালোচক। ফলে লক্ষ্যহীন, দর্শনহীন কলকাতা থিয়েটারের অভিমুখ এই মুহূর্তে অনির্ণেয় এক সমস্যা।

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের এই অনির্ণেয় সমস্যার একটা বড়ো দিক দলে দলপতির শাসন নির্দেশ এখন আর তরুণ সদস্যদের সদস্য স্বীকৃতি দিচ্ছে না, ফলে তরুণ শিল্পীদের দায়বদ্ধতা কমে যাচ্ছে, উবে গেছে তাদের দলগত সংহতির প্রতি নিষ্ঠা। দলে সদস্য ছাড়া দল। প্রযোজনা-ভিত্তিক শিল্পী সংগ্রহ করে প্রযোজনা নামছে। সুতরাং বাণিজ্যিক লক্ষ্যে প্রযোজনা জনপ্রিয় করার দিকে সবার লক্ষ্য। প্রযোজনা জনপ্রিয় বলতে বোঝাচ্ছে কলকাতার বাণিজ্যিক আর গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যের জল চলাচল বিভাজন যেহেতু মুছে দেওয়ার ব্রত নেওয়া হয়েছে, সুতরাং পাবলিক থিয়েটার কমার্শিয়াল থিয়েটারের দর্শকের একাংশকে টেনে নেওয়ার জন্য বোকাবাক্সের ফর্মুলায় এখন অনেক গ্রুপ থিয়েটারেরর প্রযোজনা তৈরি হচ্ছে।

আর এই বোকাবাক্সের আকর্ষণ, তদুপরি পাবলিক-কমার্শিয়াল থিয়েটারের আকর্ষণহীন প্রযোজনার জন্যও কলকাতার পাবলিক থিয়েটারের প্রায় সব ঝাঁপ বন্ধ। স্টার আগুনে পুড়িয়ে ঝাঁপ বন্ধ, আর বিশ্বরূপা, রঙমহল, কাশী বিশ্বনাথ, তপন থিয়েটার সেই মানের আকর্ষণীয় অভিনেতৃবর্গের কোনো উপভোগ্য নাটক নামাতে না পারার ব্যর্থতায় ঝাঁপ বন্ধ। সেই সঙ্গে সিনেমার স্টার আর্টিস্ট পোষার ব্যয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় এমন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছিল যে, এই সব হল মালিকের পক্ষে 'A' মার্কা নাটক নামিয়েও আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বোম্বের বাঙালি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর আর্থিক বদান্যতায় মিনার্ভা থিয়েটার কোনোরকমে সমবায় পদ্ধতিতে টিঁকে আছে কিন্তু কোনো নাটকই জমছে না। রঙ্গনায় গণেশ মুখোপাধ্যায়, সারকারিনায় অমর ঘোষ এখনও চেষ্টা করছেন তাঁদের থিয়েটারকে বাঁচানোর, কিন্তু উপরোক্ত সমস্যায় এঁরা দুজনেই জেরবার। মেঘনাদ ভট্টাচার্যরা চেষ্টা করলেন বিজন থিয়েটারকে গ্রুপ থিয়েটারের সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রুপ থিয়েটারগুলির বাছাই করা জমাটি প্রযোজনা দিয়ে হলকে পুনর্জীবিত করার, কিন্তু গভীর হতাশার সঙ্গে উপলব্ধি করা গেল কমার্শিয়াল থিয়েটারের বাজারি দর্শক ধরার ক্ষমতা নেই এখনকার কোনো গ্রুপ থিয়েটারের। সে ওই দুজন নাট্য-নির্দেশকই দুবার

পেরেছিলেন আজ থেকে তিন-চার দশক আগে মিনার্ভা আর রঙ্গনায় রাজনৈতিক নাটক আর বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণ দিয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে থিয়েটার চালাতে। পাবলিক থিয়েটারের ব্যবসার বিপরীতে ভালো থিয়েটার দিয়ে বাংলার নাট্য আন্দোলনকে উদ্দীপিত করতে। আজ কেন্দ্র কি রাজ্য কোনো সরকারেরই ক্ষমতায় কুলোবে না ওই হলগুলিকে পুনর্জীবিত করার। কারণ সেই কলোশাস জায়ান্ট পরিচালক বা নাট্যকার বা অভিনেতা-অভিনেত্রী কোথায় ? আমাদের প্রস্তাব সরকার ওই সব হলগুলি হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে অধিগ্রহণ করে গিরিশ, মধুসূদন ইত্যাদি মঞ্চের মতো বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারকে উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশনের আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহার করা হোক। বিশ্বরূপাকে শ্রীরঙ্গম নামে ফিরিয়ে নিয়ে শিশিরকুমার স্মারক ও তৃপ্তি মিত্র স্মারক রূপে নাট্যগবেষকদের কাজে লাগানো হোক। আর স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ করে 'বিনোদিনী থিয়েটার' নামে চালু করে আপাতত শাঁওলি মিত্র বা উষা গাঙ্গুলির পরিচালনায় উদ্দীপক নাট্য প্রযোজনার জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হোক। সোহাগ সেন, সীমা মুখোপাধ্যায়, জয়তী বসুর মতো সফল পরিচালকবৃন্দও এই থিয়েটারের অন্যান্য দিনে তাঁদের ভালো প্রযোজনাগুলি মঞ্চস্থ করবেন। আমরা বলতে পারব কলকাতায় একটা মহিলা পরিচালকদের নিজস্ব থিয়েটার অবশেষে একবিংশ শতাব্দীতে পা রেখে পাওয়া গেল।

এ পাওয়া কম না। আশি ও নব্বই এই দুই দশকে বাংলা থিয়েটারে মহিলা পরিচালকদের আবির্ভাব যেমন একটা বড় ঘটনা, তেমনই তাঁদের অনেকেরই প্রযোজনা এই দুই দশকের সেরা প্রযোজনার তালিকার শীর্ষে রাখলে পুরুষদের আপত্তির কিছু থাকবে না। শাঁওলি মিত্রের *'নাথবতী অনাথবৎ'*, *'কথা অমৃত সমান'* ও *'বিতত বীতংস'* ; উষা গাঙ্গুলির *'মহাভোজ'*, *'লোককথা'*, *'কোর্ট মার্শাল'*, *'রুদালি'*, ছোটনাটক *'মইয়াত'*, সোহাগ সেনের *'উত্তরাধিকার'*, *'পার্টি'*, *'মহানির্বাণ'*, *'উত্তরপুরুষ'*, *'পাপ'* ; জয়তী বসুর *'কেয়ার করি না'*, *'রোবট'*, *'কুপোকাত'* ; সীমা মুখোপাধ্যায়ের *'বিকল্প'*, *'যে জন আছে মাঝখানে'* ; ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের *'বনলতার প্রেমিকারা'*, *'কমলে কামিনী'* ইত্যাদি বলে শেষ করতে হয়, নাহলে তালিকা আরও কিছু বাড়ে। বাংলাদেশের থিয়েটারেও খুবই উল্লেখযোগ্য তিনজন মহিলা পরিচালক এই নব্বইয়ের দশকে সক্রিয়। নাগরিকের সারা যাকের ৪ খানি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন তার মধ্যে *'মুখোশ'* বিশিষ্টতম। *'দুখিনী'* ও উল্লেখ্য। দেশ নাটক দলের ইশরাত নিশাত *'লোহা'* এবং নাগরিক নাট্যাঙ্গনের লাকি ইনাম *'সরমা'* পরিচালনা করে আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। খুঁজলে নাম আরও বাড়বে।

আর বাড়ে বলেই ভরসা যে এই নব্বইয়ের দশকের শেষ প্রান্তে পুরো এই দশকের দিকে তাকালে আগামী একবিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারের কয়েকজন তরুণ নবীন নির্দেশক ও নাট্যকারকে যেন স্পষ্ট দেখা যায় এবং এঁরাই যে একবিংশ শতাব্দীর বাংলা

থিয়েটার শাসন করবে সে বিষয়ে নিশ্চিত।

এই রকম নবীন শাসকদের কয়েকজনের মধ্যে একজন হলেন গৌতম হালদার। নান্দীকার এঁর হাতে নিরাপদ থাকবে নিশ্চিত। নাট্যনির্মাণ সাধারণভাবে এঁর কাছে যেন বা কোনো চ্যালেঞ্জই নয়, তা সে যত বড় সমস্যা নিয়েই আসুক না। রাজনীতিক বিশ্বাস বা দর্শনে এঁর নিজস্ব কোনো প্রস্থান এখনও স্পষ্টগোচর না হলেও বাংলা থিয়েটারের রাজনীতিক পরম্পরাকে ইনি মান্য করেন। এঁর নির্দেশিত নান্দীকার প্রযোজনা হল *'এক থেকে বারো'*, *'মেঘনাদবধ কাব্য'*, *'নগরকীর্তন'*। এছাড়া এই দশকে যুগাগ্নির *'মা অভয়া'*, কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রর *'চিলে কোঠার সেপাই'*, গান্ধারের *'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'*—এই সব কয়টি প্রযোজনাই নূতন নাট্যভাষার দৃষ্টান্ত। আর এঁর ব্যক্তিগত অভিনয় বৈশিষ্ট্যও একটা নতুন লক্ষণ বলে আগামীতে অনুসৃত হতে পারে। এই গৌতমেরই কাছে শিক্ষিত বহরমপুরের যুগাগ্নি-র নবীন পরিচালক অভিজিৎ সরকারও রাজনৈতিক নাট্যনির্মাণে দক্ষতা দেখিয়েছেন—মুক্তমঞ্চের নাটক *'ঘুমের মানুষ'*, *'আমি মেয়ে'* সমাজের বঞ্চিত মানুষের কথাই বলে এবং যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বলে। সুতরাং বাংলার বামপন্থী থিয়েটার এঁদের হাতে নিরাপদ। এই বহরমপুর শহর একগুচ্ছ নবীন নির্দেশক ষাট-সত্তর-আশির দশকে আমাদের দিয়েছিল। তার মধ্যে অনিল দত্ত, কিশলয় সেনগুপ্ত, অঞ্জন বিশ্বাস, পম্পু মজুমদার, প্রদীপ ভট্টাচার্য, গৌতম রায়চৌধুরী উল্লেখ্য কাজ করেছিলেন, করছেন। এই পরম্পরায় অভিজিৎ সরকার অবশ্যই বিশ্বাস্য।

কলকাতার এই মুহূর্তের আর এক নবীন পরিচালক কৌশিক সেন। পেশাদারি দক্ষতা আয়ত্ত করেছেন চমৎকার। এঁর নির্দেশিত স্বপ্ন-সন্ধানীর প্রযোজনা *'মার্জনীয়'*, *'টিকটিকি'*, *'প্রথম পার্থ'*, *'ওরা তিন বোন'* প্রশংসা পেয়েছে নাট্যপ্রেমী দর্শকদের। এঁর রাজনৈতিক জীবন দর্শনে ইতিবাচকতার লক্ষণ আছে—পরম্পরা অনুসরণে একবিংশ শতাব্দীর বাংলা থিয়েটারকে দিশা দেখাতে পারবেন।

দিশা দেখানোর ক্ষমতা নিয়ে আর একজন নবীন পরিচালক রাজনৈতিক থিয়েটার নির্মাণের দক্ষতা নিয়ে এসেছেন চেতনা গোষ্ঠীর পরম্পরায়। সুমন মুখোপাধ্যায় *'কোরিওলেনাস'*, *'হরিপদ হরিবোল'* ও *'গন্তব্য'* নির্মাণের পর থেমে আছেন কেন বোঝা যাচ্ছে না। এঁর *'গন্তব্য'* এক মূল্যবান নির্দেশিকা আজ ও আগামীকালের।

আগামীকালের দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক ভাবনার এক ফ্যান্টাসি নিয়ে গণকণ্ঠর নবীন নাট্যকার নির্দেশক ব্রাত্য বসু সম্প্রতি যে *'অরণ্যদেব'* হাজির করেছেন, সেই *'অরণ্যদেব'* অনেক প্রচার পেলেও প্রযোজনা হিসেবে অনেকটাই গিমিক। *'অরণ্যদেব'*কে অবশ্য আশির দশকে বাংলামঞ্চে প্রথম হাজির করেন পরমাণু নাট্যদলের শেখর সরকার। তবে এঁর আগের প্রযোজনা *'অশালীন'* দেখে মনে হয়েছে ব্রাত্য থিয়েটারের নিজস্ব শক্তি, থাকবেন বলেই এসেছেন।

থিয়েটারে থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই যাঁরা প্রতিষ্ঠিত সেই তালিকায় ইন্দ্রাশিস লাহিড়ি সবার ওপরে। সেরিব্রালকে নাড়া দিয়েই এঁর অধিকাংশই নাটক বা প্রযোজনা। এঁর রচিত *'বাসভূমি'* তো এই দশকের জনপ্রিয় প্রযোজনা। চন্দন সেন ইন্দ্রাশিসের পূর্ববর্তী নাট্যকার, ইন্দ্রাশিসকে চন্দন সেনের সমান্তরালে রেখেই ভাবতে হয়। ইন্দ্রাশিস এখন সিরিয়ালেও নাট্যকার। তাঁর *'বহিরাগত'* অনুভাষের শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রযোজিত হয়ে এবার নাট্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে নাটক রচনার জন্য। প্রফেশনালিজিমকে যাঁরা জীবনাদর্শ বলেন তাঁদের বক্তব্যই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। নাট্যকর্মী হয়ে সিরিয়াল করতে এসে যারা দুনৌকায় পা রাখছে, তাদের বিরুদ্ধেই এ নাটকের কটাক্ষ। ইন্দ্রাশিস কী আত্মসমালোচনা করছেন? উৎপল দত্ত কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক থিয়েটার বা বাজারি সিনেমা—কোনো ক্ষেত্রেই বহিরাগত ছিলেন না। চার্লি চ্যাপলিন তো তাঁর জনপ্রিয় সিনেমার মধ্যেই ভাবাদর্শের লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। যাক এঁদের সমকালে আরও তিনজন নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায় ও তীর্থঙ্কর চন্দ যথেষ্ট পরিচিত হয়েছেন তাঁদের কাজের দ্বারা।

জেলায় এই সময় খুব ভালো রাজনৈতিক নাটক লিখছেন গৌতম রায়চৌধুরী, নিখিলরঞ্জন দাস, আশিস গোস্বামী, অমিতাভ চক্রবর্তী ও বিজয় ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক থিয়েটার নির্মাণের কাজে আনন, সিউড়ির বাবুন চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। উজ্জ্বল হক বেশ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।

বাংলাদেশেও তরুণ নবীন নাট্যকার নির্দেশক বেশ ক'জন উঠে এসেছেন, আসছেন। এঁদের মধ্যে নির্দেশক সাইদুর রহমান লিপন, নাট্যকার সাইমন জাকেরিয়া, অভিনেতা দিলোয়ার হোসেন দিলু যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাবান।

শতাব্দী শেষের প্রান্তে সাধারণ নাট্যশালা যখন চুনবালি খসে ধসে পড়ছে, এ যেমন বাস্তব ছবি, তেমনই নতুন কয়েকটি নাট্যশালাও নির্মিত হল এই দশকে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। সিরিয়াল কেন্দ্রিক প্রমোদ সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ব্যাপী বাণিজ্যের মধ্যেও পাশ্চাত্যের থিয়েটার যেমন বেঁচে আছে, আমাদের দেশের থিয়েটারও বেঁচে থাকবে।

বেঁচে থাকবে তার বড়ো প্রমাণ থিয়েটার বিষয়ে একসঙ্গে এতগুলি নাট্যপত্রপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ। অবাক হতে হয় কেবল নাট্যসংবাদ নিয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক পত্রিকা *'নাট্যমুখপত্র'* শিব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক *'আননায়ুধ'*, *'নাট্যচিন্তা'* নিয়মিত। নিয়মিত ত্রিমাসিকের মধ্যে *'গ্রুপ থিয়েটার'*, দ্বিমাসিকের মধ্যে *'গণনাট্য'*, ষাণ্মাসিকের মধ্যে *'বহুরূপী'*, বার্ষিকের মধ্যে *'স্যাস'*। এছাড়া আরও প্রায় এক ডজন পত্রিকা যখন এ বাংলা থেকে বেরোচ্ছে, তখন এ বাংলা তথা বাংলাদেশের বিখ্যাত নাট্যপত্র *'থিয়েটার'* রামেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায় নিয়মিত বেরোচ্ছে ২১ বছর ধরে আর সঙ্গে আরো দু-তিনটি পত্রিকা *'প্রসেনিয়াম'*, *'থিয়েটার ফ্রন্ট'*

সম্ভবত এখনও চালু আছে। চালু আছে ডঃ ইনামুল হক সম্পাদিত *'শুধু নাটক'*। ইতিমধ্যে দুই বাংলার থিয়েটারের মধ্যে নাট্যগত আত্মীয়তা গাঢ় করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল *'দুই বাংলার থিয়েটার'*। বেরিয়েছে রোকেয়া প্রাচী সম্পাদিত মূল্যবান মাসিক ট্যাবলয়েড *'নটনন্দন'*। এ দুটি পত্রিকা অবশ্য পরে বন্ধ হয়ে গেছে সম্পাদকদের বেখেয়ালে।

দুই বাংলার থিয়েটারের মধ্যে এই শতাব্দী শেষের ঘণ্টা যখন বাজছে, যবনিকা যখন কম্পমান তখন ও-বাংলার যেমন থিয়েটার প্রযোজনা *'মেরাজ ফকিরের মা'* সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক হিসেবে আমাদের নাড়া দেয় কিংবা নাগরিকের *'খাট্টা তামাশা'*য় দুই বাংলার হৃদয় যখন সন্নিকটস্থ হয়, কিংবা ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনায় সেলিম আল দীনের বর্ণনানাট্যে নিজেদের পরস্পর সন্নিহিত পরস্পরাকে যখন দুই দেশই খুঁজে পাই তখন মনে হয়, বিভাজন কেন, কেনই বা যুদ্ধ—সবই কী ক্ষমতার আস্ফালন নয়?

এই আস্ফালন নিয়ে মৌলবাদী উল্লম্ফন নিয়ে আবার যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুতাকে জিইয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ব্যবহার করতে হয়, তখন মনে হয় আমাদের থিয়েটার কি এই আণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সরব হতে পারে না? যেমন বাদল সরকার হয়েছিলেন *'ত্রিংশ শতাব্দী'* নাটক রচনা করে তেমন সরবতা কি ঘটবে না প্রতিবাদী বাংলা থিয়েটারে? আশার কথা প্রতিবাদী বাংলা থিয়েটারের যবনিকা কম্পমান—গণনাট্য সংঘের স্পন্দন শাখা তার নতুন নাট্যকার সংগ্রাম গুহ ও নির্দেশক সমুদ্র গুহের নেতৃত্বে পোখরান বিস্ফোরণের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছেন *'গ্রাউন্ড জিরো'*-তে তা নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের এ বাংলার প্রতিবাদী থিয়েটার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দুনিয়ার সব মৌলবাদী শক্তিই যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগকে ব্যবহার করে তার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। সেক্ষেত্রে মিথ্যা প্রচারের মিথষ্ক্রিয়ায় মানুষ ভোলে। বিজ্ঞানকেও তারা ব্যবহার করে নির্দ্বিধায়। ১৯৪৫-এর পারমাণবিক বর্বরতার পরেও বোমা দেখিয়ে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দমিয়ে রাখতে হয় তাহলে সেই একই ছেলেমানুষি করেছে আমাদের এই দুই দেশ। *'গ্রাউন্ড জিরো'* পরমাণু তত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ও সাংবাদিকতার প্রকাশিত তথ্যকে ভিত্তি করে দুই রাষ্ট্রের মৌলবাদী কোমর কষাকষির রাজনীতিক মিথ্যাচারকে একেবারে নগ্ন করে তুলে ধরেছে প্রগাঢ় দেশপ্রেমে, বিজ্ঞানের প্রতি দায়বদ্ধতা ও বিশ্ব মানবিকতার প্রতি সুদৃঢ় আস্থা রেখে।

আর তিন মাস বাদে শতাব্দী শেষ হবে। সুতরাং শেষ আশা ব্যক্ত করি—*'রাঙামাটি'*র আত্মসমীক্ষা, *'বনপাংশুলে'*র সমব্যথা, *'গ্রাউন্ড জিরো'*র সাহসিকতা আমাদের এই বাংলা থিয়েটারের যবনিকা কম্পমানের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিক আমাদের একবিংশ শতকে এবং সেই একবিংশ শতাব্দীতে হয়তো বাংলা থিয়েটার থেকেই বিশ্বনাট্য অঙ্গন অনুপ্রাণিত হবে, ঋণ গ্রহণ করবে। সেই দিনই হবে বাংলা থিয়েটারের যথার্থ বিশ্বজয়।

[*শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন*, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ]

আগামী শতাব্দীর থিয়েটার : একটি ইস্তেহার

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গোটা পৃথিবীর তরুণরা স্বপ্ন দেখছে; পৃথিবীটাকে বাঁচাতেই হবে। এই তরুণদের বয়স আঠারো থেকে অষ্টআশি। আর যারা এই বয়সেও তারুণ্যের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত, বুদ্ধিতে নাবালক, বিচারে যুক্তিহীন, বিশ্বাসে সন্দেহপ্রবণ, তারা কেরিয়ারের স্বপ্ন দেখছে—টেকনোক্রেসি ব্যুরোক্রাসি অ্যারিস্টোক্রাসির বাইরে আবার গ্লোবাল ক্রাইসিস কী।

যে তরুণরা স্বপ্ন দেখে তারা গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে ; গল্প উপন্যাসে জীবন যাকে বলে সেই জীবনকে খোঁজে, প্রবন্ধ লেখে; লিটল ম্যাগাজিন বের করে অন্যদের স্বপ্ন দেখায় নিজেরাও দেখে; ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকে গৃহাঙ্গনে নিয়ে আসে; ছাত্র আন্দোলনে শামিল হয়ে দল বেঁধে নিরক্ষরতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যুব আন্দোলনে সংঘ শক্তির শরিক হয়; রাজনীতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের স্বাধীনতা আনে; স্বাধীনতা রক্ষায় অর্থনৈতিক সমতার দাবিতে কম্বুকণ্ঠ হয়ে গর্জন করে; শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে অধিকার আদায় করে, সামাজিক রাজনৈতিক মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার লড়াইয়ের আদর্শকে তার বুকের গভীরে লালন করে। এ ছাড়া এবং এ সব নিয়ে আর কী করে ?

থিয়েটার করে, থিয়েটার নিয়ে বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে পৃথিবীটাকে বাঁচাতে হবে। পৃথিবীটাকে সকলের বাসযোগ্য করার জন্য লড়তে হবে। লড়তে হবে ব্যক্তির জন্য, সমষ্টির জন্য। এবং তার জন্য নাটক লেখে, দল বাঁধে, শিল্পী নির্বাচন করে, মহড়া দেয়, মহড়ায় নাটকের চরিত্র হয়ে ওঠার জন্য সংলাপ মুখস্থ করা থেকে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ, তার সঠিক প্রক্ষেপণ, নাট্যক্রিয়ার অঙ্গ অনুসারে শারীরী গতিশীলতার জন্য মঞ্চস্থানের বিভিন্ন ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তির অনুশীলন সবই করে। করে সঙ্গীতের যথার্থ মাত্রায় প্রয়োগের অনুশীলন, মঞ্চালোক সম্পাতের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবহারের পরিকল্পনা; সামগ্রিকভাবে নাট্যের মঞ্চপ্রয়োগে যেন দর্শকের বিশ্বাস উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত রসসৃষ্টি হয় তার জন্য নিখুঁত প্রস্তুতি। এর পাশাপাশি সংগঠিত শক্তি নিয়ে মঞ্চের তারিখ পাওয়া, বায়নার টাকা জমা, পুরসভার অনুমোদনপত্র নেওয়া, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, কাউন্টারে বসা, টিকিট বিক্রি করা, বিক্রি বাড়লে খুশি হয়ে আর্থিক ক্ষতি কম হবে ভাবা, আর্থিক সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে আমন্ত্রিত শোয়ের জন্য এ পত্রিকা সে পত্রিকার সমালোচকের সঙ্গে খাতির রাখা ও তা ক্রমাগত বাড়ানোর চেষ্টা চালানো, নাট্যদল ও প্রযোজনা দাঁড়িয়ে গেলে সরকারি

অনুদানের জন্য দাদাদের প্রীতিভাজন হওয়া, স্পনসর জোগাড়ের জন্য বড় দাদাদের শরণাপন্ন হওয়া—এত সব ঝক্কি ঝামেলা, সব সত্য হয় যদি প্রযোজিত নাটকটি দর্শক পছন্দ হয়ে যায়, তবেই না নাট্যদলের বুকে ভরসা আসে। আগে বই জমে গেলে বড়দলের ভাঁড়ারেই লাখলাখ টাকা জমত, এখন জেলার ছোটদলের ব্যালান্স সিটেও ৭৪/৭৫ হাজার টাকার হিসেব দেখা যায়।

এই সব কিছু নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার স্বপ্ন দেখে, মানুষের মুখে সে হাসি ফোটাতে পেরেছে, সুতরাং পৃথিবীটা কেবল ভোগবাদী, ধনবাদী সাংস্কৃতির বেওয়ারিশ লুচির ময়দা নয় যে যেমন খুশি দলা পাকিয়ে মিশে যাবে, আর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে আঠারো থেকে অষ্টআশির তরুণের দল। এই ভোগবাদী ধনবাদী সংস্কৃতির পালটা তাই সে জনবাদী সংস্কৃতির পতাকা হাতে নিয়ে ছুটছে মাঠ পাথার বন্দর জুড়ে—কলকাতা থেকে কাবুল, ঢাকা থেকে লন্ডন, বন থেকে প্যারি, নিউয়র্ক থেকে টোকিও, মস্কো থেকে চীন, ফিলিপাইন্স থেকে পার্থেনন-—কোথায় নয়, কিউবা, নাইজিরিয়া, গুয়াতেমালা, ইরান-—সর্বত্র। থিয়েটার আজ অতীতের শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে শাসক প্রভুর বেওয়ারিশ লুচির ময়দা হতে তারা আর রাজি নয়।

এই হল আগামী শতাব্দীর থিয়েটারে আমার ইস্তেহার।

এই আমিটা কে ? এই আমি হলাম পৃথিবীর সেই প্রথম শিকারী। যে পেটের খিধে মেটানোর জন্য দলবদ্ধভাবে শিকারে গিয়ে শিকার নিয়ে ফিরেছি। মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে মৃত পশুটাকে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছি। চামড়া পোড়া গন্ধে ভেতরের লাল মাংসটা গলে নরম হয়ে কেমন একটা সুবাস আসছে। আর আমি দু-তিনজন সঙ্গী নিয়ে সবার হাসিঝরা মুখে আরও উল্লাস আনার জন্য আমার শিকার করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছি অব্যক্ত ভাষায়। গলার রগ ফুলে গেছে, মুখ গলা বুক বাহু বেয়ে ঘাম ঝরছে—আমার হাতে পাথরের ধারালো অস্ত্র। আমি ছুটছি, ঐটুকু গোলাকার জায়গায় ছুটব কী, ছোটার ভঙ্গি করছি আর সামনে দেখছি আমারই এক সঙ্গী কদিন আগের শিকার করা এক পশুর গা থেকে ছাড়ানো রোমশ চামড়া মাথায় চাপিয়ে আমার আগে আগে হা ম বা, হা ম বা-আ রবে ছুটছে। আসলে ও যেন শিকার, আমি যেন শিকারী। অন্য সঙ্গীরা অদ্ভুত আওয়াজ করছে মুখে আর তালে তালে বাজনা বাজাচ্ছে। আমার পায় যেন নাচের ছন্দ ফুটে উঠল, মুখের ভাষায় গানের সুর লাগল, চোখে শিকারকে লক্ষ্যভেদ করার প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠল, মুখে আমার হাসি, শিকারকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছি, হিংস্র আর্তনাদে সঙ্গী শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ও পড়ে গেল আর্তনাদ করে; কাতরাচ্ছে আর আমি ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছি। সবাই হৈ হৈ করে উঠল, আমি বীরের গর্বে উঠে দাঁড়ালাম। কিছু পরে সঙ্গী শিকারীও উঠে দাঁড়ালো। সবাই উল্লাস ভরে আমার শিকার করার ঘটনা দেখল, শিখল কোন কায়দায় আমি আজকের এই পশুটা শিকার করেছি। সবটাই আমি ও আমার সঙ্গী দিনের শিকারের

ঘটনাটা অনুকরণ করে দেখালাম। এটাই আমার এবং আমাদের প্রথম অভিনয় ও পুরো ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োগ। আমাদের এই শিকার কাহিনীর নাট্যবৃত্তটা আজও পাথরে খোদাই হয়ে আছে।

সেই আদিম সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই এই ভাবেই নৃত্য-নৃত্ত-নাটক গড়ে তুলেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাতে কত পরিবর্তন হল। সব পরিবর্তনকে অঙ্গীকার করেই সেদিনও নাটক ও নাট্যমঞ্চের লক্ষ্য ছিল ভয় থেকে অভয়ে মুক্তির দিশা দেওয়া; আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রান্তেও নাটক ও নাট্যমঞ্চের মর্মবস্তু তাই আছে। কেবল কোন শ্রেণী কোন শ্রেণীর স্বার্থে নাট্যানুষ্ঠান করছে তার থেকেই ব্যাখ্যা মিলবে কার ভয় থেকে কার বা কাদের মুক্তি।

বাংলা ভাষায় বলছি বলে বাংলার প্রসঙ্গই টানা যাক। বাংলা থিযেটারের প্রসঙ্গ। লোকনাটক বা সংস্কৃত নাট্য ঐতিহ্যের জের আমরা পরে সংযোজন করেছি। কিন্তু বাংলা থিয়েটার সরাসরি ইউরোপীয় থিয়েটারের ধাঁচেই গড়ে তুলেছি। সে থিয়েটারের বয়স দেখতে দেখতে দুশো বছর হয়ে গেল। গত একবছর ধরে ক্রমাগত দুশো বছরের ঐতিহ্য নিয়েই আলোচনা করছি—আজকের থিয়েটার আগামী দিনে কেমন হবে, পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনমুখী আর্থ সামাজিক রাজনীতির বাতাবরণে কেউ সে কথা বলাবলির ধারে কাছে যাচ্ছি না।

এমন সময়ে ভাবা গেল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও বীরভূমের আনন গোষ্ঠীর যৌথ প্রয়াসে আয়োজিত ২০০ বছর স্মারক উৎসবের এক সেমিনারে। '*২০০ বছরের বাংলা থিয়েটার : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*'। অতীত বলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডঃ বিষ্ণু বসু। বর্তমান প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করেছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়। ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছিলাম আমি সেই প্রথম আদিম শিকারী অভিনেতা।

ভবিষ্যৎ বক্তা বা জ্যোতিষ নন এমন মানুষ যখন ভবিষ্যতের কথা বলেন তখন তাঁরা ইস্তেহারের ভাষায় কথা বলেন।

এই শতাব্দীতেই মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো কথাটার ব্যাপক প্রচলন। কিন্তু কথাটা জন্ম নেয় কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার থেকে বিগত শতাব্দীর মধ্য দশকে ১৮৪৮ সালে। তখন থেকেই ইস্তেহার কেবল কথা নয়, একটা সংকল্প, পৃথিবীটাকে বদলানোর সুকঠিন প্রতিজ্ঞা। অনেক রণ-রক্ত-সফলতা ব্যর্থতার দুনিয়ার গরিব মানুষের জাগরণ, যে জাগরণে সারা ইউরোপ, পরে এশিয়া জুড়ে কমিউনিস্টের ভূত দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে পুঁজির প্রভুরা কিংবা তার বশংবদ সেবকরা।

ইস্তেহার ছাড়া শক্তির ভারসাম্য বদলানো যায় না।

তাই যে থিয়েটার আদিম সাম্যবাদী সমাজে জন্ম নিয়েছিল তাকে মন্দির মসজিদ গির্জাঘরের ঘণ্টা নাড়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলেন ধর্মের পুরোহিতরা গ্রিক ডিথিরাম্ব বা

ইউরোপীয় স্যাটির প্লেজ অথবা ভারতীয় সংস্কৃত নাটকে ব্রহ্মার দ্বরা চতুর্বেদের উত্তর পঞ্চমবেদ সৃষ্টির মাধ্যমে। ভরতের মুখ থেকে আমাদের শোনানো হয় :

ভবদ্ভিঃ শুচির্ভিভূত্বা তথাহবদিত মানসেঃ।
শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সম্ভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ॥

শুদ্ধ ও মনোযোগী হয়ে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত নাট্যবেদের উৎপত্তি শ্রবণ করুন।

পূর্বং কৃতযুগে বিপ্রাঃ বৃত্তে স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
ত্রেতাযুগেহথ সংপ্রাপ্তে মনোর্বৈবস্বতস্য চ॥

হে ব্রাহ্মণবৃন্দ, পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্যযুগ অতিক্রান্ত হলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়।

গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্তে তু কামলোভবশং গতে।
ঈর্ষ্যাক্রোধাভি সংমূঢ়ে লোকে সুখিতদুঃখিতে॥

অতঃপর জনসাধারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে কাম ও লোভের বশীভূত হল, ঈর্ষাও ক্রোধের দ্বারা আক্রান্ত হল, দুঃখেব সঙ্গে মিশ্রিত সুখ লাভ কবল।

দেবদানবগন্ধর্বযক্ষরক্ষো মহোরগৈঃ।
জম্বুদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপাল প্রতিষ্ঠিতে॥

এবং লোকপালগণ কর্তৃক রক্ষিত জম্বুদ্বীপ দেবতা দানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও উরগ পূর্ণ হল। তখন

মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ॥

মহান ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাবৃন্দ ব্রহ্মাকে বললেন আমরা এমন এক আনন্দদায়ক বস্তু চাই যা (যুগপৎ) শ্রব্য ও দৃশ্য।

ন বেদ ব্যবহারোহ্রয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্র জাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম॥

যেহেতু বেদচর্চা শূদ্রগণেব শ্রবণযোগ্য নয়, সেই জন্য অপর একটি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন যা সকল বর্ণের উপযোগী।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কথাতেই স্পষ্ট হয় শ্রেণীবিভাজিত সমাজে উপরতলাসহ নীচের তলা পর্যন্ত শ্রেণীশাসনকে অপ্রতিহত রাখার উদ্দেশ্যেই প্রভু শ্রেণীর দ্বারা থিয়েটারকে তৎকালে ব্যবহার করা হত। এর উদ্দেশ্য ইউরোপীয় চার্চের প্রভুদের তুলনায অনেকাংশে উন্নত। মধ্যযুগে চার্চের গন্ডি থেকে থিয়েটার যখন বেরিয়ে এসে সমাজের ওপরতলার অন্যায় অপকর্মকে ফাঁস করতে লাগল, তখনই ওরা আইনি বেআইনি পথে

থিয়েটারের বিরুদ্ধে হামলে পড়ল। একের পর এক পুস্তিকা বের করে থিয়েটার বন্ধ করার উদ্যোগ নিল। কিন্তু পারল না। থিয়েটার অপ্রতিহত গতিতে মধ্যযুগের সেই বর্বরোচিত আক্রমণ প্রতিহত করে পৌঁছে গেল আধুনিক যুগে।

গ্রিসের ডায়োনিসাস বা এপিডওরাস-এর দিনের বেলার উন্মুক্ত থিয়েটার থেকে চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত রোমান অ্যাম্পি থিয়েটারের যুগ পার হয়ে দেওয়াল ঘেরা দিনের বেলায় অভিনয়যোগ্য শেকসপিয়ার যুগের প্রসেনিয়াম মঞ্চে এসে পৌঁছতে যত সময় লাগুক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই থিয়েটারের এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এবং প্রতিটি পর্বেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে শাসকগোষ্ঠী বিধান প্রণয়ন করেছে থিয়েটারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে, আর সে বিধান ভেঙে জনগণের অভিমুখে থিয়েটারের নিত্য নতুন রূপরীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছেন থিয়েটার সংশ্লিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠী। আর সে আন্দোলন সংগঠনের জন্য কখনও কোনো যুগন্ধর প্রতিভা, কখনও বা কোনো শিল্পীগোষ্ঠী তাঁদেব শিল্পকর্মের বক্তব্য, বিষয় বা আঙ্গিক নিয়ে যে উদ্ভাবনী কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে রসিক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, ব্যাখ্যা করার জন্য পত্রিকা বের করেছেন, পুস্তিকা বের করছেন।

মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে এই রকম উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা ইস্তেহার নামেই পরিচিত; এবং সে ইস্তেহার প্রথম রচনা করেছিলেন কাল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার। ১৮৪৮-এ প্রকাশিত এ ইস্তেহার থেকে দুনিয়া জোড়া শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশ্বের তাবৎ বঞ্চিত শোষিত মানুষের সপক্ষে ছড়িয়ে গেল সাম্যবাদী আন্দোলন। এবং আন্দোলনের তরঙ্গে কেবল শ্রমজীবী মানুষই নয় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত কবি, বুদ্ধিজীবী মানুষরাও শামিল হন। লেখক, শিল্পী, কবি, নাট্যকার, অভিনয়শিল্পী, গায়ক প্রতিটি বিভাগেই রাজনৈতিক বিপ্লবী বাসনা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণের স্থিতাবস্থায় আঘাত হানল। প্রত্যেকেই স্বক্ষেত্রে নতুন কিছু করতে চান।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাহিদা থেকেই কলাশিল্পের জগতে এলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সাহিত্য শিল্পকলার জগতে এমিল জোলা প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারালিজমের সপক্ষে জোরালো সওয়াল করে কেবল নিজের কথাশিল্পই সৃষ্টি করেননি এবং নাট্যকলার জগতে *Le Naturalisme all theatre* বলে এক থিসিস উপস্থিত করলেন ১৮৮১-তে।

সেখানে তিনি বললেন : The impulse of the century is toward naturalism. Today this force racing toward us. is being emphasized. more and more, and everything must obey it. This force has abducted the novel and the drama. The development of the naturalistic force has progressed more quickly in the novel to the point of triumph; on the

stage it is just beginning to appear This was bound to be থিয়েটারের প্রকৃতিবাদ কতখানি অনুপুঙ্খ যথার্থতার সঙ্গে উপস্থিত করা সম্ভব সে বিষয়ে বিরোধী মতাবলম্বীদের সঙ্গে তর্ক করে জোলা তাঁর প্রকৃতিবাদী যথার্থতাকে থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আবার এই প্রকৃতিবাদের উত্তরে সাহিত্য শিল্পে আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে কল্পবাদীদের প্রকাশ্যে লড়াইয়ে নেমেছিলেন এজরা পাউন্ড। Imagisme নামে কল্পবাদীদের একজন কবি হিল্ডা ডুলিটল 'H D Imagiste' বলেই নিজের পরিচয় দিলেন। পাউন্ড ইমাজিজমের সপক্ষে ইস্তেহারও বের করেছিলেন। রেনাতো পগিওলি এই সব আভাগার্দ শিল্পীদের প্রতিটি কাজকর্মের পেছনে তাঁদের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের স্পষ্ট পদপাত লক্ষ করেই বলেছিলেন, এঁরা বুর্জোয়া শিল্পকলার তীব্র সমালোচক, বিপ্রতীপে সংঘবদ্ধ একতার শক্তিতে এঁরা ছিলেন নন্দনতত্ত্বের গেরিলা যোদ্ধা। সমালোচকের এ মন্তব্যে কোথাও অতিরেক নেই। ইমাজিস্টদের হাত ধরেই চিত্রকলার জগতে এসে গিয়েছিল ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, সুররিয়ালিজম, ফবিজিম, ফিউচারিজিম, কিউবিজম। শিল্পকলার জগতে রূপরীতির এই সব তত্ত্বই হাতেকলমে কাজ করার পাশাপাশি ইস্তেহার আর পত্র-পত্রিকার ধুম পড়ে গিয়েছিল। সবই ছিল সামাজিক জীবনে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সৃজনাত্মক আক্রমণ।

জোলার প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সমকালেই সাহিত্য-শিল্পের এইসব আন্দোলনে থিয়েটারেও একের পর এক আছড়ে পড়ে। থিয়েটার হল সর্বগ্রাসী। সর্বভূক অগ্নির শক্তিতে সে সব প্রকাশ মাধ্যমকেই গলিয়ে নিজের সোনা রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফলে পাশ্চাত্য থিয়েটারের বহুজনমান্য জন গ্যাসনারের কথায় সায় দিয়ে বলা যেতে পারে এই বিংশ শতাব্দীর থিয়েটারে দুটি রীতির সহাবস্থান আমরা লক্ষ করলাম। একটি আধুনিক বা modern, অন্যটি আধুনিকতাধর্মী বা modernistic। প্রথম ধারার থিয়েটার বিষয় আঙ্গিক ও রীতির দিক দিয়ে বাস্তবতাবাদী, দ্বিতীয় ধারা কাব্য ও কল্পনাধর্মী। প্রথম ধারা ১৮৭০-এর সময় থেকে রোমান্টিক ও অলীক বস্তুধর্মী নাট্যচর্চাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, আর ১৮৯০ থেকে দ্বিতীয় ধারা থিয়েটারের বস্তুবাদকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তবে রোমান্টিক নাট্যচর্চা বাস্তববাদের আক্রমণে যেমন নির্মূল হয়নি, তেমনই বাস্তববাদী নাট্যধারাকেও স্থানচ্যুত করতে পারেনি নয়া রোমান্টিকতা, প্রতীকীবাদী, প্রকাশবাদী বা কাব্য-কল্পনাধর্মী নাট্যপ্রবণতা। বস্তুত নাট্য রচনারীতি মাত্রই এ শতাব্দী জুড়ে কেবল পরস্পরের সঙ্গে মালাবদল করে গেল।

গ্যাসনার এখানেই থেমে গেছেন পর্যবেক্ষকের ভূমিকা থেকে। আমরা এখানে থামতে চাই না। আমরা দেখছি থিয়েটার চলতি শতাব্দী জুড়ে কেবল রূপের বদল ঘটিয়েই থামেনি— সে চেয়েছে মানুষের আবিষ্কৃত সকল প্রকাশ মাধ্যমকেই আত্মস্থ করে মানুষের জীবনযাত্রায় সংলগ্ন থাকতে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার নিত্যনতুন আবিষ্কারে থিয়েটারকে বারবার মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করতে চাওয়ানো হয়েছে শাসক শ্রেণীকুলের দ্বারা। কিন্তু তাদের সে চাওয়াকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা, তা তাঁরা শিল্পী কলাকুশলী হোন কিংবা আগ্রহী দর্শকই হোন, সবাই মিলে সে চাওয়াকে বারবার বাতিল করেছে এবং করছে।

সেলুলয়েডে গাঁথা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তায় থিয়েটার প্রথমে ধাক্কা খেয়েছিল কিন্তু পরে সামলে নিয়েছে। আজকের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অন্যতম বিনোদন মাধ্যম টেলিভিশন প্রায় প্রতিটি ঘরে ঢুকে পড়েছে, তা সত্ত্বেও থিয়েটার ভেঙে পড়েনি বা উঠে যায়নি; বরং টেলি-সিরিয়ালের সোপ অপেরায় অভিনয় বা প্রয়োগকর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে থিয়েটারের আকর্ষণ বিন্দু হয়ে উঠছে অনেক নাট্যশিল্পী বা নাট্য পরিচালক।

এমতাবস্থায় শতাব্দী অতিক্রম করে যখন একবিংশ শতাব্দীতে পা ফেলতে চলেছে মানুষ, তখন থিয়েটারকেও নিত্য নতুন আবিষ্কৃত প্রযুক্তি কৌশলকে আত্মস্থ করে মানুষের বোধ ও বুদ্ধির সঞ্চালক শক্তি হয়ে উঠতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে কমপিউটারও ব্যবহার করতে হবে থিয়েটারে। কিন্তু মানুষ তো যন্ত্র নয়, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে দিয়েই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষ। মানুষই থিয়েটারের আসল শক্তি।

থিয়েটারের এই শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল বিংশ শতাব্দীতে। ভাক্তানগভ স্তানিস্লাভস্কি আবিষ্কৃত থিয়েটার ভাষার সঙ্গে পিসকাটর, ব্রেশট আবিষ্কৃত থিয়েটার ভাষার বিভাজন রেখাকে মেনে নিয়ে দুই থিয়েটারকেই মানুষ গ্রহণ করেছে। গ্রহণ করেছে অ্যান্টি-থিয়েটারের প্রবক্তা বেকেট, আয়োনেস্কোর নাট্যভাষার সঙ্গে গ্রটোভস্কির পুয়োর থিয়েটারের নাট্যভাষার ভায়া নেগেটিভা-কে। প্রসেনিয়ামের সঙ্গে অ্যান্টি-প্রসেনিয়ামকে। আমাদের দেশেও যাত্রা ভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যভাষার নতুন প্রয়োগকে। রবীন্দ্র থিয়েটারে আবার এই দুই ভাষার মিলনের যে আকুতি ব্যক্ত হয়েছে তাকে যেমন মানুষ আপন করে নিয়েছে, তেমনই গ্রহণ করেছে গৈরিশ থিয়েটারের ছন্দোময় রূপময় ঐশ্বর্যের বিকশিত ধারায় উৎপলীয় বিপুলাকার প্রবল প্রতাপান্বিত নাট্যভাষার দীপ্ত প্রত্যয়কে। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে প্রত্ন থিয়েটারের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য উদ্ধারে যে সযত্ন অনুসন্ধান চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে, তার মধ্যেও বোঝা যাচ্ছে মানুষ চাইছে সরল গ্রাম্য নাট্যভাষার উৎস শক্তির জোরে আগামী শতাব্দীতে পৌঁছতে। তাই ভারতের হাবিব তনবির কিংবা বাংলাদেশের সেলিম আল দীন নাসিরউদ্দীন ইউসুফের উপলব্ধ নাট্যভাষার মধ্যে এ কালের মানুষ চেষ্টা করছে যান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে অযান্ত্রিক হয়ে উঠতে।

আমার তাই দাবি আগামী শতাব্দীতে থিয়েটারটা কেমন রূপ নেবে বা মানুষ তাকে কেমন করে ব্যবহার করবে তা নিয়ে আমাদের থিয়েটারের সকল সৃজনশীল প্রবক্তা কে কেমন স্বপ্ন দেখছেন বা কল্পনা করছেন তা তাঁরা ব্যক্ত করুন তাঁদের নিজস্ব গোষ্ঠী নিজ

নিজ ইস্তেহারে এবং সর্বোপরি দুই বাংলার নাট্য প্রবক্তা-স্রষ্টারা এক মহতী সম্মিলনে সমবেত হয়ে এক যৌথ ইস্তেহার রচনা করুন।

যে ইস্তেহার বলবে আজকের বিশ্বব্যাপী নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মূল্যবোধের প্রত্যয় নিয়ে সংগ্রামের কথা। যেমনটা পিটার ব্রুক বিশ্বব্যাপী আর একটা মহা কুরুক্ষেত্র বাঁধানোর আন্তর্জাতিক যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির বাণী শোনানো ও দেখানোর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন *'মহাভারত'*-এর ধ্রুপদী প্রযোজনা। যে ইস্তেহার স্পেসওয়ারের বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন করবে, যেমনটা করেছেন ব্রুক। পিটার ব্রুক তাঁর থিয়েটারে স্পেসের ব্যবহার নিয়ে অনেক কথা বলেন এবং করেও দেখান। বিশ্ব কিন্তু আজ আসল স্পেস সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের দেশ, আপনাদের দেশ, ওদের দেশ, তাদের দেশ প্রভৃতি ফতোয়ায় আজ সারা বিশ্বে স্থানদখল ও স্থানচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলে, রাজনৈতিক সীমানা ও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রলম্বিত থাকে এক শূন্যস্থান- এক অনন্ত শূন্য স্পেস, সেখানে মানুষ তার বাঁচার তাগিদেই স্থান করে নেয়, আর উৎখাত মানুষের যন্ত্রণায় আর্ত প্রতিবাদ রচনা করার দাযিত্ব তাই থিয়েটারকেই নিতে হয়। সৃষ্টি হয় *'জোছনাকুমারী'*র মতো আধুনিক লোকনাট্যের। যে ইস্তেহার ভোগ্যপণ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষকে বাঁচার পথ দেখাবে, যেমনটা সৃষ্টি হয়েছে মোহরের লোভের জালে বন্দী শিল্পীর আর্ত বেদনাময় মোহমুক্তির গদ্য কাব্যনাট্য *'মোহর'*-এ। যেমনটা সৃষ্টি হয়েছে *'হাতহদাই'*-এর বন্দর থেকে বন্দর ঘোরা মানুষের জ্বালামুক্তির মহাকাব্যে। যে ইস্তেহার বলবে এই সব প্রযোজনাই হবে বিংশ শতাব্দীর অন্তিমপর্বের থিয়েটারি ইস্তেহার। আগামী শতাব্দীর জন্যও নতুন থিয়েটারি ইস্তেহারে তাই রচিত হবে সার্বিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের আহ্বান। সংকীর্ণ গিরিপথে সংকটতারণ মন্ত্রের উচ্চারণ হবে তাই আজকের থিয়েটারের একান্ত জরুরি কর্তব্য যে ইস্তেহার বলবে আগামী শতাব্দীর থিয়েটারে অতীত যুগের মতো মানুষই শেষ কথা বলবে। মানুষ তাঁর নিজস্ব অধিকারে স্বরচিত জগতে প্রকৃতির প্রতিভূ; মানুষ মানুষের জন্য।

মানুষের দৃষ্টিতে আছে সৌন্দর্য, শ্রুতিতে থাকছে ছন্দোবোধ, বাকে থাকবে সত্য। দেহে থাকছে শক্তি, মনে থাকবে অপার সহানুভূতি, মননে থাকবে যুক্তি। স্বপ্নে থাকছে কল্পনা, ভাবনায় থাকবে নিয়ত সৃজনশীলতা। তাহলেই থিয়েটার হবে আমার আপনার সকলের। থিয়েটার হবে জনগণের।

[*দুই বাংলার থিয়েটার*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৯৭]

একুশ শতকে
বাংলা থিয়েটারের অভিমুখ কোনদিকে

একুশ শতকে বাংলা থিয়েটারের অভিমুখ কোনদিকে এগোবে, এ কথাগুলি যখন ফেলে আসা শতাব্দীর অন্তিম সময়ে এ বাংলা বা ও বাংলার দু-একটা সেমিনারে আলোচনায় উঠে আসছে, বা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি চলছে, তখনই দুই বাংলা জুড়েই একুশ শতকের বাংলা থিয়েটারের অভিমুখ কোন পথে এগোবে তার যেন একটা আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল : একুশ শতকের বাংলা থিয়েটার শাসন করবে তরুণরা, একুশ শতকের বাংলা থিয়েটারে নেতৃত্ব দেবে মহিলারা। আর এখন এই একুশ শতকে প্রবেশের পব দেশ-জোড়া সার্বিক সংকটের মধ্যেই সেই আভাস যেন স্পষ্টতর করে তুলেছে এপার বাংলা ওপার বাংলার কতিপয় তরুণ শিল্পীর কাজকর্ম, কিংবা প্রবীণ ও নবীন মহিলা শিল্পীর নবীন নাট্যনির্মাণ। এ ছাড়াও বড় কথা দেশ যখন দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর হাতে পড়ে প্রায় দেউলিয়া, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেশের মানুষজন, সহায় সম্পদ; বিরাষ্ট্রীয়করণের যজ্ঞ চলেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদের; তখন বামপন্থী আন্দোলনেব বাংলাতেও থিয়েটারে যেন বিরাজনীতিকরণের ছোঁয়া লেগেছিল প্রবীণ পরিচালকদের নাট্যনির্মাণে, দুদশকের মধ্যবিত্তের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনেব চোঁয়া ঢেঁকুরে; আত্মসমালোচনার নামে বামপন্থীদের হেয় করার তৃপ্তিতে, সেই অবস্থাকে কাটিয়ে রাজনীতিক প্রতি-আক্রমণের বামপন্থী থিয়েটার নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন তরুণ নাট্যপরিচালক, নাট্যকাররা। পশ্চিমবাংলার নাট্যচর্চায় তিনটি স্তরে নাট্যাভিনয়েব আয়োজন চলছে বিগত শতাব্দীর অর্ধশতক জুড়ে। এক, কলকাতা বা জেলা শহরের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে প্রসেনিয়াম থিয়েটার। দুই, জেলা মফস্বল বা শহরতলির অজস্র ছোটো ছোটো নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজিত একাঙ্ক নাটক; যা প্রায় সারাবছর ধরেই (শীতকালে বেশি), প্রতিযোগিতা মঞ্চে অভিনীত হয়। তিন, পথনাটক, বা মুক্তাঙ্গন নাট্যচর্চায় অংশগ্রহণকারী রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন দলের সক্রিয় সৃজনশীলতা।

এই তিনটি স্তরেই এই শতকে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি অবশ্য উল্লেখ্য নাট্যনির্মাণ, যার নিরিখেই এই শতকের বাংলা থিয়েটারের অভিমুখকে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারছি। এবং, সে অভিমুখ বাংলার প্রতিবাদী থিয়েটারের ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই নতুন নাট্যভাষার সন্ধানে রত বলে আমরা মনে করি।

সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে চাই, পাশ্চাত্য খোলস ছেড়ে বাংলা নাটক ও নাট্যকলা লোকসমাজের মধ্যে থেকেই তার আঙ্গিক ও বিষয়কে বেছে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে

চাইছে। যদিচ চাওয়াটা অনেক দিনের, সেই শুরুর যুগে থেকেই চেষ্টা চলছে; কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যকলার আঁটোসাঁটো সম্মোহনী চাকচিক্যের কাছে লোকনাট্যকলার অনাড়ম্বর সহজ সাবলীলতা কোনো গুরুত্ব পায়নি উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত নাট্যপ্রয়াসীদের চিন্তাচেতনায়। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের গিরিশচন্দ্র, বিশ শতকের প্রথমার্ধের রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার, পরার্ধের উৎপল দত্ত ও শম্ভু মিত্র—এই পঞ্চরথীই সচেষ্ট ছিলেন লোকনাট্যের উপাদান বা আঙ্গিক বিন্যাসের ঢংয়েই বাংলার নাট্যকলার মুক্তি নির্দেশ করতে। এ ক্ষেত্রে কেউই পুরো সফলতা অর্জন করেননি, এমনকী রবীন্দ্রনাথও। তা সত্ত্বেও চেষ্টা থেমে থাকেনি। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের পরে বাদল সরকার তাঁর অঙ্গন মঞ্চ বা তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকে বদ্ধমঞ্চের পরিবর্তে মুক্তাঙ্গনকে বেছে নিয়েছিলেন, বাদলবাবুর পর প্রবীর গুহ, তরুণ প্রধান প্রমুখ একাজে এখনও তন্নিষ্ঠ। এ বাংলার এইসব প্রয়াসের পাশে ওপার বাংলার তথা স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যভাষা আবিষ্কারের প্রেরণায় সেলিম আল দীন যে বর্ণনানাট্য বা কথানাট্যের আঙ্গিকে নাটক রচনা করে চলেছেন এবং সেইসব এপিকধর্মী নাটককে মঞ্চের মধ্যে থেকে একেবারে প্রেক্ষাগার পর্যন্ত বিস্তৃত করে, নাট্যনির্মাণের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, বিপ্লব বালা প্রমুখ করছেন, যার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছেন প্রবীণ নাট্যকার নির্দেশক মামুনুর রশীদ, এস এম সোলায়মান প্রভৃতি। মামুনুরের *'জয়জয়ন্তী'*, সোলায়মানের *'আলাল দুলালের পালা'* তার দৃষ্টান্ত। এ সব প্রয়াসের তুলনা এ বাংলায় এখনও নেই বলে আমরা যে হীনম্মন্যতায় ভুগছি তা কিন্তু নয়, বরং বাংলাদেশের এই যে নিজস্ব নাট্যনির্মাণ, এ যে আমাদের দুই বাংলার মধ্যেই সঞ্চারিত।

এমত পরিস্থিতিতে একুশ শতকের বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী ঐতিহ্যের নতুন নাট্যনির্মাণ নিয়ে হাজির হয়েছে যে থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম, খড়দহের একটি ছোট্ট নাট্যদল, মুক্তাঙ্গন রীতির নাট্যআঙ্গিকে তারা বামপন্থী রাজনৈতিক থিয়েটারের যেন এক নতুন দিশা। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের বাবরি মসজিদ ভাঙা, পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো, কার্গিল সেক্টরে দেশপ্রেমের যুদ্ধের মহড়ায় পাঁচশোর ওপর তরুণের আত্মবলিদানের আবেগে দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র নীরবে মেনে নেওয়ানো, জাতপাত ধর্মের অজুহাতে একের পর এক গণহত্যা, বিধর্মী হত্যার বিরুদ্ধে এমন স্পষ্ট রাজনৈতিক আক্রমণ, থিয়েটারের ভাষায় না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। তরুণ পরিচালক দেবাশিস রায় এবং তার সহযোগী শিল্পীবৃন্দ রাজা ভট্টাচার্য, চিরদীপ চৌধুরী, প্রলয় চক্রবর্তী, মনোজ মণ্ডল, বিক্রমজিৎ রায় প্রত্যেকে এক-একজন সুদক্ষ অভিনেতার সুসমন্বিত এই নাট্য নির্মাণের নাম *'তুমি কী করেছো'*। এই থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের মতোই অন্বীক্ষা (অশোকনগর), অনার্য (সল্টলেক) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সংস্থা দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে পথনাটকের প্রাঙ্গণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার

মধ্যে পুরোনো নাট্যদল অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার প্রবীর গুহের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেছে বিশ্বায়ন-বিরোধী নাটক *'তৃতীয় যুদ্ধ'*। তৃতীয় যুদ্ধ উদ্‌ঘাটন করছে সেই সত্য যে বিশ্বায়নের আগ্রাসী থাবায় দেশীয় সংস্কৃতি, আচরণ ভাষা সব নষ্ট করে জন্ম নিচ্ছে এক কালাপাহাড়। সেই কালাপাহাড়ী রাজনীতির বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে তৃতীয় যুদ্ধ শুরু করবে সাধারণ মানুষই। অনবদ্য এক নাট্যপ্রয়োগ। রাজনীতি ও শিল্পের চমৎকার সংযোগ। কাঁচরাপাড়ার পথসেনার বিস্ময়কর রবীন্দ্রনাট্যনির্মাণ হল *'রক্তকরবী'*-র মুক্তাঙ্গন-অভিনয়। এ প্রযোজনা বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের সৃষ্টি হলেও পুরো একুশ শতক জুড়ে সচেতন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। *'রক্তকরবী'*-র এই মঞ্চায়ন দেখলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ বিগত শতাব্দীতে এই মঞ্চরূপটির কথা ভেবেই যেন নাটকটি লিখেছিলেন। পথসেনা নিয়মিত পথনাটকই করে, এদের রাজনৈতিক শ্রেণীচক্র চিহ্নিতকরণে কোনো আড়াল-আবডাল নেই। কোনোরকম আড়াল আবডালের পক্ষপাতী নয়, এমন দুটি নাট্যগোষ্ঠী হল বহরমপুরের ঋত্বিক আর যুগাগ্নি। এঁরা মঞ্চনাটকের সমান্তরাল পথনাটক বা মুক্তাঙ্গন নাট্যচর্চায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস রাখে এবং প্রতিটি নাট্যনির্মাণে সঠিকভাবেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চিহ্নিত করতে পারে। ঋত্বিকের পূর্ণাঙ্গ *'সীমা চৌহদ্দি'*-র পর পথনাটক হল গান্ধী হত্যার রাজনীতি নিয়ে *'৩০শে জানুয়ারি বা বাপুজী'*, ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে *'বিপন্ন ভূমে'* এবং বিশ্বায়নের সংস্কৃতি নিয়ে *'সাগরপারের রাজকন্যা'*। যুগাগ্নি-র মঞ্চনাটক *'মা অভয়া'*র পর *'তিন পয়সার পালা'*, আর পথনাটক হল *'হত্যারে'*, *'আমি মেয়ে'* এবং *'ঘুমের মানুষ'*। এই পথনাটক তিনটির বিষয়বস্তু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর নেপথ্য রাজনীতি, নারীমুক্তির দিশা নির্মাণ, আর শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। এবং প্রতিটি নাটকই শিল্পনির্মিতি হিসেবে অনবদ্য। এর পাশে ঊষা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে রঙ্গকর্মীর মুক্তাঙ্গন নাটক *'মইয়াত'* এবং *'ইন্সপেক্টর মাতাদীন চাঁদপর'* সামন্ত শোষণ ও ধনবাদী ভ্রষ্টাচারকে উন্মোচন করার এক শক্তিশালী নাট্যনির্মাণ। অঞ্জন দেবের নির্বাক অভিনয় আকাদেমির *'জয়গুরু'*ও উল্লেখ্য কাজ। আমাদের বামপন্থী সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের উচিত এই সবকটি পথনাটক বা মুক্তাঙ্গন নাট্যরীতির নাটকেরই সিনেমাটিক ভিডিও নির্মাণ করে দূরদর্শনের চ্যানেলে দেখানো।

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী উপরোক্ত নাট্যনির্মাণের মধ্যে সমকালীন আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের চমৎকার প্রতিফলন দেখা যায় নির্মিত নাটকগুলিতে।

অতি সম্প্রতি যে নাটকটি দর্শকের মর্মমূলে গিয়ে ঘা দিচ্ছে সেটি হল গৌতম চক্রবর্তীর রচনা। রঞ্জন রায়ের পরিচালনায় আরোহী, ব্যান্ডেলের নাট্যনির্মাণ *'ছেঁড়া ক্যানভাস'*। কেন্দ্রে বিজাতীয় বি জে পি আসার পর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী শিল্পনির্মাণ প্রচেষ্টার ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ যেন এখনকার অনিবার্য ঘটনা। ধর্মে মুসলমান বলে শিল্পী ফিদা হুসেনের উপর আক্রমণ, পাকিস্তানের সঙ্গীতশিল্পী গুলাম

আলির অনুষ্ঠান পণ্ড করা, শিল্পী যতীন দাসের প্রতিবাদী ক্যানভাস নষ্ট করা, দীপা মেহতার *'ওয়াটার'* চলচ্চিত্র নির্মাণ ভণ্ডুল করা ইত্যাকার ঘটনার প্রেক্ষিতে শিল্পী ভানুপ্রতাপ সিংহের স্টুডিওতে কেন লাঞ্ছিত এক পথনারী সাবিত্রী তার সঙ্গীসাথীসহ আশ্রয় পায় এবং কেনই বা ওই পথনারী সাবিত্রীর মুখকে মডেল করে ভানুপ্রতাপ তাঁর দেবীমূর্তি আঁকার প্রেরণা পায়, শিল্পীর এই স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে এগিয়ে আসে প্রভাবশালী সেই হিন্দুত্ববাদী শক্তির প্রতিনিধি পুরন্দর; ভানুপ্রতাপের স্টুডিও ধ্বংস করে দেয় সে। ধ্বংস করে দেয় পথবাসীদের জন্য সাবিত্রীর অন্নসত্র। নাটক রচনা, চরিত্র নির্মাণ এবং সংলাপ যেমন জোরালো, তেমনি প্রযোজনাও আবেগদীপ্ত অভিনয়, কম্পোজিশন, মঞ্চসজ্জা, সঙ্গীত প্রয়োগ ও আলোক প্রক্ষেপণে দর্শকমণ্ডলীকে আবিষ্ট করে রাখে। এমন রাজনৈতিক একাঙ্ক প্রস্তুতির ক্ষমতা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নানান নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যেই অল্পবিস্তর সক্রিয়, তবে একুশ শতকের প্রথম বছরের প্রযোজিত সব একাঙ্কের মধ্যে আবোহী-র *'ছেঁড়া ক্যানভাস'* নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অন্তত এর অভিঘাত কোনো সচেতন বামপন্থী মানুষজনকেও নাট্য-বিন্যাসের যুক্তিতে তাদের কৃত অপরাধের জন্য আফশোশ করতে বাধ্য করে এবং বাস্তবে তা দেখাও গেছে।

প্রতিযোগিতা মঞ্চের অপব সেরা প্রযোজনা যা বিগত ১৯৯৯-এ মঞ্চস্থ হয়েছে এমন নাট্য প্রযোজনার মধ্যে হাওড়ার বর্তিক প্রযোজিত সিদ্ধার্থ সেনগুপ্তর রচনা নির্দেশনায় *'প্রসঙ্গ পোখরান'* বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের সমসাময়িকতায় প্রতিবাদী তাৎপর্য পায়। অবশ্য এই বিষয় নিয়ে কলকাতা বা জেলার মঞ্চে গণনাট্য সঙ্ঘের এক নতুন সংগঠন স্পন্দন শাখা অসাধারণ নাটক *'গ্রাউন্ড জিরো'* শাসক শ্রেণীব মনেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণার শিল্পায়ন গোষ্ঠী *'মালাডাক'* প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারকে আক্রমণ করে যত না সাড়া ফেলেছেন, তার চেয়ে সাডা পড়েছে প্রয়োগ বৈচিত্র্যের নতুনত্বে। প্রায় কোনো নাট্যকাহিনী ছাড়াই কেবল দীপা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ও সঙ্গীত প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রযোজনাটি বাঁধা হয়েছে। হালিশহরের ইউনিটি মালঞ্চ *'হনুয়া কা বেটা'* থেকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সম্প্রতি বিজয় ভট্টাচার্য রচিত দেবাশিস সরকার নির্দেশিত *'উজানগাঙে'* অভিনয়ে ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে 'বাজার' অর্থনীতির আক্রমণে গ্রামীণ লোককলাকার কীভাবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন, তার চমৎকার উদ্ঘাটন ঘটিয়েছেন। তবে নাট্যবস্তুতে লোকশিল্পীর আত্মহত্যার কোনো বাস্তব সমর্থন নেই আমাদের এই সমাজে। ৪০-এর দশক থেকে দেখা গেছে গণনাট্যের আয়োজনে ও উদ্যোগে যেসব লোককলাকার নগর জীবনের খ্যাতি প্রতিপত্তির সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর একটা অংশ যেমন আদর্শ আঁকড়ে গণনাট্যের পতাকা তলেই নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন, যেমন নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল প্রমুখ; তেমনই আর একটা অংশ যাঁরা নগরজীবনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ভোগসুখেব কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন (তাঁদের কারও নাম করা যাবে না), কিন্তু তাঁরা কেউ আত্মহত্যা করেননি, করেন না, ভোগের চরমসীমার সন্ধানে আজও তাঁরা লালায়িত।

এই গ্রামীণ জীবনের সংকট, আত্মবিশ্বাস-প্রেম-ভালোবাসার ওপর যখন সামন্ত প্রভুর আক্রমণ নেমে আসে, তখন তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়েই সাজু রূপাইয়ের সংসার ভাঙে—এ সত্যসন্দর্শন আজ থেকে ছয় দশক আগে জসীমউদ্দীনের *'নক্সীকাঁথার মাঠ'*-এ যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই এ যুগেও ওই নক্সীকাঁথার মাঠ গড়ার যেন নতুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে কেশপুর, গড়বেতা, নানুরের জমিতে। বিগত ছয় দশকে যে সামন্ত শাসনকে পশ্চিমবাংলার মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে কৃষক ও দিনমজুরের জমির লড়াই, অপারেশন বর্গার সরকারি ব্যবস্থায়, সেই মৃত, ঘুমন্ত সামন্ত স্বার্থকে আজ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের লেজুড়বাহিনী পশ্চিমবাংলার ভাঙাচোরা কংগ্রেস। এমন ঘটনা যেন সংস্কৃতি বা নাট্যকর্মীরা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন, ঘটতে পারে। তাই বিগত শতকের অন্তিম পর্বেই গ্রামীণ জীবনের লোকগাথা অবলম্বনে বর্ণনা নাট্যের রীতিতে (যে রীতি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নাট্যজগতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে) জসীমউদ্দীনের *'নক্সীকাঁথার মাঠ'* অবলম্বনে হাবড়ার জনজাগরণী *'কান্দে ইচ্ছানদী'* নামে এক পরম উপভোগ্য মর্মবিদারী পালা-নাটক উপস্থাপিত করেছেন। অসাধারণ কোরিওগ্রাফি ও কম্পোজিশনে কবিতাকে কোরাসের কণ্ঠে বসিয়ে কিংবা কখনো সাজু বা রূপাই-এর কথাকে সংলাপে বেঁধে নাট্যনির্মাণ করেছেন দেবব্রত দাস। কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রও গৌতম হালদারের নির্দেশনায় *'নক্সীকাঁথার মাঠ'* পূর্ণাঙ্গরূপে মঞ্চস্থ করেছেন, কিন্তু এ প্রযোজনায় সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে জসীমউদ্দীনের মর্মবিদারী আক্রমণ প্রায়শ অনুপস্থিত এবং সমগ্র প্রযোজনাটি জন-জাগরণীর *'কান্দে ইচ্ছানদী'*-র তুলনায় শিথিলভাবে গ্রন্থিত এবং সঙ্গীত বা পদ্যের আবৃত্তিতে সুরের বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। মজার কথা *'নক্সীকাঁথার মাঠ'* প্রযোজনায় বীরভূমের নাট্যসারথিও এগিয়ে এসেছে। এমন একটি বর্ণনাধর্মী কাব্যকে নাট্যআঙ্গিকে পরিবেশন প্রবণতার মধ্যে আমরা খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করছি বাংলাদেশের বর্ণনাধর্মী নাট্যচর্চার প্রত্যক্ষ প্রেরণা। তবে ও বাংলায় যেমন এই ভঙ্গির নাট্য নিবেদনে বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব নেই এবং নাট্যকার সেলিম আল দীন এখন একা নন। আফসার আহমেদ, লুতফর রহমান, বিপ্লব বালা, সাইমন জাকারিয়া, সাইদুর রহমান লিপন প্রমুখ এগিয়ে এসেছেন; আমাদের পশ্চিমবাংলার নাট্যজগতে লোকায়ত ভঙ্গির নাট্যনিবেদনে বিভাস চক্রবর্তীর *'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'*-র বিরাট সাফল্যের পর এখনও পর্যন্ত এই *'নক্সীকাঁথার মাঠ'* প্রযোজনা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ দেখা যাচ্ছে না। তবে এই অভিমুখে এগোনোর লক্ষণে বাংলা থিয়েটার হয়তো একদিন পাশ্চাত্য থিয়েটারের প্রভাবমুক্ত দেশজ থিয়েটার গড়ে তুলতে পারবে এই একুশ শতকেই।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রত্যক্ষ রাজনীতি নিয়ে নাটক করার পাশাপাশি গ্রামজীবনে কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নাটক গত শতাব্দীর শেষ দশকে প্রায় লোপ পেয়েছিল, আবার ফিরে আসছে শ্রেণীসংগ্রামের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

থেকেই। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নানান ধরনের আক্রমণ নেমে আসছে, তার একটা হল রাষ্ট্রীয় কলকারখানা বন্ধ করা, বিক্রি করা আর গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে শ্রমিক ছাঁটাই। ট্রেড ইউনিয়নের ওপর এই আক্রমণকে মোকাবিলা করার প্রেক্ষাপটে কাঁচরাপাড়া রেলশ্রমিক এলাকার সংগঠন ফিনিক মঞ্চস্থ করছে *'ভয়'*। শান্তনু মজুমদারের এ নাটকে গঠনগত ত্রুটি এড়াতে পারলে এটি ভালো প্রযোজনা হতে পাবত। *'ভয়'* যেখানে নাট্যগ্রন্থনায় দুর্বল, পরবর্তী প্রযোজনা *'রামচরিত মানস'* ধর্মীয় রাজনীতিক ভ্রষ্টাচার নিয়ে সেখানে এক অসাধারণ নাট্যনির্মাণ। এ কয়টি উল্লেখ্য সৃষ্টির পাশে তরুণ নাট্যকার সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, বিজয় ভট্টাচার্য, সুব্রত কাঞ্জিলাল, অসীম ঘোষ, প্রভাকর চক্রবর্তী, মুরারি মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজা গুহ, সমীর সেনগুপ্ত, তীর্থঙ্কর চন্দ, স্বপন দাস, শিব মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, উদয়নীল ভট্টাচার্য, শংকরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অবদান এই সংকটকালে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছে, করছে। এঁদের কাছেও একুশ শতকের অনেক প্রত্যাশা।

এইভাবে মফস্বল বাংলার প্রতিযোগিতা মঞ্চ কিংবা মুক্তাঙ্গন মঞ্চ রাজনৈতিক থিয়েটারের যে ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলছে, সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই সময়োপযোগী পূর্ণাঙ্গ বচনা ও প্রযোজনার দায়িত্ব বহন করছে কিন্তু খুব কম নাট্যকার এবং দল; পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনার সময় অধিকাংশেরই লক্ষ্য ধ্রুপদী নাট্য বা অরাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কলকাতার মতো ঘরবন্দী জনপ্রিয় নাটক জমানোর ঝোঁক। তবু তার মধ্যেই বহরমপুরের গৌতম রায়চৌধুরীর *'সীমা চৌহদ্দি'*, *'আত্মবিম্ব'*, প্রদীপ ভট্টাচার্যের *'মায়া'* ও *'স্বেচ্ছাসৈনিক'*, হাওড়ার নটধার শিব মুখোপাধ্যায়ের *'মহাভারত'* সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের *'খারিজ'* ও *'পত্রশুদ্ধি'* গ্রামীণ জীবনের শ্রেণীশোষণের প্রতি ব্যঙ্গমধুর কশাঘাত। মফস্বলের পূর্ণাঙ্গ প্রযোজকদের মধ্যে সোনারপুরের কৃষ্টিসংসদ বা বীরভূমের আনন সামর্থ্য রাখে একুশ শতকের সংকটকে মোকাবিলা করার। এ সবের পাশে রয়েছে ব্রেখট জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ব্রেখটের নাটক মঞ্চস্থ করে ধ্রুপদী বর্তমানকে ছোঁয়ার আকুতি-প্রকাশ। এর মধ্যে বহরমপুরের যুগাগ্নির *'মা অভয়া'*-র পর *'তিন পয়সার পালা'* বা গোবরডাঙার নকশা-র *'খড়ির গণ্ডি'* প্রযোজনা খুবই উন্নতমানের কাজ বলে স্বীকৃত। চন্দন সেনের চাকদহের হযবরল-র কোনো প্রযোজনাই আজকাল ঘরের বাইরে বেরোতে চায় না; *'অনিকেত'*-এর জনপ্রিয়তার, *'ফিরে এসো প্রেম'* প্রায় যীশুখ্রিস্টের মতো মানবপ্রেমের বাণিজ্যে মজতে চাইছে। তবে মফস্বলের পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা রাজনীতি বিমুখ হলেও ঐতিহ্যভ্রষ্টের চোঁয়া ঢেঁকুর বাজার গরম করতে চায় না। অন্তত আত্মসমালোচনার নাম করে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার কোথাও নেই।

মফস্বল বাংলার পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে প্রধান যে অরাজনৈতিক

প্রবণতা ফুটে উঠেছে বিগত শতাব্দীর শেষের দশকে, সেই একই প্রবণতা কলকাতার থিয়েটারের যেন-বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কোনো ঝুঁকি না নেওয়া। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারকে দেখেও না দেখা, বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী থাবার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ না করা। পরিবর্তে থিয়েটারে বিনোদনী বোকাবাক্সকে অনুসরণ করা। আর পারলে আত্মসমালোচনার নামে বাম মতাদর্শকে হেয় করা।

ব্যাপারটা এই রকম। ১৯৮৮-৮৯ সালে সোভিয়েত প্রতিবিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার যেন উৎসব লেগে গিয়েছিল যে কমিউনিজমের দিন শেষ, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া খতম সুতরাং দুনিয়া এখন একটাই—ধনতান্ত্রিক দুনিয়া। আর অনগ্রসর অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলির তৃতীয় বিশ্ব বলার কোনো অর্থই হয় না। সবটাই এক বিশ্ব। বিশ্ব ধনবাদী ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির জালে ওই দরিদ্র অনুন্নত দেশসমূহকে বেঁধে ফেলে এক বিশ্বের স্লোগানকে বড় করা হল। আর আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার নানান রঙের রাজনীতিক দল আর মিডিয়া, উঠেপড়ে লাগল দেশের বৃহত্তর জনগণের সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন ভেঙেচুরে তছনছ করতে। ফলত এই সময় বা কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল কলকাতার থিযেটারে বামপন্থীদের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি খোঁজা, অসঙ্গতির সমালোচনা করা। এদের মধ্যে কেই কেউ চাওয়া-পাওয়া বা হতাশার হিসেবের ওপর দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ অবৈরিতামূলক সম্পর্কের অবস্থান থেকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের অবস্থানকে ঘোরাতে চাইলেন। মধ্যবিত্ত নাগরিক দর্শকমণ্ডলীর একটা বড় অংশ যারা জাত প্রতিক্রিয়াশীল '৭২ থেকে '৭৭ সালের কংগ্রেসি স্বৈরশাসনের সন্ত্রাসের দিনে মুখে কুলুপ মেরে বসেছিল, উপরন্তু সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিবাদ জানানোর স্বাধীনতা সবারই আছে মনে করে একটা বামবিরোধিতা শুরু করে তীব্রভাবে চাওয়া-পাওয়ার হিসেবের জমি থেকে। এর সঙ্গে মিডিয়ার প্রশ্রয় তো আছেই।

বিগত দশকে এ ছাড়া যাঁরা বামপন্থী মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে থিয়েটার করে আসছিলেন দীর্ঘদিন, তাঁদের কয়েকজন মুখ্যস্রষ্টা দেহান্তরিত হলেন, যেমন উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিররঞ্জন দাস, জোছন দস্তিদার। প্রবীণ নাট্যকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা লিখছেন কম; সাংগঠনিক, রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত বলে। ফলে বামপন্থী থিয়েটারের শক্তি কমে এলো। ইতিমধ্যে বামপন্থী মতাদর্শ বা তাদের কর্মসূচির বিরোধিতা না করার অবস্থান থেকে বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী যেমন ধ্রুপদী নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেন, তেমনই অনেক দল মানবিক সম্পর্কের মূল্যায়নকে ভিত্তি করে, অরাজনৈতিক মূল্যায়নকে ভিত্তি করে অরাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করায় ব্রতী হন। এবং সবারই প্রায় লক্ষ্য প্রযোজনাকে জনপ্রিয় করা। যদি একবার কোনো প্রযোজনা লেগে যায়, তবে সেই একই বিষয় ও রীতি ধরে পরবর্তী সব প্রযোজনাকে সাজানো। তবুও এরই মধ্যে ভিন্ন মাত্রা বা স্বাদ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ পরীক্ষা-

নিরীক্ষায় ব্রতী হয়ে যাঁরা সফল হয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল বিভাস চক্রবর্তীর *'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'*, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর *'সধবার একাদশী'*, *'মোহর'*, তরুণ পরিচালক গৌতম হালদারের *'মেঘনাদবধ'*, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'তপস্বী তরঙ্গিনী'*, তরুণ পরিচালক কৌশিক সেনের *'প্রথম পার্থ'* প্রভৃতি।

বিগত শতকে এই সময়কালে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক যেসব হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মনোজ মিত্রের রচনা ও প্রযোজনার। *'শোভাযাত্রা'*, *'গল্প হেকিম সাহেব'* ও *'ছায়ার প্রাসাদ'* নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের জনকল্যাণমূলক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন ও প্রশ্রয়ে সৃষ্ট বলে আমরা মনে করি। উৎপল দত্তের পর এ সময়কার এতবড় ইতিবাচক নাট্যকার আর একজন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দায়বদ্ধতা আছে বাম মতাদর্শের সঙ্গে। একদা 'রাজগুরু'-র পর বিগত দুই দশকে *'স্বদেশী নকশা'*, *'মহাকালীর বাচ্চা'* তাঁর অনন্য সৃষ্টি। সম্প্রতি *'গজানন চরিত মানস'* কিংবা ছোটনাটক *'কাল বা পরশু'*-তে সময়োচিত দিশা দিতে পেরেছেন ভালোই। *'জন্মদিন'* রাজনীতিক নাটক না হয়েও মানুষের ইতিবাচক ক্ষমতার এক দীপ্ত প্রতিজ্ঞা। মোহিতের সঙ্গে *'জন্মদিন'*-এর অপর স্রষ্টা অসিত মুখোপাধ্যায়ের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। তাঁর অকাল প্রয়াণ আমাদের থিয়েটারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে গেল। এই সময়কালে রাজনৈতিক মূল্যবোধেব এক উল্লেখযোগ্য ভিন্নতর রূপ ধরা পড়েছে বিভাস চক্রবর্তী পরিচালিত নান্দীপটের *'মত্যু না হত্যা'*-র ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে। দাবিও ফো অবলম্বনে নান্দীপটের এ এক অনন্য সৃষ্টি। ১৯৯৯-র শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা এটি। দেবাশিস মজুমদারের *'রাঙামাটি'*ও শোষণ ভিত্তিক সমাজে মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতারণার প্রতি তীব্র ধিক্কারে উজ্জ্বল। তরুণ নাট্যকার নির্দেশকের মধ্যে কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের *'শূদ্রায়ন'* মূল্যবান কাজ। *'শূদ্রায়ন'* পরবর্তী প্রযোজনা *'কালচক্র'*, *'হায় রাম'* আরও মূল্যবান।

এরপব পশ্চিমবাংলার থিয়েটারে পরিচালকদের মধ্যে ঊষা গাঙ্গুলি নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। তাঁর রাজনৈতিক নাট্যনির্মাণের সংলাপের ভাষাটুকুই হিন্দি, বাকি সবটাই পশ্চিমবাংলার নিজস্ব অভিজ্ঞতায লালিত। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই তাঁর বিচরণ, দীর্ঘস্থায়ী মৌলিক কতগুলি ইস্যুর ওপরই ঊষার রঙ্গকর্মীদের আলোকপাত। ঊষার পাশে তরুণ প্রতিভাবান উঠতি পরিচালকদের মধ্যে সুমন মুখোপাধ্যায়ের *'গন্তব্য'*-র প্রযোজনা বিস্মিত হয়ে দেখার মতো কাজ ছিল, কিন্তু বেশি প্রদর্শন হয়নি এ প্রযোজনার—কেন জানি না।

ইতিমধ্যে একুশ শতকে প্রবেশের সূচনায় আমাদের এ রাজ্যের নাট্যস্বপ্নকল্প ২০০৩-এর যে হুজুগ[২] তৈরি করা হয়েছিল, তার সারাৎসার নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ আছে, এই আপ্ত বাক্যটিই কেবল উচ্চারিত হয়নি, একটি অভিমুখও প্রস্তাবিত হয়েছিল, ওপার বাংলার নাট্যকার সেলিম আল দীনের মুখে।

বাংলার বর্ণনাত্মক নাট্যনির্মাণের শিল্প আঙ্গিকের চর্চা ও তার আধুনিক সৃজনশীলতাই একদিন বিশ্বনাট্য ক্ষেত্রে দিশা দেখাবে, পাশ্চাত্য থেকে ঋণাত্মক নাট্যনির্মাণকে পাশে রেখেই পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত করবে বাংলার বর্ণনানাট্য। এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী এ বাংলার কেউ করেননি। এমতাবস্থায় পশ্চিমবাংলার ঘরবন্দী জনপ্রিয় নাট্যনির্মাণের অভিমুখকে ঘোরাতে পারার মতো নান্দনিক ভাবনায় প্রায় সেলিমের মতোই ভাবছিলেন যে উষা গাঙ্গুলি, তিনি তাঁর প্রথম বাংলা ভাষায় যে নাট্যনির্মাণ করেছে সম্প্রতি তা নেহাতই আর-একটি গৃহবন্দী আপনজনের মর্মব্যথার উদ্‌গীরণ মাত্র! মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু—এই প্রবাদবাক্যের পটভূমিতে নারীশক্তির বিষয়টি নিতান্তই বাইরে থেকে চাপানো মেয়েলি স্বপ্ন দেখা। পুরোনো দিনের দক্ষ অভিনেত্রীর সপ্রতিভাতেই এ প্রযোজনার সম্বল। উষা কোথায় *'হরগজ'* নামাবেন প্রকৃতির হাতে মানুষি সভ্যতার নিরবলম্বতার ক্ল্যাসিক নির্মাণ করবেন, তা না করে একুশ শতকে বাংলা থিয়েটারকে ঘরবন্দী করে বসলেন! তুলনায় বলব তিন তরুণ নাট্যনির্মাতা বরং একুশ শতকে বাংলা থিয়েটারের বিবেককে ধরে ঝাঁকি দিতে পেরেছেন।

এক, দেবাশিস রায়, তাঁর কথা আগেই বলা হয়ে গেছে; থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের 'তুমি কী করেছো'-র মতো মুক্তাঙ্গন রাজনৈতিক নাটক ও তার নির্মাণকলার কাছে একালের মার্কসবাদী নাট্য নির্মাতাদের অনুপ্রাণিত হবার মতো অনেক কিছু আছে। দুই, এই বামপন্থী শিবিরকেই যখন একের পর এক রথী-মহারথীরা বিদায় নিয়ে বাংলার বাম রাজনৈতিক নাট্যাঙ্গনকে প্রায় সেনাপত্যহীন করে তুলেছিলেন, তখন মঞ্চনাটকের সাসপেন্স ঠাসা রাজনৈতিক এক্সপোজার হিসেবে সংগ্রাম গুহের *'গ্রাউন্ড জিরো'* পোখরান বিস্ফোরণের অন্তর্তদন্ত হিসেবে এক অসাধারণ পলিটিক্যাল থ্রিলার। যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরি করে রাজনৈতিক মুনাফা লোটার নেপথ্য কাহিনীর নাট্যরচনা কৌশলেও তরুণ নাট্যকার সফল। পশ্চিমবাংলার গণনাট্য সঙ্ঘের বিশাল সাংগঠনিক শক্তি এর পেছনে থাকা সত্ত্বেও *'গ্রাউন্ড জিরো'*-র কম অভিনয় গণনাট্য আন্দোলনকে এই সঙ্কট মুহূর্তে সঠিক অবস্থান নিতে দ্বিধাগ্রস্ত মনে করায় না কি ?

তিন, এবার যে নাট্যনির্মাণের কথা আমরা উচ্চারণ করব তা এই একুশ শতকের বাংলার থিয়েটারের প্রথম ঘরভাঙা নাট্য বিনির্মাণ। যা বামপন্থী চেতনার ঘরে জন্ম নিয়ে বামপন্থী সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করে অতিবামপন্থী থিয়েটার হিসেবে আজ ডান বাম উত্তর দক্ষিণ সব দিকের থিয়েটার হয়ে উঠেছে। এ রকম নাটক যে আগে হয়নি কলকাতার মঞ্চে তা নয়, *'তিতাস একটি নদীর নাম'*-এর সফল নাট্য রূপায়ণ মনে রেখেই বলা যায় গৃহবন্দী বাংলা থিয়েটারের বাইরে বহুকাল বাদে 'তিতাস' ও *'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'*-র পরে এক ভিন্ন স্বাদ *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'*। সুমন মুখোপাধ্যায়ের এ নাটকের নির্মাণে অতীব যত্নের সঙ্গে এক চরম নেতিবাদী প্রত্যাখ্যানের রাজনীতিক বৃত্তান্ত গাঁথা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের উন্নতির রূপরেখার সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য সীমারেখার

শতকরা ৩৬ ভাগ মানুষের বিযুক্তিকরণ ঘটিয়ে ডাম বাম সব রকম রাজনীতিক শক্তিই আজ বিয়োজিত হয়ে যাচ্ছে। এই তত্ত্বটি দক্ষিণপন্থী বাবুদের খুব মনোমতো, তাই 'মোর কুনো মিছিল নাই' বলার মধ্যে দিয়ে বাঘারু আর হরতাল বন্‌ধ ইত্যাদি প্রতিবাদের ভাষাকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় যেন এক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। ভূমিসংস্কার-বিরোধী বৃহৎ জোতদার থেকে ক্ষুদ্র জোতদার পর্যন্ত সবাই খুশি! বাঘারু যদি ভূমিহীন দিনমজুরদের শ্রেণী প্রতিনিধি হয়, আহা তাহলে এদের বৃহৎ পুঁজি কেন, বিদেশের সর্বমান্য পুঁজিবাদের প্রভুরাও খুশি! অনেকে বাঘারুকে না-মানুষ ভাবছেন, এই না-মানুষদের ভুবনায়নের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার নানা ভূখণ্ডে মুখ বুজে দেউনিয়াদের সেবা করতে দেখা যাচ্ছে। অথচ আমরা জানি রাজবংশীরা কেউই না-মানুষ নন, তাদের বৃহত্তর অংশ বামপন্থী আন্দোলনে সক্রিয়, মুষ্টিমেয়রাই কামতাপুরী করছেন। তিস্তার বৃত্তান্ত কামতাপুরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকে দিল। আহা, আলাদীনের প্রদীপের মতো একটা করে বাঘারু যদি সবাই পেতাম। এই সমানুভূতি থেকে কি *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'* বামপন্থী নাটক হয়েও দক্ষিণপন্থীদের এত প্রিয়! এ প্রযোজনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে কেন্দ্রীয় নাটক আকাদেমি, ভোপালের মহাকবি, চাই কী ফিলিপাইন্সের ম্যাগসাইসাইও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরস্কৃত করার জন্য। নাটক দেখানোর পর পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনম্র ভঙ্গিতে নাটকের রাজনৈতিক বার্তা সম্পর্কে সমালোচনা ও পরামর্শ চেয়েছিলেন; অনেকের কাছেই চেয়েছিলেন, জানি আমাদের সে সমালোচনা বা পরামর্শের কোনোটিই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বাঘারুকে ছেঁড়া কানি না পরিয়ে কৌপিন পরানোতে ত্যাগব্রতী সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য যেন মান্যতা পেয়ে গেছে; সর্বহারাদের সে প্রতিনিধি, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মতো সে ক্রোধহীন, প্রতিবাদহীন! এমন নেতিবাদী জীবনদর্শনের অভিনব নাট্যনির্মাণ কি সময়ের দাবিতে *'জগন্নাথ'* বা *'রোশন'*-এর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'* যে কটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে, সেসব নিয়ে সেমিনারের ও লেখালেখিতে বিতর্ক চলুক, আমরা এই অবসরে সেলিম কথিত বর্ণনা-নাট্যের কি কোনো ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না একুশ শতকের সূচনাবর্ষের এই প্রযোজনায় ? সেলিমের *'কেরামত মঙ্গল'* *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'*-র পূর্বজ। কেরামত নির্যাতিত, বঞ্চিত কিন্তু বাঘারুর মতো হতাশাবাদী নয়। কেরামত শেখায়, বাঘারু ভোলায়।

আমরা আমাদের আলোচ্য প্রস্তাবের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। কলকাতার থিয়েটারকে হিসাবের ভেতর রেখেই সারা বাংলার অসংখ্য ছোটো ছোটো নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যনির্মাণই বাংলার একুশ শতকের থিয়েটারের অভিমুখ আজ নির্দেশ করবে। সে থিয়েটার সামাজিক শোষণ, অবিচার, রাজনৈতিক শঠতা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধহীনতার বিরুদ্ধে লড়বে বলে আজ তৈরি হচ্ছে ঘরে ঘরে।

এই ঘরে ঘরে তৈরি হওয়া বেশ কিছু সমর্থ শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠীর আহ্বানে রচিত এক অপ্রকাশিত ইস্তাহার আমাদের হাতে এসেছে। ইস্তাহারটি আমরা ছেপে দিচ্ছি, সময়ের দলিল হিসেবেও এর মূল্য ভবিষ্যতে অনেক।

কিন্তু তার আগে সদ্য সংগঠিত আটটি নাট্যদলের এক যৌথ উদ্যোগ 'অন্তরঙ্গণ' নামে এক ইস্তেহার ছাপিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেই বাস্তবের ইস্তেহারটিতে সর্বাগ্রে চোখ বোলানো যাক 'অন্তরঙ্গণ' অন্তরঙ্গ নাট্যের এক নতুন মিলনায়তন। 'এসো মুক্ত করো' বলে গণনাট্যের গান দিয়ে শুরু করে ঘোষণা করছে :

'অন্তরঙ্গণ বিশ্বাস করে : শতফুল বিকশিত হোক। থিয়েটারের অঙ্গনে যে ফুলই ফুটুক, তার পবিচর্যায় সকলের শ্রমই আমরা স্বীকার করব এবং সম্মান কবব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতা সমৃদ্ধ করুক আমাদের থিয়েটারকে। কারণ, যে কোনও রীতির নাট্যচর্চাই আমরা করি না কেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের মধ্যে অমিল অতি সামান্যই। দ্বন্দ্ব অবশ্যই অগ্রগতির সহায়ক এবং স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু দ্বন্দ্ব মানেই যে বৈরিতা নয় এই সত্যটাও যেন আমরা ভুলে না যাই। তাই, আজ সার্বিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রয়োজন স্বধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকেও সমবেত এবং সংহত হওয়া —সুস্থ চিন্তাচেতনার স্বার্থে। তাই অন্তরঙ্গণ।

'অন্তরঙ্গণ এর কণ্ঠে ধ্বনিত : এসো মুক্ত করো । নাট্যচর্চা এবং অনুশীলন ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—অর্থের অভাব, স্থানের অভাব, প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামোব অভাব এবং আরও নানা কারণে। শুধুমাত্র প্রসেনিয়ামের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকর্মীদের ক্ষেত্রেই নয়, ভিন্নরীতির অনুসরণ এবং অনুশীলনকারীদের মধ্যেও আজ হতাশা এবং বিভ্রান্তি নানা কারণে। তাই এই সময়েব প্রয়োজন এমন নাট্যচর্চা এবং চর্চাকেন্দ্র যা সমূহ অভাব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। শুধু তাই নয়, আগামী দিনের নাট্যকে মুক্ত হতে হবে জীর্ণ প্রথা অভ্যাস ও সংস্কার থেকে। দূর করতে হবে অন্ধতা এবং অন্ধকাব। তাই অন্তরঙ্গণ।

'অন্তরঙ্গণ অন্তরঙ্গতা চায় দর্শকদের সঙ্গে। মুখোমুখি বসতে চায তাদেব সামনে। মাঝখানে থাকবে না কোনও দুস্তর দূরত্ব, আলো অন্ধকারের দেওয়াল। নতুন কিছু তো নয়। আমাদের নিজস্ব দেশজ লোকনাট্যের তাই তো ছিল চরিত্র। সে চরিত্র আমরা হারিয়ে বসে আছি পরধর্মে নিধনং জেনেও। আমাদেব এই প্রয়াস সেই দাসত্ব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই অন্তরঙ্গণ।

'অন্তরঙ্গণ জন্ম নিয়েছে এইরকম সব ভাবনাচিন্তা থেকেই। ভাবনায় ভুল থাকলে সংশোধনের জন্যেও আমরা মুক্ত। বাংলার নাট্যজনের এ নতুন মিলনায়তন এই অন্তরঙ্গণ প্রতি শুক্রবার বিকেলে সরলা মেমোরিয়াল হল এ, পি জি হাসপাতালের বিপরীতে। অন্তরঙ্গণ আন্তরিকভাবেই যাজ্ঞা করে আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগ।'